শ্রীগুরবে নমঃ।

প্রেম-সহচরী

বা

আদর্শ আনন্দ চিত্র।

"নবতনু ভজনের মূল।"

শ্রীউদ্ধব চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

শ্রীধাম নবদ্বীপ।

শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ।

সন ১৩৪৮ সাল।

[মূল্য ১।৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীনফর চন্দ্র সরকার
হাওড়া ১২নং খুরুট রোড, বিজয় প্রেস হইতে মুদ্রিত

শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা।

দেব দীনবন্ধু শ্রীরাধারমণ।
বন্দি শিরে ধরি যুগল চরণ।
কাড়িল পাপীরে সংসার হৈতে,
অধম নারিল সে কৃপা লৈতে।
নাম, মন্ত্রে কিবা বৈষ্ণব চরণে,
কিছুতে নহিল রতি এককক্ষণে।
তথাপি পরাণে পরাণ টানিছে,
হিয়ায় হিয়ায় সতত বাঁধিছে।
যেই প্রভু মোর শ্রীরাধারমণ—
চরণ দাস বলি দৈন্য অনুক্ষণ।
নিত্যানন্দ প্রেমঘন তনুখানি,
গৌর সংকীর্ত্তনে মাতা সে পরাণী।
সঙরি পীরিতি তাঁর হেতু হীন,
"প্রেম-সহচরী" লিখিল এ দীন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস,

গ্রন্থকার।

জয় শ্রীশ্রীরাধারমণ

অবতরণিকা।

জীব-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দার্শনিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে জীবমাত্রই সুখাভিলাষী। চরম-প্রাপ্তি সুখ না হইলে কোনও কার্য্যে কিছুতেই জীবের প্রবৃত্তি হয় না। 'নহি সুখমনুদ্দিশ্য ক্বচিন্মন্দোঽপি বর্ত্ততে।' কিন্তু সংসারের যাবতীয় বস্তু একে একে আস্বাদন করিলেও তাহাতে ভোগের বিরাম বা সুখের পর্য্যাপ্তি হয় না। ইহার উত্তরও শ্রুতিতেই পাওয়া যায়—'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।' অল্পে সুখ নাই—ইহাতে আছে জড়িয় ক্ষণিক আপাতরম্য আনন্দ-কণা; কিন্তু ভূমাতে, বহুতে, চৈতন্যে প্রকৃত আনন্দ-সিন্ধু বিদ্যমান। শ্রুতিতে ইহাই আনন্দ-ব্রহ্ম, রসব্রহ্ম বা মধুব্রহ্ম পর্য্যায়ে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। এই রসের সংবাদ, এই মধুর সন্দেশ, এই আনন্দের বার্ত্তাটি যিনি প্রেমময় লীলাবিনোদী শ্রীভগবানের নিকট হইতে অবতরণ করিয়া—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে যাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রচার করেন—তিনিই সাধু বা মহাপুরুষ-পদবাচ্য। এই সাধুসঙ্গকে শাস্ত্রে নিধি-স্বরূপ বলা হইয়াছে। প্রাপঞ্চিক জগতে সাধু মহাপুরুষই ভগবৎ কারুণ্যঘনমূর্ত্তি। সৎসঙ্গলাভকরা ও ভগবৎকরুণাপ্রাপ্তি একই কথা। জীব অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বৈমুখ্য হেতু নিরন্তর দন্দহ্যমান হইতেছে—

এই দুরবস্থা দেখিয়া যদি কোনও সাধুর কৃপা হয়—তবেই পরতত্ত্বোন্মুখতা বা সংসার-ক্ষয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। বস্তুতঃ সৎসঙ্গ-বাহনা বা সৎকৃপা-বাহনা ভক্তিই জীবের হরিসান্মুখ্যের একমাত্র নিদান। ভগবদুন্মুখ-কারিণী ভগবানের কৃপা ভগবানের নাই, তিনি তাঁহার নিজ কারুণ্য ভক্তের ভক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া স্বয়ংই আবার ভক্তাধীন হইয়াছেন। কাজেই সাধু-সজ্জনের কৃপা ব্যতিরেকে ভগবৎকরুণা সুদুর্লভ—ইহা অতি সুসত্য কথা।

সাধুগণও আবার করুণা-প্রণোদিত হইয়া স্বয়ং ভক্তির যাজন করিয়া প্রচার করেন এবং তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারার মধ্য দিয়া একটা জীবন্ত ভক্তি-প্রবাহ ছুটাইয়া পরমপূত মন্দাকিনীধারাবৎ বহু বহু তাপ-ক্লিষ্ট হৃদয়ে পবিত্রতা, শান্তি, ভক্তি ও বৈরাগ্য প্রভৃতি অপার্থিব গুণরাজি পরিবেষণ করিয়া স্বয়ং আনন্দিত হয়েন এবং সর্ব্বসাধারণেরও মহাকল্যাণ সাধন করেন। এই সকল ভগবৎ-প্রেরিত পুরুষগণের দর্শনাদি সুদুর্লভ হইলেও অসংঘট্যমান নহে। ইতিহাসজ্ঞগণ সকলেই অবগত আছেন যে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে পতনোন্মুখ সমাজের কল্যানার্থে এইভাবে মহাপুরুষগণ স্বতঃ বা পরতঃ নিযুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জীবের প্রচুরতর কল্যাণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে সাধুসঙ্গই শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির নিদান, তদীয় নামকীর্ত্তন তাঁহাতে আসক্তির হেতু, শ্রীকৃষ্ণও তদীয় সেবা প্রকৃত আনন্দের কারণ। অতএব এই সংসারে যাহাতে অন্তরায়শূন্য হইয়া সাধুসঙ্গ, হরিকীর্ত্তন এবং হরি ও হরিজন সেবা করিয়া প্রকৃত সুখে থাকা যায়—তাহার উপায় বিধান করাই আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য।

আমাদের আলোচ্য এই গ্রন্থরত্নখানিতে জনৈক মহাপুরুষের সঙ্গপ্রভাবই বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার ক্ষণিক সঙ্গ ও আলাপাদি দ্বারা কিপ্রকারে দুইটি পরিবার ভগবৎসেবাদি লাভ করতঃ চরম কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন—তাহাই প্রধানতঃ বর্ণয়িতব্য বিষয় হইলেও প্রসঙ্গতঃ সদ্‌গৃহীদের কর্ত্তব্য কি—কিপ্রকারে গার্হস্থ্য-জীবনকেও পরম সুখময় করিয়া গঠন করা যায়—কিপ্রকারে ভগবৎসেবা ও তদীয়জনের পরিচর্য্যাদি করিতে হয়—ভগবদারাধনার ফল কি এবং তাহাতে এই মর্ত্তলোকেও যে সব সাত্ত্বিক বিকারের অভিব্যক্তি হয়—এইসকল বিষয়ও ইহাতে পরিবারদ্বয়ের জীবন-ধারার মধ্য দিয়া শ্রীগ্রন্থকার প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে সংক্ষেপে ভজন-তত্ত্ব, ভজনীয়তত্ত্ব, নাম-মাহাত্ম্য, বিগ্রহে চিন্ময়ত্ব প্রভৃতিও অতি সুমধুরভাবে সুসজ্জিত রহিয়াছে। অধিকন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের মেরুদণ্ড-সদৃশ যে সকল দুরূহ তত্ত্বাবলি আছে—তাহাও ইহাতে অতিসুন্দররূপে সহজভাষায় সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহার আভ্যন্তরিক কলেবরের পুষ্টিবিধান করিতেছে।

এই গ্রন্থের প্রত্যেক নায়ক নায়িকাই এক এক বিষয়ে আদর্শ হইয়া সকলপ্রকার জীবনেরই লক্ষ্য হইয়াছেন—তাহাও সহৃদয় সামাজিক-গণ গ্রন্থপাঠাবসরে উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ পাইবেন। আদর্শ জীবন যাপন করিতে হইলে—আদর্শ নারীজীবন গঠন করিতে হইলে—আদর্শ ভক্ত হইতে হইলে—আদর্শ প্রেমিকরূপে নিজেকে গঠন করিতে হইলে '**প্রেম-সহচরীই**' সর্ব্বতোভাবে পাঠ্য—ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

১৩১৪ সালে এই গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় এবং ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে এইবার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। এক্ষণে কৃপাময় পাঠকগণ যদি ইহার আস্বাদনে আনন্দানুভব করেন—তবেই এই দীনহীন প্রকাশক কৃতকৃতার্থ হইবে—সন্দেহ নাই।

শ্রীগুরবে নমঃ।

প্রেম-সহচরী

[প্রথম ভাগ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাণিহাটী—দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার।

কলিকাতা মহানগরী হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে পবিত্র পুণ্যসলীলা শ্রীজাহ্নবী-তীরবর্ত্তী পাণিহাটী গ্রাম। গ্রামখানির দৃশ্য স্বভাবতঃ অতি মনোরম। বসন্তকালে যখন গ্রামের বৃক্ষ-লতাগুলি নব-পল্লবিত—নব বিকসিত হয়, তখন গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূমিতে আসিয়া একবার মাত্র স্থানীয় স্বাভাবিক দৃশ্য অবলোকন করিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

আমাদের এই গ্রন্থের কাহিনী * * বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ। গ্রামবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বর্ণান্তর্গত। নিম্নবর্ণীয় প্রতিবাসিগণ সকলেই উচ্চশ্রেণীয়গণের একান্ত অনুগত এবং পরস্পর প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ থাকার কারণে গ্রামখানি শান্তি-পরিপূর্ণ।

একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের ইতিবৃত্ত লইয়া এই গ্রন্থের সূত্রপাত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,—উপাধি ভট্টাচার্য্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারের মধ্যে তাঁহার পিসীমা আর যুবতী স্ত্রী। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসারে আর কেহ নাই। পিসীমা বিধবা কৃষ্ণভাবিনী; কৃষ্ণভাবিনী সেই বিবাহ রাত্রে "শুভদৃষ্টির" সময়ে

একবারমাত্র স্বামীর মুখ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। পার্থিব সুখের মধ্যে কৃষ্ণভাবিনীর কপালে বিধাতা ইহা ব্যতীত আর কোন সুখ লিখেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী বিধবা হইলেও অসুখী নন। সে কথা, পাঠকগণ ক্রমে কৌতুহলের সহিত অবগত হইবেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পত্নী সুশীলা দারিদ্র্যদুঃখ হেতু কিছুমাত্র বিষাদিত নহেন; কিন্তু একটী সন্তান ক্রোড়ে লইতে কালবিলম্ব হেতু মনে মনে দুঃখিত। সুশীলা বনিয়াদী ঘরের মেয়ে; কিন্তু সম্প্রতি জ্ঞাতিদিগের সহিত বিবাদে পিতার বিষয় সম্পত্তি সমস্তই প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুশীলার দাদা লেখা পড়া শিখিয়া বেশ মোটা বেতনের একটী চাকুরী করেন, তাহাতেই সুশীলার পিতৃপরিবার কোন রকমে পূর্ব্ব চাল-চলন বজায় রাখিতে সক্ষম হইতেছেন। সুশীলার দাদা সুশীলাকে বড় ভাল বাসেন এবং মধ্যে মধ্যে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। সুশীলার পিতার নাম হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দাদার নাম শ্রীনগেন্দ্রনাথ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাল্যকাল হইতে অধ্যয়ন-তৎপর। বহুবিধ আর্য্যশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় অসাধারণ পণ্ডিত হইলেন। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পণ্ডিত হইয়াও দরিদ্র। যে সময়ে আমাদের এই ইতিবৃত্ত আরম্ভ হইয়াছে, তখন সমাজের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, পরিবর্ত্তনশীল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং তদনুযায়ী আচার ব্যবহার সমাজের আদরণীয় হইবার উপক্রম হইতেছে। সংস্কৃত সাহিত্যকে তখন অপ্রচলিত ভাষা বলিয়া অভিহিত করিতে ইংরাজী রীতি নীতি অনুকরণশীল যুবকবৃন্দ বিলক্ষণ প্রয়াস পাইতেছেন। এমন সময়ে কাজে কাজেই আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় পণ্ডিত হইয়াও দরিদ্র। অধিকন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিজেরও কিছু ত্রুটী আছে; সেই কারণে তাঁহার দারিদ্র্য দুঃখ অনিবার্য্য সুতরাং অত্যাজ্য। পণ্ডিত সভায়

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৌনী ; কখনও যদি কিছু বলেন, তবে সে পাণ্ডিত্যাভাস শূন্য। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভাসমিতিতে মস্তক সঞ্চালনে শিখা আন্দোলিত করিয়া বাক্যবিন্যাসের ছটায় সভ্যগণকে চমকিত করিতে না পারিলে, পণ্ডিত কিসের? ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় নিজ পক্ষ সমর্থন প্রয়াসে পাণিতল আঘাতে ভূমি শব্দায়মান করিয়া ন্যায়ের অতি কূট মীমাংসা উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক পরপক্ষ নিরাস করিতে না পারিলে, সভায় অতি উচ্চ সম্মানের সহিত বিদায় পাইবেন কি প্রকারে? আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় পণ্ডিত হইয়াও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে শিখেন নাই, কাজেই এ পর্য্যন্ত আর্থিক উন্নতির কথা দূরে থাকুক, তিনি সাংসারিক ব্যয়সচ্ছল করিতেও অক্ষম। যাহা হউক, এ সকল কারণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হৃদয় শান্তিশূন্য নহে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সর্ব্বদা প্রফুল্ল-হৃদয়। যিনি একবার-মাত্র তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রশান্ত তেজোমণ্ডিত বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনি পুনঃ পুনঃ সেই মুখ খানি দেখিতে ভালবাসেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বয়স ৩৫ বৎসরের অধিক নহে। তাঁহার শরীরের বর্ণ গৌর, গঠন সুন্দর এবং সুকুমার। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ভালবাসিয়া যিনি যাহা দেন, তাহাতেই তাঁহাকে সংসারের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হয়। সুশীলার গার্হস্থ্য ব্যয় সম্বন্ধে মিতব্যয়িতা গুণে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংসারের অনটন বড় একটা বুঝিতে পারেন না, একারণেও তাঁহার শান্তিভঙ্গ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে শ্রীশ্রীশালিগ্রাম সেবা হয়। ঠাকুরঘরটী দক্ষিণমুখো। ঠাকুর ঘরের একপাশে একটী ধান রাখিবার মরাই; আর দুইটী পেঁপে গাছ। বাম পার্শ্বে দুইটী কুঁদ আর অন্যান্য কয়েকটী ফুলের গাছ আছে। এই গাছ কয়েকটীর ফুলে বারোমাস ঠাকুর পূজা চলে। ঠাকুর মন্দিরের এপাশে ওপাশে দুইটী করিয়া চারিটী তুলসী মঞ্চ,

অতি যত্নে পিসীমা ও সুশীলা কর্ত্তৃক সেবিত হয়। পশ্চাতে একটী মাচা, তাহাতে সময়োচিত লাউ বা কুমড়া গাছ প্রতিপালিত এবং বর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্বমুখো পিসীমার ঘর। ঘরের জানালা দিয়া পিসীমা গঙ্গাদর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ পান। সুশীলার পশ্চিম দোয়ারী গৃহের পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, পুষ্করিণীটীর চারিদিকে বাগান। কয়েকটী নারিকেল, আম, দুইটী কাঁঠাল, একটী জাম, একটী জামরুল, কয়েকটী কলাগাছ এবং দুই তিনটী শাকসব্জীর ক্ষেত লইয়া বাগানখানি বেশ গার্হস্থ্য সঙ্কুলান-সহায়। এতদ্ব্যতীত ঠাকুর ঘরের সম্মুখে পাকের ঘর, ঢেঁকী-শালা, মধ্যে অঙ্গণ ব্যবধান। সুশীলার গৃহের বাম দেওয়াল সংলগ্ন আর একখানি ক্ষুদ্র ভাণ্ডার ঘর আছে। বাগান এবং গৃহগুলি বেড়া দিয়া উপযুক্তরূপে চতুর্দ্দিকে ঘেরা। বাহিরদিকে পরস্পর সংলগ্ন দুইখানি গৃহ। একখানি অভ্যাগত ব্যক্তির আশ্রয়যোগ্য, আর একখানি সমাগত ভদ্রলোকদিগের বিশ্রাম উপযোগী। ঘর দুইখানি দক্ষিণ দোয়ারী। সম্মুখে বেড়ার দ্বারা বেষ্টিত একখানি ক্ষুদ্র ফুলের বাগান। ইহার তদন্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কয়েকটী ছাত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কয়েকটী ছাত্র আছেন। তাঁহারা দরিদ্র বলিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন। অকপট হৃদয়ের ভক্তি ব্যতীত পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহাদের দিবার আর কোন সম্বল ছিল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি যত্নে তাঁহাদের পাঠ শিক্ষা দেন, তাঁহারাও পণ্ডিত মহাশয়কে পিতৃতুল্য ভক্তি ও মান্য করিয়া থাকেন।

এইরূপ অবস্থায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারবর্গ যে দারিদ্র্যাক্রান্ত, কে বুঝিতে পারিবে? ভাগিরথী তীরবর্ত্তী গৃহখানি সুশীলার তত্ত্বাবধানে যেন হাসিতেছে। যেমন সুশীলার মুখখানি সদাই হাস্যমাখা, (সেই প্রফুল্ল মুখ দেখিলে কেহই অনুসন্ধান পাইবেন না, যে সুশীলার হৃদয়ে

কোনরূপ অভাবজনিত চিন্তা আছে) সেইরূপ সুশীলার বাড়ীখানি হাস্যমাখা, শান্তিভরা এবং লক্ষ্মী-শ্রী-সম্পন্ন। আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাংসারিক দারিদ্র্য সম্বন্ধে কাহাকেও জানাইতে নিতান্ত উদাসীন। সুতরাং কেহ উপযাচক হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই বসতবাটীটুকু তাঁহার স্বকৃত নহে, পৈত্রিক সম্পত্তি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতাঠাকুর বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। পুত্র পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়াই পণ্ডিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পিতার নামেই সভায় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন।

সুশীলা সুচরিত্রতা, বিনয় এবং গার্হস্থ্য শিক্ষাগুণে পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সকলেরই প্রিয়পাত্রী। শাশুড়ী অবাধ্য পুত্রবধূর উপর সুশীলার দোহাই দিয়া তর্জ্জন করেন। স্বামী দুর্বিনীতা স্ত্রীকে সুশীলার চরণামৃত গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। এমন কি, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে পর্য্যন্ত মার উপর অভিমান করিয়া সুশীলা-মায়ের সুখ্যাতি করে। সকলেই সুশীলাকে ভাল বাসেন এবং সুশীলাও সকলকে ভাল বাসেন।

পিসীমা কৃষ্ণভাবিনী কাহারও সহিত মিশিতে বা আলাপ ব্যবহার করিতে বড়ই সঙ্কুচিতা। পিসীমা এক একবার বলিয়া থাকেন, "বৌমা ছেলেমানুষ হইয়া কি করিয়া এত লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে, আমি কাহারও সহিত দুইটা কথা বলিতে যাইলে, যেন থতমত খাই।" পিসীমা ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করেন, দুইবার শ্রীশ্যামসুন্দর দর্শন করিয়া আসেন, আর আহ্নিক পূজা করিয়া যদি সময় থাকে, তবে সুশীলার গৃহকার্য্যের সহায়তা করেন। সুশীলা পিসীমাকে সাংসারিক কোন কার্য্যে প্রায়ই হস্তক্ষেপ করিতে দেন না।

সুশীলা গৃহকার্য্যে অতীব ক্ষিপ্রহস্ত এবং সুদক্ষ। পিসীমাও সুশীলার ভক্তিগুণে একেবারে মুগ্ধ। পিসীমা গৃহের কোন কাজ কর্ম্ম করিতে

আসিলে, সুশীলা দুই একবার নম্রভাবে নিষেধ করেন, তাহাতে না শুনিলে সুশীলা একটু ধমকাইলেই পিসীমা আর সুশীলার কথার উপরে কিছু না বলিয়া নিজের ঘরের মধ্যে মালা লইয়া বসেন। হরিনাম করিতে বসিয়া সুশীলার ভালবাসা স্মরণ করিয়া পিসীমা অনেক সময়ে চক্ষু-জলে ভাসিয়া যান। আহা! পিসীমার প্রাণ কোমল হইতেও কোমলতর, তদুপরি সুশীলার ভক্তিবারি সিঞ্চনে ক্রমে তাহা কোমলতম হইতেছে।

আর সুশীলা আদর্শরমণী, সর্ব্বগুণে বিভূষিতা, আমাদের এই গ্রন্থ-বিবৃত নায়িকার জননী হইবার সর্ব্বপ্রকারেই উপযুক্তা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুশীলার নির্ভরতা।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাংসারিক আয় ব্যয় সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখেন না। সে সমস্ত বিষয়ে সুশীলা যাহা করেন, তাহাই হয়। কোন নিমন্ত্রণে বা পণ্ডিত সভায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা কিছু বিদায় পান, সুশীলার হাতে আনিয়া দেন! কিন্তু সে অতি সামান্য আয়, তাহার দ্বারা সংসার ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া সুকঠিন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিশাশেষে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃকালীন স্মরণাবৃত্তি পাঠ করিয়া দৈহিক কৃত্যাদি সমাপন করেন। তৎপরে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন-পূর্ব্বক নিত্যপাঠে বসেন। ইতোমধ্যে ছাত্রবর্গ আসিয়া স্ব স্ব পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হন। পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠ শেষ হইলে, ছাত্রবর্গকে তিনি পাঠ উপদেশ করেন। এই ত গেল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য। এদিকে প্রাভাতিক গৃহকর্ম্ম শেষ হইলে, স্নান করিয়া সুশীলা রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হন।

একদিন রবিবার, সুশীলার ভাণ্ডারে ঠাকুরসেবার কোন দ্রব্যই নাই। পূর্ব্বদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্থানান্তর হইতে অধিক রাত্রিতে গৃহে আসিয়া-ছিলেন, কাজেই স্বামীকে অভাবের কথা জানাইবার সুশীলার অবকাশ হয় নাই। শেষ নিশায় সুশীলা ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময় পণ্ডিত ঠাকুর উঠিয়া আপনার প্রাতঃকৃত্য সারিয়া স্নান করিতে গেলেন। ইতঃমধ্যে সুশীলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অদ্য ঠাকুর ঘরে কোন দ্রব্যই নাই মনে হওয়াতে সুশীলার চিত্ত বিষণ্ণ হইল। তৎক্ষণাৎ আবার "দয়াময়

হরি” নাম স্মরণ হইবামাত্র সুশীলার হৃদয় কতই উৎসাহান্বিত—কতই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন আর ভাবনা না করিয়া, সুশীলা ‘হরিনাম’ স্মরণ করিতে করিতে শয্যা হইতে উঠিলেন। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নান করিতে গিয়াছেন। সুশীলা গৃহকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নানাদি সমাপনান্তর ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুশীলার আর স্বামীর কাছে আজিকার অনাটনের কথা বলা হইল না। যাহা হউক ইতোমধ্যে সুশীলা গৃহকার্য্য শেষ করিয়া, স্নান করিয়া আসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠাকুর মন্দিরের কার্য্য এবং প্রাতঃসন্ধ্যা সারিয়া ঠাকুর ঘরের বারান্দায় বসিয়া পাঠে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, ইতঃমধ্যেই সুশীলা স্নান করিয়া আসিয়া কাঁপরে পড়িলেন। ঘরে কিছু নাই, এখন কোথা হইতে কি আনিয়া ঠাকুর সেবার কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন, ভাবিয়া সুশীলা আকুলা। যেখানে আমাদের সাংসারিক কোন অভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ঠাকুর মহাশয় পাঠে রত, সুশীলা ধীরে ধীরে সেই স্থানের একপার্শ্বে আসিয়া দাড়াইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠ করিতে করিতে একবার সুশীলার উদ্দীপ্ত বদনকমল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পুনরায় গ্রন্থপাঠে চিত্তাভিনিবেশ করিলেন। সুশীলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন—অথচ না বলিলেও নয়। পণ্ডিত ঠাকুর আরও উৎসাহের সহিত পাঠ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভাবিলেন, ব্রাহ্মণী আমার পাঠ শুনিতে শুনিতে সংসারের কাজ কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন। অধিক কালবিলম্ব করিতে না পারিয়া সুশীলা ধীরে ধীরে বলিলেন,—“সেবা অঙ্গের কোন কথা গ্রন্থে নাই?”

ভট্টাচার্য্য মহাশয়। এ অধ্যায়ে ত সে কথার উল্লেখ নাই, সে অন্য অধ্যায়ে আছে। তোমার শুনিতে ইচ্ছা হয়, অন্যদিন শুনিয়া লইও। ভট্টাচার্য্য মহাশয় “শ্রীহরিভক্তিবিলাস” পাঠ করিতেছিলেন।

সু। এখন সেবা অঙ্গের কথা শুনিবার আমার দরকার হইয়াছে।

ভ। কি জানিতে চাও বল ?

সু। আজ ঘরে ঠাকুর সেবার কোন সামগ্রীই নাই।

ভ। ওঃ! সেই কথা বল। তুমি অত ঘুরাইয়া বলিলে কি আমি বুঝিতে পারি।

সু। আপনি পণ্ডিত মানুষ, কাজেই মুখ্যদের কথা বুঝিতে পারেন না।

ভ। তা আমায় কি করিতে হইবে ?

সু। এই চাল, দাল সব আনিয়া দিতে হইবে।

ভ। তোমার কাছে কিছু সম্বল আছে কি ?

সু। আমার কাছে কিছু সম্বল থাকিলে, জিনিষ আনাইবার জন্য কি আপনার কাছে আসি।

ভ। আমি কাল কোথাও কিছু পাই নাই। এখন কি করিব ?

সু। আমি সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। তা আপনি আর কি করিবেন, ঠাকুর জুটাইয়া দিবেন।

আহা! সুশীলা স্বামীকে সাংসারিক বিষয়ে উৎকণ্ঠিত করিতে বড়ই দুঃখ পান। তাই বলিলেন,—আপনি আর কি করিবেন, ঠাকুর জুটাইয়া দিবেন।

ভ। তা বৈকি। আমাদের কিছুই সাধ্য নাই। এতদিন ঠাকুরই আমাদের কুলান করিয়া আসিতেছেন, আজও তিনিই করিবেন।

সু। আপনি পাঠ করুন, আর চিন্তা করিলে কি হইবে ? এই বলিয়া সুশীলা সেই স্থান হইতে দ্রুত চলিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

সুশীলা যদিও স্বামীর নিকট প্রফুল্লভাব দেখাইয়া চলিয়া আসিলেন

তথাপি অন্তর হইতে চিন্তা একেবারে অপসৃত হইল না। চিত্তের এই অবস্থায় তিনি ভাণ্ডার গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, এমন সময় পরিচিত পদশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন, দাদা আসিয়া অঙ্গণ ভূমিতে দাড়াইয়াছেন। গলায় বস্ত্র দিয়া সভক্তি একটী দণ্ডবৎ করিলেন। উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা! বাড়ীর সব ভাল ত?

নগেন্দ্র। হাঁ, সকলে ভাল আছেন।

সু। মা কি আমায় নিতে পাঠাইয়াছেন?

ন। সুশীলা! তুমি মুখে মাত্র বল আমি যাব, কিন্তু লইয়া যাইবার কথা হইলেই কত রকম ওজর আপত্তি কর। মা তোমাকে কতবার নিতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কয়বার গিয়াছ?

সু। (দাদার কথায় কিছু অপ্রস্তুত হইয়া) দাদা! আমার কি মাকে বাবাকে দেখিতে সাধ হয় না, কিন্তু আমি গেলে এখানে বড়ই বিশৃঙ্খল হয়। পিসীমাকে এখন সাংসারিক ভার দেওয়া সঙ্গত নয়। তাই খুব ইচ্ছা হইলেও আমার যাইবার যো নাই। তা দাদা! আজ কি ভাগ্যি তুমি এত সকালে এখানে আসিয়াছ। বৌদিদি ভাল আছেন ত?

ন—তার ভাল মন্দ কিছু বুঝি না। তার কথা আর এখন কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।

সু—আচ্ছা দাদা! তুমি হাত মুখ ধুয়ে বস। আমি——

ন—আমি গঙ্গায় হাত মুখ ধুয়ে এসেছি, চল, তোমাদের বাগানে কি ফল, শাক সবজী হয়েছে দেখিগে। এই বলিয়া, সুশীলার নিকটবর্ত্তী হইয়া নগেন্দ্র বাবু তাঁহার হাতে পাঁচটী টাকা দিলেন।

সুশীলা সেই মুহূর্ত্তে কিরূপ অভাবগ্রস্ত, পাঠকগণ! তাহা জানেন! শ্রীহরির দয়া অনুভব করিয়া সুশীলার হৃদয়ে যে ভাবের সঞ্চার হইল,

তজ্জন্য সুশীলা সেই ক্ষণে আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। একটু পরে কহিলেন, দাদা! আজ আমাদের বড় অভাব হইয়াছিল, তোমার দ্বারায় ঠাকুর সে বিষয়ের সঙ্কুলান করিলেন। এই বলিয়া সুশীলা আর কালবিলম্ব না করিয়া নবীন নামে একটী সুশীল ছাত্রকে বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয়ের নিমিত্ত পাঠাইলেন। তদনন্তর সুশীলা ভ্রাতার সহিত কিছু তরকারী ও শাক সঞ্চয়ের নিমিত্ত বাগানে প্রবেশ করিলেন।

নগেন্দ্র বাবু বাগানের সুশৃঙ্খলা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দলাভ পূর্ব্বক সুশীলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বাবু কহিলেন, দেখ সুশীলা! তোমাদের এই বাগানখানি এতই মনোরম বোধ হইতেছে, যে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মনে আর কোন সুখ দুঃখের চিন্তা থাকে না। সুশীলা! তোমরা দরিদ্র হইলেও অনেক ধনীলোক অপেক্ষা সুখী। নগেন্দ্র বাবু কথাগুলি কিছু উচ্ছ্বাসের সহিত ব্যক্ত করিলেন। সুশীলাও বুঝিতে পারিয়াছেন, যে দাদা হৃদয়ে কোন অশান্তি পাইয়া অদ্য তাঁহাদের পর্ণ কুটীরে আগত। মন বুঝিবার জন্য সুশীলা নম্রভাবে কহিলেন, দাদা! আপনি এ কি বলিতেছেন?

ন—দেখ সুশীলা! আমি তোমাদের এখানে মাঝে মাঝে আসিয়া যে সুখ পাই, তাহার শতাংশের এক অংশও সেই সুসজ্জিত প্রাসাদে পাই না। আর তুমি ত জান, আমাদের উপস্থিত দশায় যদি মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতা না থাকে, তবে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণ ভাল।

দাদার হৃদয়-ব্যথা অবগত হইয়া, বুদ্ধিমতী ভগিনী আর নীরব থাকিতে পারিলেন না।

সু—সংসারে মনের মিল না হইলে কিছুতেই সুখ হয় না। সুখের কারণ ভালবাসা, পরস্পর সেই ভালবাসা না হইলে সুখ হওয়া অসম্ভব।

দাদা! আপনি বৌ দিদিকে ভাল বাসেন না, তাই বাটীতে আপনার সুখ নাই।

ন—মনের মিল হইবে কি প্রকারে? হিংসা-দ্বেষ-পরায়ণ লোকের সহিত কেমন করিয়া মিল হয়, তুমি বলিয়া দিতে পার?

সু—ভাল না বাসিলে কি মিল হইবে? ভালবাসিয়া, বুঝাইয়া আপনার মনের মত করিতে না জানিলে, এ ক্ষেত্রে আর উপায় নাই।

ন—আমার সংসারে আর সুখী হইবার আশা নাই, সে সত্য কথা।

সু—দেখ দাদা! তাহা হইলে আমাদের ভগবানের সহিত মিলন হইবার আশা কোথায়? আমরা ত কুটিল বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তা বলিয়া আমাদের উপর ভগবানের ভালবাসা হ্রাস হয় নাই, তাই আশা হয় এক সময় তাঁহার সহিত আমাদের মিলন হইবে। সেই জন্য বৌ-দিদিকে আপনি ভালবাসিতে অবহেলা করিবেন না। তাঁহার প্রতি আপনার ভালবাসা থাকিলে, এক সময় না এক সময় বৌ-দিদি আপনাকে ভাল বাসিবেন।

সুশীলার সরল এবং সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত শ্রবণে নগেন্দ্র বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, সুশীলা আমা অপেক্ষা বুদ্ধিমতী, এই কথার উপর আর আমার কিছুই বলিবার রাখিল না। আরও সুশীলার এই অল্প বয়সে ভগবানে মতি হইয়াছে, কই, আমিত ভগবানকে স্মরণ করি না, কেবল সাংসারিক ভোগ সুখে লালায়িত। সুশীলা দাদাকে নীরব দেখিয়া অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকটী বেগুনের গাছ দেখাইয়া কহিলেন, দাদা! আমার এই কয়েকটী বেগুন গাছে এবার আমায় আর বেগুন কিনিতে দেয় নাই। আমার এই বাগানখানি না থাকিলে, দাদা! সংসার চলিত না।

ন—এইরূপ একখানি বাগান থাকিলে গৃহস্থের অনেক সাশ্রয় হয়। তুমি এই বাগানখানি করিয়া বড়ই বুদ্ধিমতীর কাজ করিয়াছ।

সুশীলা কথা বলিতেছেন, আর শাক তুলিতেছেন, ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটী কাঁচা কলা, একটী মোচা, কয়েকটী বেগুন উঠাইয়াছেন। গত কল্যকার একটী লাউ উঠান আছে। শাক তুলা হইলে, সুশীলা কহিলেন, এতেই আজ ঠাকুর সেবা-কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া যাইবে। দাদা! চল তবে যাই। সুশীলা অগ্রে অগ্রে, নগেন্দ্র বাবু পশ্চাৎ পশ্চাৎ, দুই ভাই বোনে নীরবে চলিতেছেন। নগেন্দ্র বাবু সুশীলার কথায় কিছু চিন্তাশীল। সুশীলা কি দিয়া কি রাঁধিবেন মনে মনে তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন। রান্না ঘরের দাবায় তরকারী, শাক সবজীগুলি রাখিয়া সুশীলা বঁটী লইয়া তরকারী সংস্কার করিতে বসিলেন। ইতঃমধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিত্যপাঠ সমাপন করিয়া ছাত্রগণকে পাঠ দিতে বসিয়াছেন। এদিকে নবীন, চাউল, দাল, ঘৃত প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সম্মুখ দিয়া যখন নবীনকে দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে দেখিলেন, তখন, ঠাকুর আজও জুটাইলেন, বুঝিয়া আনন্দিত হইলেন।

সুশীলা নবীনকে দ্রব্যাদি রাখিতে বলিয়া, তাহাকে পাঠ লইবার জন্য যাইতে আদেশ করিলেন, আর সুরেন্দ্রের পাঠ সমাপন হইলে তাহাকে পাঠাইয়া দিতে কহিলেন। নবীন চলিয়া গেল। নগেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, সুশীলা! আজ কি রাঁধিবে?

সু—ডাল হইবে, মোচার ঘণ্ট, আলু বেগুন বড়ী দিয়া তরকারী, শাক ভাজা, আর লাউয়ের অম্বল।

ন—এতগুলি রাঁধিতে অনেক দেরী হইবে সুশীলা! তুমি শীঘ্র করিয়া অল্প কিছু রসুই কর।

সু—সংগ্রহ হইলে, ঠাকুর সেবার রান্না মনের মত করিয়াই করিতে হয়।

ন—অধিক বেলা হইলে ঠাকুরের খিদে পাবে যে।

সু—না দাদা! এখনই রান্না হইয়া যাইবে। এই দুইটা উনান জ্বালিলে, খুব শীঘ্র ঠাকুরের ভোগ তৈয়ারী হইবে।

ন—আচ্ছা! দেখা যাক্, কেমন তোমার শীঘ্র রান্না হয়।

ভাই বোনে রান্নার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সুরেন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা! ডাকিয়াছেন কেন?

সু—বাবা! আজ বড় বেলা হইয়া গিয়াছে, একলা সব কাজ করিতে গেলে দেরী হইয়া যাইবে, তুমি এই চাল দালগুলি যদি ঝাড়িয়া বাছিয়া দাও?

সুরেন—হ্যাঁ মা! এই যে আমি করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া বালক সুরেন্দ্র আনন্দিত মনে মায়ের আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইলেন। গ্রামের বালকগণ সকল কাজই জানে। বিশেষতঃ সুশীলার কাছে থাকিয়া ছাত্রগণ সকল কাজ শিখিয়া ফেলিয়াছে। সুশীলার ভালবাসা-বশবর্ত্তী হইয়া সকলেই আহ্লাদ সহকারে তাঁহার অনুগত হইতে অভিলাষ করেন।

এ দিকে এত কাণ্ড কারখানা হইতেছে আমাদের পিসীমার কিছুরই অনুসন্ধান নাই। তিনি স্নান করিয়া আসিয়া আপন কক্ষের মধ্যে আহ্নিক করিতেছেন। কিন্তু আহ্নিক করিবার সময় কি কিছু শুনা যায় না? তাহা নহে, পিসীমা আহ্নিক করিতে করিতে প্রায়শঃই বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার রহিত হইয়া যাইতেন। সেই নিমিত্তই পূর্ব্বে একটু আভাষ দেওয়া হইয়াছে, পিসীমা বিধবা হইলেও সুখী। পিসীমা সম্বন্ধে আরও কথা আছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

ছাত্রগণের পাঠ সমাপন হইলে, সকলে আপন আপন গৃহে চলিয়া যাইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইবার একটু অবসর প্রাপ্ত হইলেন। শ্যালক

আসিয়াছেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংবাদ পাইয়াও সাক্ষাৎকারে আলাপ করিবার অবকাশ পান নাই। বিশেষতঃ ভাই বোনের কত দিনের পর দেখা হইল, তাঁহারা পরস্পর নির্ব্বিবাদে আলাপন করুন, ইহাও মনের সরল অভিপ্রায়। ইত্যবসরে নগেন্দ্র বাবু প্রিয় ভগিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে আসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি সমাদরে শ্যালককে বসিতে বলিয়া শ্বশুর বাটীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। তাহা এ স্থলে সন্নিবেশিত হইলে গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি হয়। সুচতুর পাঠকগণ! অনুমান করিয়া লউন, ভগ্নিপতি ও শ্যালায় যদি বিশেষ প্রণয় থাকে, তাহা হইলে কদাচিৎ মিলন সময়ে, উভয়ের মধ্যে কিরূপ প্রীতির আলাপন হয়।

দিবা দশ দণ্ড অতীত হইলে পিসীমা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন সুশীলা রন্ধনাদি কার্য্য একরূপ শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। তদ্দর্শনে পিসীমা, যেন কিছু অপ্রস্তুত হইয়া, কহিলেন বৌ-মা! আমার আজ আহ্নিক সারিতে বড়ই বিলম্ব হইয়াছে।

সু—পিসীমা! আপনি আমাদের কল্যাণ কামনায় ঠাকুরকে কি বলিলেন?

পি-মা—আমি ঠাকুরের নিকট তোমাদের জন্য আর কি প্রার্থনা করিব, তোমার শীঘ্র একটী সন্তান হউক ইহাই ঠাকুরের নিকট আমার ভিক্ষা।

সুশীলা লজ্জিত হইলেন, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন,—পিসীমা! দাদা আসিয়াছেন, এখন বোধ হয় বাহির বাটীতে আছেন। আপনি একবার বাহিরে গিয়া সংবাদ দেন, ভোগ প্রস্তুত হইয়াছে।

পি—এ্যাঁ!! বৌ-মা! তোমার দাদা আসিয়াছে, তা আমি ত কিছু জানিতে পারি নাই। আমাকে একটু ডাকিলেই পারিতে। তুমি একা পাকের কার্য্য করিতে না জানি কতই কষ্ট পেয়েছ।

সু—সুরেন আমার অনেক কাজ কর্ম্ম করিয়া দিয়াছে, পিসীমা!

পি—হ্যাঁ, সুরেন বড় লক্ষীছেলে। তা যা'হোক ঠাকুরের ইচ্ছায় সব হ'য়ে গিয়েছে। আমি আর তোমাদের কোন কাজেই লাগিলাম না।

সু—পিসীমা! আপনি এখন বাহিরে খবর দেন।

পি—হ্যাঁ, তোমার দাদা আসিয়াছে,——তা আমি এই যাই।

সু—পিসীমা! দাদাকে আপনার লজ্জা করে নাকি?

পি—না বৌ-মা! তোমার দাদা——এই আমি বাহিরে খবর দিতে যাই,—বলিতে বলিতে পিসীমা বাহিরে গেলেন।

সুশীলার পিসী-শাশুড়ীর মুখে পাককার্য্য সমাপন বার্ত্তা অবগত হইয়া নগেন্দ্র বাবু আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিলেন, এত শীঘ্র এতগুলি ব্যঞ্জন কেমন করিয়া প্রস্তুত হইতে পারে! সৌভাগ্যবশতঃ সুশীলার ন্যায় গুণবতী ভগিনী পাইয়াছি। সুশীলার মত গুণবতী স্ত্রী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী। পাঠকগণ! নগেন্দ্র বাবুর হৃদয়ের দুঃখ বুঝিতে পারিলেন কি?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংবাদ পাইবা মাত্র নগেন্দ্র বাবুকে কহিলেন, চল দাদা স্নান করিতে যাই। এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নগেন্দ্র বাবুর হাত ধরিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। উভয়ে মধ্যাহ্ন স্নান ও সন্ধ্যা সমাপনান্তর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই সুশীলা কর্ত্তৃক ভোগ-দ্রব্য ঠাকুর গৃহে নীত হইয়াছে।

একখানি পুরাতন পট্টবস্ত্র পরিধানানন্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথারীতি শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবকে ভোগ নিবেদন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ভোগ সরিলে পিসীমা এবং সুশীলা কর্ত্তৃক প্রসাদ-দ্রব্য পাকগৃহে আনীত হইল। সুশীলা, নগেন্দ্র বাবু এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিমিত্ত নিজ গৃহ-সম্মুখস্থ বারান্দায় আসন করণান্তর তদগ্রে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ দ্রব্য রাখিলেন।

পরিবেষন সমাপ্ত হইলে পিসীমাকে উভয়কে আহ্বান করিতে বলিয়া একখানি পাখা হস্তে ভোজন স্থানে দণ্ডায়মান থাকিলেন। নগেন্দ্র বাবু ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথোপকথন করিতে করিতে আসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলে সুশীলার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল। উভয়ে নানাবিধ আলাপন করিতে করিতে ভোজন করিতেছেন, সুশীলা উভয়কে ব্যজন করিতে নিযুক্তা। নগেন্দ্রবাবু এক একটী ব্যঞ্জনের প্রশংসা পূর্ব্বক অতি আনন্দিত মনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাহা আস্বাদন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

ভ—ভগিনীর হাতের রান্না এত করিয়া প্রশংসা করিতেছ, বৌ-দিদির হাতের রান্না তবে কেমন?

ন—ভট্টাচার্য্য মহাশয়! সে কথা আর কেন বলেন; তাঁর হাতের রান্না একদিন খাইলে আর জন্মেও ভুলিতে পারিবেন না।

ভ—কই! আমাদের ভাগ্যে ত তাঁর হাতের রান্না খাওয়া এক দিনও ঘটিল না।

ন—তা কেমন করিয়া ঘটিবে? মর্ত্ত্যে থাকিয়া স্বর্গের অমৃতে বাসনা করিলে কি পূর্ণ হয়?

ভ—ভাই! তুমি মর্ত্ত্যে থাকিয়াও স্বর্গবাসী।

ন—যথার্থ কথা। আমি স্বর্গবাসী, মধ্যে মধ্যে তোমাদের এস্থানে, মর্ত্ত্যবোধ করিয়া, আসিয়া থাকি।

ভ—আমাদের সে পরম সৌভাগ্য। কিন্তু যা'হক মর্ত্ত্যবাসী এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ গৃহে আজ তোমার আহারের বড়ই কষ্ট হইল।

ন—সে ত হইবারই কথা। কেননা আমি আজ স্বর্গের অমৃত ছাড়িয়া আসিয়াছি।

ভ—(সুশীলার দিকে চাহিয়া) আর একটু মোচার ঘণ্ট আনিয়া দাও। সুশীলা মোচার ঘণ্ট আনিয়া, নিষেধ করিলেও, দাদার পাতে দিলেন।

সু—এইটুকু শুধু (মোচার-ঘণ্ট) খান দাদা !

সুশীলার কথানুসারে নগেন্দ্রবাবু মোচার-ঘণ্ট-টুকু খাইলেন। অবশেষে সুশীলা দুই পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ এবং এক একটী করিয়া সুপক্ক কদলী আনিয়া দিলেন। নগেন্দ্রবাবু তাহা দেখিয়া কহিলেন,—আর ত ভাই ! আমি খাইতে পারিতেছি না।

সু—একটুকু দুদ দাদা ! জল না খাইয়া এই দুদটুকু খাইয়া ফেল।

সুশীলার প্রীতিপূর্ণ বাক্য,——নগেন্দ্রবাবু এমন ভালবাসা অনেক দিন পান নাই——নগেন্দ্র বাবু অবহেলা করিতে সমর্থ হইলেন না। দুগ্ধ টুকু তাঁহাকে সমস্ত পান করিতে হইল। আহার সমাপ্ত হইলে উভয়ে আচমন করণান্তর তাম্বূল গ্রহণ পূর্ব্বক সুশীলার প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

এদিকে সুশীলা পিসীমাকে ভোজন করাইয়া দুটী খাইয়া লইলেন। পরিশেষে পাকগৃহের কাজ কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক কাপড় কাচিয়া সুশীলা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। স্বামী ও দাদা এক শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, সুশীলা ব্যজন দ্বারা উভয়ের গ্রীষ্মজনিত ক্লান্তি অপনোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আহা ! সুশীলার স্নেহ ধন্য ! স্নেহ মহাশক্তি, তাহা না হইলে এত কাজ কর্ম্মের পরেও সুশীলার পরিশ্রম বোধ নাই।

অপরাহ্ন হইলে উভয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সুশীলাকে ব্যজন করিতে দেখিয়া নগেন্দ্রবাবু কহিলেন, সুশীলা ! তুমি একটুকুও বিশ্রাম কর নাই। সুশীলা ভ্রাতার প্রশ্নে আর কি উত্তর দিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন। উভয়ে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলে, কিয়ৎক্ষণ পরে নগেন্দ্রবাবু কহিলেন, আমি এখন যাইব।

ভ—মর্ত্ত্যে আর কতক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা হয় !

ন—ভাই ! আর আমায় লজ্জা দাও কেন ? আমি পূর্ব্বজন্মে অনেক

অপকর্ম্ম করিয়াছি, এ সুখ আমার ভাগ্যে অতি অল্পক্ষণমাত্র ঘটিলেও আপনাকে ধন্য মনে করি।

ভ—তা কাল সকালে গেলে হয় না?

ন—এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছি। সন্ধ্যার মধ্যে না গেলে মা ভাবিবেন।

ভ—আর বৌদিদির কথা বলিতে কি লজ্জা হইল?

ন—তিনি আপনার সুখ-স্বচ্ছন্দতার ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত, আমার ভাবনা ভাবিতে বড় একটা সময় পান না।

ভ—তা আচ্ছা! বৌদিদির সুখ-স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত জন্মাইয়া কাজ নাই।

সু—দাদা! একটু কিছু খাইয়া যাও।

ন—না সুশীলা! এখন আর আমার কিছু খাইবার ক্ষমতা নাই।

সুশীলা দাদার হাতে চারিটী মাত্র পান আনিয়া দিলেন, আর বলিলেন দাদা! আবার একদিন আসিবেন।

ন—আসিব।

নগেন্দ্র বাবু বিদায় চাহিলেন, সুশীলা আর্দ্র হৃদয়ে মা ও বাবাকে উদ্দেশে দণ্ডবৎ করিয়া, দাদার প্রতি উভয়কে প্রণতি নিবেদন করিতে কহিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও জ্যেষ্ঠ শ্যালক, উভয়ে নমস্কার প্রতি-নমস্কার করিলেন। গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় নগেন্দ্র বাবু পুনঃ পুনঃ প্রিয় ভগিনীর অশ্রু-পূর্ণ নয়ন এবং স্নেহমাখা মুখ-খানি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর সহিত ভাগিরথী তীর পর্য্যন্ত আসিয়া যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, তখন একদৃষ্টে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নগেন্দ্রবাবুকে দেখা যায়, অনিমেষ লোচনে চাহিয়া থাকিলেন। শেষ দর্শনে উভয়ে উভয়কে নমস্কার করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং নগেন্দ্রবাবু, পরস্পর পরস্পরকে বড়ই ভালবাসেন, তাহা পাঠকগণ! পরস্পরের ব্যবহারে এবং আলাপনে বুঝিতে পারিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামকৃষ্ণপুর—সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবার।

হাবড়া জেলার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরগ্রাম। রামকৃষ্ণপুর গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান বলিয়া অতি রমণীয়। কিন্তু এখানে পাণিহাটী গ্রাম অপেক্ষা বসতি অধিক। এই পরিচ্ছেদে একটী সম্ভ্রান্ত মুখোপাধ্যায় পরিবার আমাদের বর্ণনার বিষয়। শ্রীযুক্ত কিশোরীচরণ মুখোপাধ্যায় রামকৃষ্ণপুরের একজন বিখ্যাত সঙ্গতিপন্ন জমিদার। তদীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক আয় অন্যূন তিন লক্ষ টাকা। বাবুর একটী একাদশ বর্ষীয় পুত্র এবং একটী অষ্টম বর্ষীয়া কন্যামাত্র সন্তান সন্ততি। পত্নী ব্রজসুন্দরী রূপে গুণে অতুলনীয়া। তাঁহার সৌন্দর্য্য এবং সুশীলতা, বিনয় এবং কারুণ্যগুণে কিশোরী বাবু হইতে সংসারের দাসদাসী এবং যাবতীয় পাড়াপ্রতিবাসী মুগ্ধ।

ধনীলোকের পরিবার কখনও অল্প হয় না। কিশোরীবাবুর অনেক আত্মীয়স্বজন তদীয় পরিবারভুক্ত হইয়া প্রতিপালিত হন। সকলের পরিচয় দেওয়া এস্থলে অনাবশ্যক। কিশোরী বাবু পিতার একমাত্র সন্তান। ইতঃপূর্ব্বে কিশোরী বাবু প্রচ্ছন্নভাবে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল কোন মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়া কিশোরী বাবু কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন। পুরুষানুক্রমে কিশোরী বাবুদের বাটীতে শ্রীশ্রীরাধা-রমণের সেবা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অধুনা কিশোরী বাবু মহাপুরুষের কৃপাবলে যথেষ্ট অনুরাগ এবং উৎসাহের সহিত ঠাকুরের সেবা-কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে তৎপর। কিশোরী বাবুর বাটীতে আজকাল প্রত্যহ

সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনগান হইয়া থাকে এবং বারমাস নানাবিধ উৎসব উপলক্ষে সাধু বৈষ্ণবের সেবাকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়।

কিশোরী বাবুর বাড়ী গঙ্গা হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। বাড়ীখানি কিশোরী বাবু সম্প্রতি তাঁহার মার্জ্জিত রুচি অনুযায়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাড়ীখানি চারি মহলে বিভক্ত। প্রথম মহল দপ্তরখানা, দ্বিতীয় মহল শ্রীঠাকুরমন্দির, তৃতীয় মহল অন্তঃপুর, চতুর্থ মহল একটী পুষ্করিণী, তাহার উত্তর পারে একখানি দ্বিতল প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ,— পুষ্করিণী এবং উদ্যানবাটীর চতুর্দ্দিকে বাগান। কিশোরী বাবুর মাতা ঠাকুরাণী হরমোহিনী সেই নির্জ্জন বাটীতে অনেক সময় যাপন করেন। অট্টালিকাখানি দক্ষিণদোয়ারী ; দ্বারবানদিগের থাকিবার নিমিত্ত ফটকের থাম সংলগ্ন দুইখানি ছোট ছোট ঘর। সম্মুখে ফুলের কেয়ারী করা বাগান, তাহার পর গাড়ি-বারান্দা। প্রথম মহলে দশখানি ঘর, সম্মুখে চারিখানি, মধ্য দিয়া প্রথম মহলে প্রবেশের পথ ; পূর্ব্বদিকের দুইখানির মধ্যে একখানি কর্ত্তা বাবুর বৈঠকখানা, আর একখানি পুত্র রাধাপদর পাঠগৃহ। পশ্চিমদিকের প্রকোষ্ঠদ্বয় দপ্তরখানা। ভিতরে, পূর্ব্ব আর পশ্চিম দিকে অতিথি অভ্যাগতগণের থাকিবার জন্য তিন তিন খানি করিয়া ছয় খানি ঘর। দ্বিতীয় মহল ঠাকুর মন্দির এবং সেবাসংক্রান্ত গৃহ। মন্দিরটী পূর্ব্বমুখী, দুইপার্শ্বে দুইখানি মন্দির সংলগ্ন গৃহ, একদিকে ভোগের দ্রব্য ও আর একদিকের ঘরে প্রসাদী দ্রব্য সংরক্ষিত হয়। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে উচ্চ সুবৃহৎ জগমোহন বা নাটমন্দির। দক্ষিণদিকে আর চারিটী প্রকোষ্ঠ, তাহাদের মধ্য দিয়া ঠাকুর মন্দির দর্শন করিতে যাইতে হয়। উত্তরদিকেও ঐরূপ চারিখানি ঘর, মাঝখান দিয়া অন্তঃপুর প্রবেশের পথ। দক্ষিণদিকের ঘরগুলির মধ্যে একটী ঘরে ঠাকুর সেবার দ্রব্যাদি রাখা হয় এবং অন্যটীতে সংস্কারাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করা হয়।

আর দুইটী দর্শনার্থ আগত স্ত্রীলোকদিগের বিশ্রামঘর। উত্তরদিকের তিনটী ঘরে পাক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। একখানিতে সিদ্ধপক্ক ও অন্য খানিতে ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত হয়। আর একখানিতে কর্ত্তাবাবুর বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীরাধারমণের জন্য বিশেষ বিশেষ ভোগের দ্রব্য (খাদ্যাদি) পাক করেন। আর একখানি তাঁহারই ভাণ্ডার ঘর, ঠাকুরের নিমিত্ত তাঁহারই মনোমত দ্রব্যাদি সঞ্চিত হয়। জগমোহনের পূর্ব্বদিকে একটী পুষ্করিণী, তাহার চতুর্দ্দিকে ফুলের বাগান। তাহার পর অন্তঃপুর, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকে উপর নীচে চব্বিশখানি ঘর। অন্তঃপুরের পশ্চাতে পুষ্করিণী ও বাগানবাটী। জগমোহনের পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণীর পূর্ব্বপারে কয়েকখানি ঘর আছে, তাহাতে কয়েকজন ভৃত্য, আর দুইটী ঘরে কয়েকটী ছাত্র থাকেন। তাঁহারা কিশোরী বাবুর দ্বারা প্রতিপালিত হন এবং স্কুলের বেতন ও পুস্তক পান।

যে সূত্রে কিশোরী বাবুর ধর্ম্মমত ফিরিল, তাহার বিবরণ পাঠকগণ শুনিতে উৎসুক হইতে পারেন। প্রথম,—কিশোরী বাবুর মাতাঠাকুরাণী পরম শ্রীকৃষ্ণভক্ত। কিন্তু মাতার বিশ্বাসকে অনেক সময়ে কিশোরী বাবু উপহাস করিতেন। তাহা হইলেও, পুত্রবৎসলা জননী সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করা ছাড়া আর কখনও শিক্ষা দান করিতে যাইতেন না। পুত্র শিক্ষিত, এক সময় ভক্তের কৃপাদৃষ্টি হইলে পুত্রের মতি ফিরিয়া যাইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। মাতার আশীর্ব্বাদ অচিরে ফলিল।

একদিন কিশোরী বাবু তাঁহার পুরাতন বাটীর ফটকের সম্মুখে বসিয়া আছেন, হঠাৎ কোন অদ্ভুত অসাধারণ তেজোমণ্ডিত মহাপুরুষ তাঁহার নয়নগোচর হইলেন। মহাপুরুষ "হরে কৃষ্ণ" মন্ত্র উচ্চ করিয়া বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেছেন। দূর হইতে কিশোরী বাবু তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র যেন তাঁহার মন এবং শরীর গলিয়া যাইতেছে, অনুভব

করিলেন। ক্রমে মহাপুরুষ নিকটবর্ত্তী হইতেছেন,—ক্রমে কিশোরী বাবু বুঝিতেছেন, যেন তাঁহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়া একটী নদী হইল এবং তাহা অনন্ত তরঙ্গে,—ক্ষিপ্রগতিতে যেন কাহারও পানে ছুটিতেছে। ছুটিতেছে,—ক্রমাগত ছুটিতেছে। আর কাহারও কথা মনে নাই,—আর কাহারও প্রতি দৃষ্টি নাই। ছুটিতে ছুটিতে দেখিলেন, অদূরে অভূতপূর্ব্ব তরঙ্গায়িত অপার সমুদ্র, তাহাতে অনন্ত সুখময়ী লহরী, তাহাদের অশ্রুতপূর্ব্ব কর্ণরসায়ন নিনাদ। যেমন সেই সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইলেন, দেখিলেন তাঁহার পিতৃপুরুষসেবিত শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ, বিষাদমাখা হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কিশোরী চরণ! আমার সেবা কর। দেখ, সেবা অভাবে আমি শুকাইয়া গিয়াছি।" দ্রব হৃদয় কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "এখন হইতে করিব, আমায় ক্ষমা করুন।" কিশোরী বাবু এক মুহূর্ত্ত মধ্যে এতগুলি ভাবতরঙ্গ হৃদয়ে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, চত্বর হইতে ভূমিতে পড়িলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, মহাপুরুষ তাঁহার নিকটে উপনীত। কিশোরী বাবুর মস্তক মহাপুরুষের শ্রীচরণে সংলগ্ন হইল। তিনি হস্ত ধরিয়া কিশোরী বাবুকে সেইরূপ অচেতন অবস্থায় উঠাইলেন। অতি গম্ভীর স্বরে মহাপুরুষ ডাকিলেন, "কিশোরী চরণ!" মধুর বংশীধ্বনির ন্যায় মহাপুরুষের সম্বোধন কিশোরী বাবুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ভাবসমুদ্রে যে একটা তুফান উঠিয়া তিনি আপনহারা হইয়াছিলেন, তখন বোধ হইল, যেন কি এক রসের স্রোত তাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিয়া প্রাণ, মন, দেহ স্নিগ্ধপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ শব্দরূপে মূর্ত্তিমান হইয়া আহ্বান করিতেছে,—"কিশোরী চরণ!" তখন আর সেই কিশোরী বাবু নাই। কিশোরী বাবু অশ্রুসিক্তনয়নে রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—প্রভু!

ম—বৎস! উঠ।

কিশোরী বাবু এতক্ষণ কোন চেষ্টা শূন্য অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু মহা-

পুরুষের কথায় যেন দেহে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল; তিনি উঠিলেন। উঠিয়া কৃতাঞ্জলিহস্তে দণ্ডায়মান। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, প্রভু! বাটীর মধ্যে আসিতে আজ্ঞা হয়। "এখন না, আমার সহিত অমুক স্থানে, অমুক সময়ে আগামী কল্য দেখা করিবে।" কিশোরী বাবু স্বীকৃত হইলে তদ্দণ্ডেই মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

এই যে ঘটনা হইল, সে সময়ে ভগবতেচ্ছায় রাস্তায় কোন লোক ছিল না। সন্ধ্যা অতীত প্রায়। কিশোরী বাবুর বাটী ঠিক বড় রাস্তার উপরে নহে, একটী গলির ভিতর। মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলে কিশোরী বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রায় ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একবার শ্রীরাধারমণ দর্শন করিতে যাইলেন। তখন আরাত্রিক সমাধা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের প্রতি যেমন দৃষ্টি পড়িল, আবার দেখিলেন ঠাকুরের মুখে শুষ্ক হাসি। শুনিলেন, "কিশোরী চরণ! আমার সেবা কর। দেখ, সেবা অভাবে আমি শুকাইয়া গিয়াছি।" কিশোরী বাবু প্রণাম করিবার সময় সরল অন্তঃকরণে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর! আমি নরাধম, আমায় সুমতি দাও, তোমার সেবা করিয়া শান্তি লাভ করিব।"

কিশোরী বাবু বড় একটা ঠাকুর মন্দিরে যান না। আজ পূজারী ও ভৃত্যেরা তাঁহাকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ঠাকুরের অগ্রে দণ্ডবৎ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিশোরী বাবু প্রণাম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। একবার ভাবিলেন, মার কাছে গিয়া সকল কথা বলি, আবার মনে করিলেন,—আজ নয়, কাল যদি প্রভুর দর্শন পাই, তবেই এই কথা মাকে বলিব, নতুবা এখন বলিয়া ফল কি? হায়! আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম কেন? আমিই বা কি করিব? তিনি ইচ্ছাময়, আমার কথা তিনি শুনিবেন কেন? কিন্তু তাঁহার কথাগুলি কি সুধামাখা! কি অমৃতময়! হায়! আবার কি তাঁহার দর্শন পাইব? তিনি বলিয়াছেন,

"আবার দেখা হইবে।" আহা! কি হৃদয়-বিমোহনকারী মূর্ত্তি, দর্শনে প্রাণের মধ্যে যেন কত তরঙ্গ উথলিয়া উঠে। বহুসংখ্যক ভাবলহরী মধ্যে আজ কিশোরী বাবুর অন্তঃকরণ কখনও হেলিতেছে, কখনও দুলিতেছে, কখনও বা ডুবিতেছে। আজ কিশোরী বাবু সহসা নূতন রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। পুনঃ পুনঃ কিশোরী বাবু মহাপুরুষকে নিকটস্থ হইতে দেখিতেছেন। পুনঃ পুনঃ তাঁহার মূর্চ্ছাবস্থা আসিতেছে, কিন্তু মহাপুরুষের কৃপায় আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছেন। এবম্বিধ অবস্থায় কিশোরী বাবু স্ত্রীর অনুরোধে সামান্য জলযোগ করিলেন। বলিলেন, "আমি আজ আর কিছু খাইব না, আমি শুইলাম; আমায় আর ডাকিও না।"

ব্রজ—আজ তোমার কি হ'য়েছে? তোমার মুখ চোক কেমন কেমন দেখা যায়!

কি—কিছু নয়, মাথার ভিতর যেন কি করিতেছে।

ব্র—কবিরাজ ডাকিতে পাঠাইব?

কি—কোন প্রয়োজন নাই, তুমি অন্য কাজ দেখগে। কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে না।

ব্র—এখন আর কি কাজ দেখিব?

কি—তবে এইখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাক।

এই বলিয়া কিশোরী বাবু শুইয়া পড়িলেন। সাধ্বী ব্রজসুন্দরী পতির কি হইয়াছে বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিশোরী বাবু ভাবিলেন, ভালই হইল; বাটীর মধ্যে এখন যাইলে, কাহাকে না কাহাকে বলিয়া গোলমাল করিত। অধিকক্ষণ কিশোরী বাবুর মনে আর এ চিন্তা স্থান পাইল না। সেই সৌম্যমূর্ত্তি, প্রেমে টলমল করিতেছে, মানস পথে দাঁড়াইলেন। আবার

শুনিতেছেন মধুর অমৃতময়ী বাণী "কিশোরী চরণ!" আবার কিশোরী বাবুর চিত্তে যখন তটস্থ ভাবের সঞ্চার হইতেছে, তখন ভাবিতেছেন, এ অবস্থাটী কি? একবার যাঁহার দর্শনে চিত্তের এবম্বিধ ভাবালোড়িত অবস্থা, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে। তাইত, আমার কি সত্যই এই অবস্থা হইয়াছিল? সত্যই ত এখনও পর্য্যন্ত আমি চেষ্টা করিয়াও স্থির হইতে পারিতেছি না। অপর কিছুই চিন্তা করিতে আমার সাধ্য হইতেছে না। আহা! কি সুখের অবস্থা! ভগবান যাহার চিত্তে এরূপ প্রতিফলিত হন, তাহার কি আনন্দের অবস্থা! শ্রীরাধারমণ! আহা! রাধারমণের সেই বিষাদমাখা হাসি। ওষ্ঠ দুইখানি কত শুকাইয়া গিয়াছে। ওঃ! আমি কি নিষ্ঠুর! আমার কি দুর্ম্মতি! ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পিতৃপুরুষসেবিত রাধারমণের সেবায় অবহেলা করিয়াছি! কিন্তু রাধারমণ কে? ঠাকুর। রাধারমণকে ত আমি মানি না। আমার ব্রহ্ম নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপ। কিন্তু রাধারমণ আমার সহিত কথা বলিলেন। কি মিষ্ট কথা, তবু বিষাদমাখা। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ত আমার সহিত কোন দিন এমন করিয়া কথা বলেন নাই। তাইত, আবার কাল মহাপুরুষের দেখা পাইলে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ মিটাইব। আবার কি তাঁহার দর্শন পাইব! কিশোরী বাবুকে অধিকক্ষণ আর চিন্তা তরঙ্গে তুলিতে হইল না। ভগবতেচ্ছায় তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন। স্বামী নিদ্রিত হইলে ব্রজসুন্দরী স্থির করিলেন, কোন নূতন চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। এখন যখন ঘুমাইয়াছেন, তখন আর কাহাকেও কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। রাত্রি হইলে, ব্রজসুন্দরী স্বামীর ভুক্তাবশেষ কিছু আহার করিয়া স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাপুরুষের ধর্ম্মতত্ত্ব-উপদেশ

জ্যোৎস্নাবিধৌত রজনী। আমাদের কিশোরী বাবুর বাটী নীরব। কালের আক্রমণে যাবতীয় প্রাণী অচেতন। কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে নিশাচরগণের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রমে তিন প্রহর রজনী অতিবাহিত। কিশোরী বাবু স্বপ্নে মহাপুরুষকে অবলোকন করিতেছেন। ভাগীরথী তীর, একটা নির্জ্জন স্থানে তাঁহার চরণপ্রান্তে কিশোরী বাবু উপবিষ্ট। মহাপুরুষের সহিত তিনি উচ্ছলিত হৃদয়ে কতবিধ সুখময় আলাপনে নিবিষ্ট চিত্ত। সেই কথোপকথনের মধ্যে উপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার কত সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে। অনেক সময় আলোচনার পর মহাপুরুষ আজ্ঞা করিলেন, "তবে এখন গৃহে যাও, সময় মত আবার তোমার সহিত দেখা হইবে।" অতি ব্যাকুলতা ব্যঞ্জক স্বরে কিশোরী বাবু কহিলেন, "সে আর কবে প্রভু!" "আমি ত তোমাদেরই আছি, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিবার আবশ্যক কি? শ্রীভগবানের লীলাশক্তি এ সকল বিষয় অবগত আছেন, আমরা সেই লীলাশক্তির ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র। উপযুক্ত সময়ে আবার দেখা হইবে।" ইহা বলিয়াই মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

যেমন স্বপ্ন ফুরাইল, কিশোরী বাবু জাগরিত হইলেন। হস্ত দ্বারা চক্ষু-মার্জ্জনা করিতে গিয়া বুঝিতে পারিলেন, স্বপ্নাবস্থায় তিনি কাঁদিয়াছেন। ভাবিলেন, আমি মহাসৌভাগ্যবান, স্বপ্নেও প্রভু দর্শন দিয়া কত উপদেশ করিলেন। আজ সন্ধ্যার সময় অমুক স্থানে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

পুনরায় মহাপুরুষের দর্শন পাইবার আশায় কিশোরী বাবুর হৃদয় উৎফুল্ল হইল। কিশোরী বাবু শয্যা পরিত্যাগ করিবার মানস করিতেছেন, এমন সময় সাড়া পাইয়া ব্রজসুন্দরী উঠিয়া বসিলেন। স্বামী সম্বন্ধে অন্ধকার অনিশ্চিত অভিনব ঘটনাবিষয় জানিতে একান্ত অভিলাষিণী সাধ্বী স্ত্রীও স্বপ্নে স্বামীকে জাহ্নবীতীরে উল্লিখিতভাবে কথোপকথন করিতে দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে সে কথার উল্লেখ না করিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাথা সারিয়াছে?

কি—মাথা না সারাই ভাল।

ব্র—কেন?

কি—আমার মাথার যে অসুখ করিয়াছে, তাহা বাঞ্ছনীয়।

ব্র—কি হইয়াছে, সত্য করিয়া বল না।

কি—এখন বলিব না।

ব্র—কাল কিছু বলিলে না, আজও বলিতেছ, এখন বলিব না, আমি কি অপরাধ করিয়াছি!

কি—এতে অপরাধের কথা কি আছে?

ব্র—তবে বল না কেন।

কি—আজ রাত্রে বলিব।

ব্র—তোমার পায়ে পড়ি; আমায় বলিলে কি কিছু——

কি—তুমি এত ব্যস্ত হইতেছ কেন?

ব্রজসুন্দরীর ঘটনা জানিতে অধিকতর আগ্রহান্বিতা হইবার কারণ স্বপ্ন দর্শন। কিশোরী বাবুর তাহা বলিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু অগ্ৰ মহাপুরুষের দর্শন পাইলে অনেক মনের দুঃখ কথা জানাইবেন, সম্প্রতি মনে মনে সেই সকল কথার যোজনা করিতে ব্যস্ত। সুতরাং মহা-পুরুষের পুনর্দর্শন না হওয়া অবধি আর কাহাকেও তাঁহার সম্বন্ধে কোন

কথা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই। ব্রজসুন্দরী তাঁহার মনের অবস্থা জানিতে একান্ত ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিলেও তাঁহার সংকল্প ভঙ্গ হইল না। পতিপ্রাণা স্ত্রী এইবার স্বামীকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিবার অবকাশ পাইলেন।

ব্র—আমি স্বপ্নের মধ্যে তোমাকে এক অপরূপ মহাপুরুষের সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়াছি।

কি—সত্য !!

ব্র—সত্যই আমি দেখিয়াছি, এখনও যেন চক্ষুর সম্মুখে তিনি উপস্থিত রহিয়াছেন।

কি—কিরূপ দর্শন করিয়াছ বল দেখি।

ব্র—সুদীর্ঘ গৌরাকৃতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধূলিমণ্ডিত হইয়া অপরূপ দৃষ্ট হইতেছেন। কণ্ঠে তুলসীর মালা। সর্ব্বাঙ্গ হইতে অভূতপূর্ব্ব নয়ন-স্নিগ্ধকর জ্যোতিঃ অভ্যুদিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। মুখে সুমধুর ভুবন মঙ্গল "হরে কৃষ্ণ" নাম,—যেন শান্তি-সুধা অবিরল ধারায় শ্রীমুখ-কমল হইতে নিসৃত হইয়া সংসার প্লাবিত করিবার উপক্রম করিতেছে। প্রেমাশ্রুপূরিত-আয়ত-লোচনদ্বয় একবার যাহার পানে শুভ-দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহাকে সহসা অনন্ত ভাব-লহরী-সুশোভিত অতলস্পর্শ কোন বিচিত্র সমুদ্রে লইয়া, কখনও ভাসাইতেছে, কখনও ডুবাইতেছে। কিবা সুমধুর অঙ্গগন্ধ দিগন্ত প্রসারিত হইয়া সদর্পে জগতের নাসাবিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক সংসার উন্মত্ত করিবার নিমিত্ত আস্ফালন করিতেছে। আর এক একটী পদনখ, কোটী সুশীতল চন্দ্র অপেক্ষাও স্নিগ্ধতা-গুণ-সমন্বিত হইয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসারকে শীতল করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে।

উপরোক্ত কথাগুলি ব্রজসুন্দরী যেন কি আবেশে বলিয়া গেলেন। কিশোরী বাবুর তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না, কৈননা তিনি কখনও ব্রজ-সুন্দরীকে এইরূপ ভাবে বর্ণন করিয়া কথা বলিতে শুনেন নাই। স্বপ্ন

বিবরণ শ্রবণ করিয়া কিশোরী বাবু অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাপুরুষের অত্যদ্ভূত মহিমা! অভাবনীয় কৃপা! ব্রজসুন্দরী স্বপ্ন-কথা বলিতে বলিতে ভাবে বিভোর! কিয়ৎক্ষণ পরে সেই প্রেমাবস্থা অপগত হইলে ব্রজসুন্দরী কহিলেন, "আমি কি বলিতে কি বলিলাম!"

কি—তুমি সমস্তই সত্য কহিয়াছ।

ব্র—কি সত্য কহিলাম, তুমি বল না।

তখন কিশোরী বাবু মহাপুরুষের দর্শনাবধি আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা পত্নীর নিকট বর্ণনা করিলেন। ব্রজসুন্দরী স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার সহিত যথার্থ বিষয়ের এতাধিক ঐক্য দর্শনে আনন্দে অবশ-প্রায় হইয়া আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণ পরে কিশোরী বাবু কহিলেন, "দেখ আজ আমায় সন্ধ্যার পর অমুক স্থানে সাক্ষাৎ করিতে প্রভু আদেশ করিয়াছেন।"

ব্র—তুমি যাইবে, সঙ্গে একজন লোক যাইবে।

কি—কেহ না গেলেই ভাল হয়।

ব্র—তা'তে কি হইল, তাহাকে কোথাও বসিতে বলিয়া তুমি প্রভুর নিকট যাইবে।

কি—ভাল পরামর্শ।

স্বামী স্ত্রীর কথোপকথন শেষ হইল, রাত্রিও প্রভাত হইল। ব্রজসুন্দরী কহিলেন, "আমি এখন বাহিরে যাই, সন্ধ্যার পূর্ব্বে তবে আমার সহিত একবার দেখা করিয়া যাইও।" পত্নীর কথায় কিশোরী বাবু স্বীকৃত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে কিশোরী বাবুও শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। হস্তমুখ প্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীরাধারমণ অগ্রে দণ্ডবৎ পুরঃসর আমলাদিগের মধ্যে প্রধান কর্ম্ম-

চারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ আমার শরীর ভাল নয়, কোন কাজ কর্ম্ম দেখিতে পারিব না।" কর্ম্মচারী "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিশোরী বাবু অন্তঃপুর মধ্যে কোন নির্জ্জন প্রদেশে যাইয়া বসিলে পর স্বীয় জীবনের আনুপূর্ব্বিক ঘটনাবলী স্মরণ পথে উদিত হইতে লাগিল।——

বাল্যকালের সরলতা, সেই ধূলা খেলার অবস্থা,—মনে কোন লালসা নাই,—কোন উদ্বেগ নাই। তাহার পর কৈশোর বয়স, পাঠ্যাবস্থায় পরীক্ষা প্রদানকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবার নিমিত্ত কতই উৎসাহ—কতই পরিশ্রম। তাহার পর যৌবনকাল, একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, অন্যদিকে যৌবনোচিত হৃদয়ের ভোগ-লালসাময়ী-বৃত্তি। প্রবেশিকা এবং এল্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বি, এ, পরীক্ষার সময় পিতার কাল হয়। তখন জীবনের সন্ধি-স্থল। একদিকে শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বিষয় সম্পত্তি পরিদর্শন এবং রক্ষা করিবার প্রয়োজন। শেষটী বলবান হইল। এইখানেই ছাত্র জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ।

তখন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বাঙ্গালার চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইবার উদ্যম দেখা যায়। আবার ব্রাহ্মসমাজের মতও অনেকে যাজন করিতে আগ্রহান্বিত। এই সময় আমাদের কিশোরী বাবু শিক্ষিত যুবক, পৈত্রিক সম্পত্তির নবীন পরিচালক একটা কিছু সুবিশাল ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইতে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত। প্রতিষ্ঠা বড়ই লোভনীয় বস্তু। আমরা অনেক সময়ে প্রতিষ্ঠাশী হইয়া বৃহৎ কার্য্য আরম্ভ করি, কিন্তু পরিণামে আত্মগ্লানি এবং লোকাপবাদ সার হয়। "যেমন মন, তেমনি ধন।" যৌবনোচিত হৃদয়ের উত্তেজনায় কিশোরী বাবু মনে করিলেন, আমি কোন বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। এবং সেই কার্য্য কি, তাহাও অতি শীঘ্র

নিরূপিত হইল। হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কার পরিপূর্ণ, সঙ্গ প্রভাবে এ বিশ্বাস ছাত্র-জীবন হইতেই তিনি পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু স্বধর্ম্ম-নিরত পিতৃদেবের সমক্ষে কোনক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। সম্প্রতি জনকের অবর্ত্তমানে ব্রাহ্মধর্ম্ম মতানুসন্ধিৎসু হইয়া তৎসংক্রান্ত গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। পুস্তকগুলি পড়িতে তাঁহার বেশ ভাল লাগিল। আর উপদেশগুলি হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার সকলের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক মার্জ্জিত রুচি অনুযায়ী হইয়াছে, তাহা কিশোরী বাবু অতি শীঘ্র অনুভব করিয়া ফেলিলেন। তখন আমাদের নবীন যুবকের নবীন উদ্যমের সহিত ভারতবর্ষ হইতে যাবতীয় কুসংস্কার বিদূরিত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মত স্থাপন করিতে দৃঢ় অভিলাষ জন্মিল। কিন্তু মাতৃস্নেহবশে সহসা প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত হইতে অক্ষম হইয়া, গোপনে তৎসংক্রান্ত পত্রিকাতে উৎসাহের সহিত লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মগণ শত মুখে লেখকের প্রশংসা গান করিতে লাগিলেন। এতদুপ-লক্ষে তাঁহার বহু পরিমাণ অর্থব্যয়ও হইতে লাগিল। কিছু দিন এইভাবে গেল। কাগজে অন্য ধর্ম্মমতকে খণ্ডন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুগণের আচরণের উপর কটাক্ষ, আর চাঁদার খাতায় সাঙ্কেতিক সহি করেন। কিন্তু নিজের চিত্তশুদ্ধিতা বিষয়ে ভাবিয়া দেখিতে সময় পান না। অনুরুদ্ধ হইয়া দুই একদিন গোপনভাবে সমাজে গিয়াছিলেন, কিন্তু উপাসনার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুমাত্র শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্ম-দিগের মধ্যে কাহারও সহিত একদিনের জন্যও প্রাণের মিল হইল না। সুখ হয় কিসে? শান্তি কেমন করিয়া লাভ করা যায়? কাহাকেও কটাক্ষ করিয়া সুখী হওয়া যায় না, কাহাকেও তর্কে পরাস্ত করিতে পারিলে শান্তিলাভ করা যায় না। মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরূপণ পূর্ব্বক তৎসাধনে ব্রতী না হইতে পারিলে সুখপ্রাপ্তির আশা, বৃথা অনর্থকরী

কল্পনামাত্র। হৃদয়ে আত্ম-সুখ বাসনার ছায়া পর্য্যন্ত থাকিতে শান্তিদেবীর অঙ্কলাভাকাঙ্ক্ষা আকাশ কুসুম সদৃশী।

ক্রমে কিশোরী বাবুর আর কাগজে লিখিতে ভাল লাগে না, চাঁদার খাতায় সহি করাইতে আসিলে, আর তেমন উৎসাহের সহিত সহি করিতে পারিতেন না। কিন্তু মনের কথা মনেই আছে, আর দুঃখের কথা কাহা-কেই বা বলিবেন? যখন কিশোরী বাবু স্বীয় হৃদয় একেবারে শুষ্কপ্রায় অনুভব করিতেন, তখন অনুতাপে, কষ্টে ছট্‌ফট্‌ করা ছাড়া আর কাঁদিতে সক্ষম হইয়াও তাপিত প্রাণের শীতলতা বিধান করিতে পারিতেন না।*

এইরূপ অনুতাপক্লিষ্ট অবস্থায় একদিন কিশোরী বাবু কোন নির্জ্জন স্থানে উদাস প্রাণে বসিয়া আছেন, হঠাৎ হৃদয়ে কি অভিনব ভাব আসিবা-মাত্র চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রুবর্ষিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক কাঁদিলেন, কাঁদিবার পর হৃদয়ে কিছু শান্তি অনুভব করিলেন। তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই শান্তি কোথা হইতে আসিল? আমি অনেক দিন অবধি এইরূপ শান্তি সম্ভোগে বঞ্চিত ছিলাম। কিন্তু এই শান্তিদাতা কে? বোধ হইতেছে যেন আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। (কিশোরী বাবুর অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল)। ব্রহ্ম নিরাকার বস্তু। এই শান্তিদাতা কি নিরা-

---

* এস্থলে ব্রাহ্মধর্ম্ম একেবারে অন্তঃসারবিহীন তাহা প্রমাণিত হইতেছে না। কিন্তু কিশোরী বাবুর ব্রাহ্মধর্ম্মে ভুক্ত হইবার কারণ, প্রতিষ্ঠা, শান্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা নহে। কাজেই তাহার পরিণাম মন্দ হইল। যথার্থ প্রাণের আবেগে, ঈশ্বরুন্মুখীবৃত্তি লইয়া যে কোন ধর্ম্ম মত যাজন করা যায়, সেই যাজনানুযায়ী যে সিদ্ধাবস্থা তাহা সাধক সাধন বলে লাভ করিবেনই করিবেন।

কার? নিরাকার ভাবিতে কিছু সুখ নাই। শান্তির কি মূর্ত্তি নাই? শান্তিময় মূর্ত্তি কি অসম্ভব? অশান্ত ভাব সম্পন্ন আমি, আমার মূর্ত্তি হইতে পারিল, শান্তভাবের মূর্ত্তি নাই। আমার মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? আমার মূর্ত্তি-সৃষ্টিকর্ত্তার মূর্ত্তি নাই? ইহা অসম্ভব কথা। আমার মূর্ত্তি পার্থিব, সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ের অধীন। ভগবদ্‌বিগ্রহ অপার্থিব, অপ্রাকৃত, শান্তিময়, নিত্য সৌন্দর্য্যশালী। তাঁহার মূর্ত্তি নাই, এ কথা মনে আনিলেও বিষম অপরাধ হয়। এতদিন কি আমি মিথ্যা ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া লোক বঞ্চনা করিতেছিলাম। হায়! হায়! কি দুর্ম্মতি! এখন আমায় এই মহাপাপ হইতে কে উদ্ধার করিবে? কে আমায় সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদ্ বিগ্রহ দর্শন পাইবার উপায় বলিয়া দিবে? এইরূপ প্রাণের ব্যাকুলতায় দিন অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময়ে কিশোরী বাবু মহা-পুরুষের দর্শন লাভ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা হইল। ব্রজসুন্দরী স্বামীকে অন্বেষণ করিতে করিতে যথাস্থানে আসিয়া দেখিলেন, স্বামী বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে ছেন। ধীরে ধীরে একবার ডাকিলেন,—কোন সাড়া শব্দ নাই। আর একবার ডাকিলেন, তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। তখন ব্রজসুন্দরীর ভয় হইল; মনে করিলেন, এমন কেন হইল? ভাবিয়া ভাবিয়া আবার মাথার অসুখ বৃদ্ধি হইবে নাকি? আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ব্রজসুন্দরী স্বামীর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, এত ডাকিতেছি, তবু শুনিতেছ না। কিশোরী বাবু স্ত্রীর হস্তস্পর্শে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন,—কখন আবার তুমি ডাকিলে?

ব্র—বাঃ! ডাকিয়া ডাকিয়া হার মানিয়া গেলাম, তোমার সাড়া পাওয়া যায় না।

কি—যাও! মিছা কথা বলিও না।

ব্র—বেশ আমি মিছা বলিলাম, আর তুমি সত্য বলিতেছ। আচ্ছা! এখন চল, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

কি—চল; কত বেলা হয়েছে?

ব্র—বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে।

কিশোরী বাবু, স্ত্রীর আগ্রহে আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া, গৃহাভিমুখে চলিলেন। মেঝেয় সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। কিশোরী বাবু হস্তমুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আহার করিতে বসিলেন। পিতা মাতার শাসনে বাল্যকাল হইতে কিশোরী বাবুর অখাদ্য এমন কি মৎস্যাদিতে পর্য্যন্ত রুচি জন্মিতে পারে নাই। আজ ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধারমণের কিছু প্রসাদ আনাইয়া রাখিয়াছেন। আগ্রহের সহিত কিশোরী বাবু প্রথমেই সেই সমস্ত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর ভোজন সমাপন পূর্ব্বক সহধর্ম্মিণীকে আহার করিয়া তাড়াতাড়ি আসিতে কহিলেন। সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিয়া ব্রজসুন্দরী দ্রুত গিয়া মাকে অতি যত্নপূর্ব্বক প্রসাদ ভোজন করাইলেন। তাহার পর আপনি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ভুক্তাবশেষ অতি প্রীতির সহিত আহার পূর্ব্বক কিঙ্করীগণের উপর সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া, অনতিকালমধ্যে স্বামীব নিকট সহাস্যবদনে আসিয়া উপনীত হইলেন।

কি—খুব তাড়াতাড়ি আসিলে ত!

ব্র—মা প্রসাদ পাইলেন, তারপর আমি সেই পাতে প্রসাদ পাইয়া আসিলাম, তাড়াতাড়ি কি করিয়া হইল?

কি—একটী পান খাইতেও সময় পাও নাই, এই পান লও।

ব্র—(হস্তে পান লইয়া) তাড়াতাড়ি আসিতে বলিলে কেন, এখন তাই বল।

কি—আজ প্রভুর সঙ্গে দেখা হইলে কি কথা বলিব?

ব্র—তা, আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ যে ?

কি—তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন,—তবে তুমি সব কথা শুনিলে কেন ?

ব্র—শুনিলেই কি আমার পরামর্শের উপর এত দাবি হয় ?

কি—সত্য, আমি মনে কত কথার যোজনা করিতেছি, একবার ভাঙ্গিতেছি, আবার গড়িতেছি। অবশেষে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম।

ব্র—আমি বলিব ?

কি—বল।

ব্র। ও ভাঙ্গিলে গড়িলে কোন ফল নাই। তিনি আপনা হইতেই কৃপা করিয়া তোমার মনের সন্দেহ দূর করিয়া দিবেন।

কি। ঠিক কথা! তোমার পরামর্শ ই মানিলাম।

ব্র। আচ্ছা! আমি কি তাঁহার দর্শন পাইব না।

কি। তুমি ত তাঁহার দর্শন পাইয়াছ।

ব্র। তাঁহাকে একবার দর্শন করিলে আর কি দেখিতে সাধ হয় না ?

কি। আমার সঙ্গে যাইবে ?

ব্র। তা' হইতে পারে না। আমার কথা তাঁহার নিকট একটু জানাইও!

কি—আচ্ছা।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দম্পতী অতীব প্রফুল্ল অন্তঃকরণে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে অপরাহ্ন হইল। কিশোরী বাবু মহাপুরুষ-দর্শন লালসায় উৎকণ্ঠিত চিত্ত। ব্রজসুন্দরী স্বামীর উৎকণ্ঠা অনুভব করিয়া মনোনুযায়ী কথা বলিতেছেন। কিশোরী বাবুর পত্নী যথার্থ সহধর্ম্মিণী। এতদ্বিষয়ে কিশোরী বাবুকে হৃদয়ে কখনও

দুঃখ পাইতে হয় নাই। কিশোরী বাবুর যখন ব্রাহ্মমত ছিল, ব্রজসুন্দরী তখনও স্বামীর মনোমত কথা বলিতেন। ব্রজসুন্দরী বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং গার্হস্থ্য কাজকর্ম্মেও অতীব নিপুণা।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ব্রজসুন্দরী স্বামীর নিমিত্ত জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। নানাবিধ ফল, দুগ্ধ, একখানি পাথরের রেকাবিতে কয়েকখানি লুচি ও কিছু তরকারী, আর একটী পাত্রে কয়েকটী সন্দেশ, এক গ্লাস জল, প্রভৃতি প্রসাদী দ্রব্য পাচিকা ক্রমান্বয়ে সাজাইয়া দিয়া গেল। কিশোরী বাবু স্ত্রীর অনুরোধে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সকল দ্রব্য অল্প অল্প খাইলেন। কিশোরী বাবুর অন্তঃকরণ প্রভু-দর্শনের নিমিত্ত বড়ই উৎকণ্ঠিত।

ব্র—আর কিছু খাও, আবার আসিতে যদি রাত্রি হয়।

কি—আর খাইতে পারিতেছি না।

ব্র—দুধ একটুকুও রাখিতে পারিবে না।

স্ত্রীর আগ্রহে কিশোরী বাবু দুধটুকু সমস্ত পান করিলেন। আচমন সমাপ্ত হইলে ব্রজসুন্দরী স্বামীকে তাম্বুল দিলেন। আজ ব্রজসুন্দরী বড়ই আনন্দিতা। দিনের মধ্যে এত সময় কখনও স্বামীর নিকট থাকিতে পান না। পাঠকগণ! অবগত আছেন, ইতঃপূর্ব্বে ব্রজসুন্দরী "প্রভু-দর্শন করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমার সহিত একবার দেখা করিও" বলিয়া স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পুরঃসর কিশোরী বাবু শ্রীরাধারমণকে প্রণাম করিয়া, একটী ভৃত্য সঙ্গে পদব্রজে গঙ্গাতীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। বৈশাখ মাস। কিন্তু এই সময় গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান বেশ বসন্তকালের মত বোধ হয়। গঙ্গা-নীর স্পর্শে সমীরণ শীতলতা গুণবিশিষ্ট হইয়া সগর্ব্বে মন্দ মন্দ প্রবাহিত। আবার উদ্যানাবস্থিত

বিকসিত নানাবিধ কুসুমের ফুল্ল আনন চুম্বন পূর্ব্বক মনোরম নাসা-মাতোয়ারী সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতে ব্যস্ত। বসন্তকাল ভ্রমে কোকিল এক একবার ডাকিয়া প্রেমিকের হৃদয়ে রস-তরঙ্গ উচ্ছলিত করিতেছে। আজ আমাদের কিশোরী বাবুর সমক্ষে স্বভাবের দৃশ্য নবায়মান প্রতিভাত। বৃক্ষলতার প্রতি পত্রে, প্রতি পুষ্পে তিনি প্রেমের উৎস অবলোকন করিতেছেন। পক্ষীগণের স্বরে কি এক অপরূপ রসের প্রবাহ যেন ছুটিয়া যাইতেছে। কিশোরী বাবু দেখিতেছেন, প্রত্যেকেই কোন অমৃতময় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সংসার পথে বিচরণশীল।

ক্রমে চলিতে চলিতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী হইলেন। ভৃত্যকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিতে উপদেশ করিয়া কিশোরী বাবু সঙ্কেত স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঠিক সন্ধ্যাকাল। কিশোরী বাবু কোন নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলে সহসা পূর্ব্বদিবস কথিত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। কিশোরী বাবু তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা, কি বলিবেন, কি করিবেন, সকলই ভুলিয়া গেলেন। মহাপুরুষ কহিলেন, "বৎস! ভাল আছ?"

কি—(গদগদ স্বরে) আজ্ঞে, আপনার কৃপায় ভাল আছি।

ম—ধর্ম্ম, উপাসনা আর কিছুই নহে। আত্মসুখ বাসনা ত্যাগ এবং প্রেমের অনুশীলন কর। সেই প্রেমের বিষয় একমাত্র শ্রীভগবান, আশ্রয় তাঁহার ভক্ত। এই প্রেম অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি নিরুপাধি ভালবাসা আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

কি—প্রেম কি বস্তু?

ম—প্রেম স্বতঃসিদ্ধ, নিত্য, আনন্দময় স্বভাব। প্রেম মহাশক্তি, যাহার প্রভাবে অদ্বয় চিচ্ছক্তি অনন্ত বিচিত্র শুদ্ধসত্ত্বময় মাধুর্য্যে পরিণাম

প্রাপ্ত হয়। প্রেম প্রয়োজন-হেতু অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময়-তত্ত্ব বিষয়-আশ্রয়ভেদে দ্বিবিধ স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া সুমধুর, নিত্য উৎসবদায়িনী, রসময়ী অন্তরঙ্গালীলার বিস্তার। প্রেম প্রয়োজনে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব বহিরঙ্গা শক্তিযোগে বিপরীত—অর্থাৎ অসৎ, অজ্ঞান, নিরানন্দরূপে প্রতীত হইয়া তটস্থা এবং বহিরঙ্গা লীলার সূচনা। প্রেম পরতত্ত্ব, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে যাবতীয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইল। প্রেম পরমার্থ, তাহা লাভ হইলে আর কিছু লাভ হইতে বাকি থাকিল না। গোলোক হইতে মায়াশাসিত এই অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তারতম্যানুসারে প্রেমেরই লীলাভূমি। এমন কোন স্থান নাই,—এমন কোন অণু পরমাণু নাই যাহা প্রেমের বিধানান্তর্গত নহে। শ্রীভগবান সেই মহাশক্তিমান, অনন্ত বিবিধ শুদ্ধসত্ত্বময় মাধুর্য্যের আকর।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ মাধুরীর আকর, প্রেমময় শ্রীভগবান জীবের সম্বন্ধ, প্রয়োজন তাঁহাতে প্রীতি, অভিধেয়—বাচ্য প্রকরণ—সাধন ভক্তি। জীব তটস্থ ; অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির অন্তর্ব্বর্ত্তী তত্ত্ব। রসিকেন্দ্র-শেখর শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থির এবং প্রেমলাভ করিবার উপায় সাধন—ভক্তি। এই সাধন-ভক্তির বহুবিধ ভেদ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা ক্রমেই জানিতে পারিবে।

নিরাকার ব্রহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাস্য ; তাহা ঠিক। সেই নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়, তাহাও ঠিক। কিন্তু ইহার উপরে আরও তত্ত্ব আছে। সেই সকল আর্য্য-ঋষি ব্যাখ্যাত তত্ত্ব কল্পিত নহে। তাঁহারাই ঈশ্বরকে "অপাণি পাদৌ" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবার তাঁহারাই শ্রীভগবানের "ললিত ত্রিভঙ্গ" রূপ স্বীকার করিয়াছেন। তোমার আমার রূপ হইতে পারিল, আর শ্রীভগবানের রূপ হওয়া অসম্ভব, এ নূতন সিদ্ধান্ত কোথা হইতে আসিল ? এই যে কত রূপ দর্শন করিতেছ, এ সমস্তের

উৎপত্তি স্থান কোথায় ? অস্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াই এই সকল প্রাকৃত ও নশ্বর। শ্রীভগবানের রূপ অপ্রাকৃত, নিত্য, সচ্চিদানন্দঘন। "অপাণি পাদো" বলিতে "প্রাকৃত হস্তপদবিহীন"। এই যে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ পাঁচটী তত্ত্বে জগৎ সৃষ্ট, এই পাঁচটী একই তত্ত্বের প্রকাশ। একই তত্ত্ব পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারে আস্বাদনীয় হন। শ্রীভগবানের দুইটী সৃষ্টি। একটী প্রাকৃত, আর একটী অপ্রাকৃত। এই দুই সৃষ্টিমধ্যবর্ত্তী কোন জ্যোতিৰ্ম্ময় বস্তু দৃষ্ট হয়, তাহাকেই আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মবস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অপ্রাকৃত রাজ্য-নিঃসৃত তেজঃপুঞ্জ মাত্র। তাহা তেজোময় বস্তু হইলেও অতি স্নিগ্ধ এবং প্রাণ-সুশীতলকারী। ইহাই মাত্র ব্রহ্মসত্ত্বার অনুভূতি। এই অবস্থায় সাধক মায়া এবং অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়া সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর অনুভবে প্রশান্ত এবং স্থির-চিত্ত হন। ব্রহ্মসাধক তাহাতে আনন্দ পাইয়া তাহাই সাধ্য মনে করেন। কিন্তু জীবচৈতন্য যে উপাদানে গঠিত, তাহার সত্ত্বা উক্ত অবস্থায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে পারেন না। যেমন সাগরবাসী জীব অতি কষ্টে লবণাক্ত অল্প জলে রক্ষিত হয়, তদ্রূপ উক্ত অবস্থায় সাধক স্থায়ীভাবে রহিতে পারেন না। চিন্ময় রসের সম্যক্ আস্বাদন ব্যতীত জীব তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। আত্মসুখ-বিবর্জ্জিত ভালবাসার নামান্তর রস ;—সেই রস বা প্রেম বা ভালবাসা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া আস্বাদনীয় হয় ;—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই সমস্ত রসের লক্ষণ ক্রমেই অনুভব করিবে। এখন অভিধেয় সম্বন্ধে কিছু শুনিয়া লও। প্রেমের প্রধান সাধন—নামগ্রহণ। ইহা প্রেম-প্রচারক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাস্ত্রানুমোদিত শিক্ষা—"হরের্নামৈব কেবলম্"। নাম ব্যতীত এই যুগে আর কোন গতি নাই, এ সম্বন্ধে শাস্ত্র ত্রি সত্য করিয়াছেন। একজনের

নাম একজন করেন কেন? ভালবাসায়। ভালবাসা নাম গ্রহণের কারণ হইলে, কার্য্যের দ্বারা কারণ উৎপত্তি করিয়া লওয়া হইতেছে। কার্য্য কারণ একই তত্ত্বের দুইটী মাখামাখি প্রকাশ। একটী অসিদ্ধ করিয়া আর একটীকে স্থাপন করা যায় না। অতএব ভালবাসা ও নামগ্রহণ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ হেতু, নাম গ্রহণ করিলেই ভালবাসার উদয় হইবে। তাই নামগ্রহণপরায়ণ শ্রীহরিদাস কহিলেন,—"নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।" এই শুদ্ধ নিরুপাধি প্রেম, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। সম্বন্ধ-বৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বিবর্জ্জিত। যেখানে সম্বন্ধ আছে, অনন্ত ঐশ্বর্য্য থাকুক, সেখানে পরস্পরের আস্বাদনীয় বস্তু মাধুর্য্য। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ একই তত্ত্বের পাঁচটী প্রকাশ। সেই তত্ত্বই মাধুর্য্য। ঐশ্বর্য্য পরস্পরের আস্বাদনীয় হয় না। প্রেম, ঐশ্বর্য্য আস্বাদন করিতে জানেনা। একমাত্র মাধুর্য্যই প্রেম কর্ত্তৃক আস্বাদিত হইয়া উভয়ে পরিপুষ্টি লাভ করে। অতএব মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ ভক্তের উপাস্য এবং সেব্য। তিনি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন; অসমোর্দ্ধমাধুরী সম্পন্ন হইয়া অনন্ত ভুবনের চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। ব্রজে দাসদাসী, সখাগণ, মাতাপিতা, এবং শ্রীব্রজসুন্দরীগণকে লইয়া তিনি মধুর প্রেমময়ী লীলা বিস্তার পূর্ব্বক, নিরন্তর ভক্তগণকে সুখ দিতেছেন। ইহাই তাঁহার রসময় স্বভাব। এই লীলা নিত্য। এই লীলায় প্রবেশ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণ জুড়াইবে না। শ্রীভগবানের এই লীলার অপ্রাকৃতত্ব, নিত্যত্ব এবং প্রেমময়ীত্ব এবং এই সাংসারিক লীলায় প্রাকৃতত্ব, নশ্বরত্ব এবং স্বার্থ-সুখতাৎপর্য্যময়ীত্ব, এই দুই অনুভব একই কথা। এই অনুভবই সাধকের প্রাণ। এই অনুভব হারা হইলেই সাধকের পদস্খলন হইবার প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা আছে। সেই সচ্চিদানন্দময়ী লীলা, আর সাংসারিক

লীলা, একটী সাধ্য আর একটী সাধনতত্ত্ব। এই সাধ্য-সাধন-বহির্ভূত যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞান নহে অজ্ঞান, অবিদ্যাজনিত বিষম মোহ। এই মোহাক্রান্ত হইয়া আমরা পার্থিব ভোগেসুখেচ্ছু। সুতরাং আমরা পার্থিব ভোগসুখেচ্ছুক বা মোহাক্রান্ত একই কথা। তদবস্থাপন্ন হইয়া শ্রীভগবানের সহিত যে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ, তাহা আমরা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া "আমার স্ত্রী" "আমার পুত্র" "আমার গৃহ" লইয়া ব্যস্ত। এই সকল পার্থিব বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ হইবার কারণ,— বিষয়-সুখ-কামনা। স্ব সুখ-কামনার- -কল্পনায় দুঃখ, পূরণে দুঃখ, ভোগে দুঃখ ; তাহার আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ পরিপূর্ণ। তাহা আত্মসুখরত ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করেন। কিন্তু পুনঃপুনঃ তিনি দুঃখ অনুভব করিয়াও আত্মসুখবাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না, কেননা অবিদ্যাক্রান্ত। কিন্তু যখন ব্যাকুল অন্তঃকরণে মহতের কৃপায় শ্রীভগবদ নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ হইয়া, তিনি সাধন পথে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত হন ?"

মহাপুরুষের প্রত্যেক উপদেশ কিশোরীবাবুর নিকট এক একটী উজ্জ্বল সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। তাঁহাকে আর প্রশ্ন করিয়া কিছু জানিতে হইল না। মহাপুরুষের উপদেশে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ মিটিয়া গেল। কিশোরী বাবুর নয়ন অশ্রুজলে সিক্ত হইল। ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া, মহাপুরুষের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন মহাপুরুষ কিশোরীবাবুকে হৃদয়ে তুলিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। প্রথম দর্শনকালে কিশোরীবাবুর হৃদয়ে যে ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছিল, আবার তাহার অনুভূতি হইল। এবার শ্রীরাধারমণকে দেখিলেন, সহাস্য বদন, মুরলী বাজাইতেছেন, সেই মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কিশোরীবাবুর প্রাণ সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ,

গন্ধ সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িল। মাধুর্য্য তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ডুবিয়া গেলেন, আর কিছুরই স্মৃতি রহিল না। কিশোরী বাবু এখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। যখন সংজ্ঞা লাভ হইল, বুঝিতে পারিলেন, তিনি মহাপুরুষের ক্রোড়ে শুইয়া আছেন। তখন ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন,—

"প্রভু। আপনি কি আমায় ছাড়িয়া যাইবেন ?"

ম। আমি ত তোমার নিকট বিক্রীত হইলাম।

কি। প্রভু! আমাকে শ্রীচরণে চিরদাস করিয়া রাখুন।

ম। তোমার পাপ তাপ সকলই আমি লইলাম। তুমি নির্ব্বিঘ্নে সেই প্রেমধামের উপযুক্ত দেহলাভ করিবার নিমিত্ত সাধন কর।

কি। আপনার কৃপায়, আপনার আশীর্ব্বাদ আমার অচিরে ফলুক।

ম। যাও, গৃহে যাও। আবার সময়মত সাক্ষাৎ হইবে।

কি। আপনাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া যাইব প্রভু ?

ম। সর্ব্বদার জন্য আমি তোমাদেরই আছি, কোন চিন্তা নাই। অনেক রাত্রি হইয়াছে, গৃহে যাও।

কি। একবার দাসের বাটীতে পদার্পণ করিবেন না ?

ম। সময় মত সকলই হইবে। যোগমায়ার ইচ্ছাধীন। একদিন তোমাদের বাটী যাইব, এখনও বিলম্ব আছে। এখন গৃহে যাও। এই বলিয়াই মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান করিলেন।

কিশোরীবাবু বিরহ-ক্লিষ্ট অন্তঃকরণে ভৃত্য সঙ্গে বাটীতে ফিরিলেন। ব্রজসুন্দরী অতীব উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্বামীর প্রতীক্ষায় গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময় সহসা কিশোরীবাবু আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিশোরী বাবু আসিবার সময় শ্রীরাধারমণ অগ্রে দণ্ডবৎ করিতে গিয়া এবার ঠাকুরের হাসিমুখ দর্শন করিয়াছেন। পত্নীকর্ত্তৃক সাদরে সেব্যমান হইয়া বিশ্রামলাভের পর, কিশোরীবাবু আহার করিতে বসিলেন। ভোজন

শেষ হইলে, স্বামী স্ত্রীতে সেই রাত্রিতে মহাপুরুষের উপদেশাবলী সম্বন্ধে অনেক নিশা পর্য্যন্ত কথোপকথন হইল। একদিন তিনি তাঁহাদের গৃহে আসিবেন, কিশোরীবাবু স্ত্রীর নিকট সে কথার উল্লেখ করায়, ব্রজসুন্দরী দর্শন পাইবার আশায় উৎফুল্ল হৃদয়ে স্বামীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। শেষরাত্রিতে দম্পতী একটু নিদ্রার আশ্রয় লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে—মহাপুরুষ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসার-যাত্রা অর্থাভাবে অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হইতেছে। সুশীলা পিত্রালয়ে পশমের কার্য্য শিখিয়াছিলেন, তাহা এখন বড়ই কাজে আসিল। গ্রামের জনৈক ভদ্রসন্তান কলিকাতায় চাকুরী করেন। সুশীলাকে তিনি মাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে পশম আনাইয়া গলাবন্ধ প্রস্তুত পূর্ব্বক উক্ত ব্যক্তি দ্বারা বিক্রয় করাইয়া যাহা কিছু সম্বল হয়, তাহার দ্বারা সম্প্রতি সংসার ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হইতেছে। সুশীলার দাদার আপিসে কি এক দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণে তাঁহার বেতন হ্রাস হইয়াছে, কাজেই তিনি ভগিনীকে পূর্ব্বের মত সাহায্য করিতে পারেন না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ীতেই থাকেন, কোথাও বড় একটা বাহির হন না। তিনি গ্রন্থানুশীলনে বিভোর—কেমনে দিনপাত হইতেছে, তাঁহার সে অনুসন্ধান রাখিবার অবসর কোথায়? সুশীলাও স্বামীকে কখনও আয় ব্যয় সম্বন্ধে জানান না। পিসীমা—তিনি মালা হাতে আপন কক্ষায় বসিয়া সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম-পরায়ণ। কখনও আপন মনে হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন। সুশীলা অনেক যত্নে তাঁহাকে দু'টী আহার করান। সুশীলার উপরই সমস্ত সংসার-ভার। তাহা হইলেও সুশীলার মুখখানি সর্ব্বদা হাসিমাখা। পাড়ার সকলে সুশীলার নিকট আসিয়া স্ব স্ব মনের সুখ দুঃখের কথা বলেন, সুশীলাও অতি আগ্রহের সহিত সকলের কথা শুনিয়া সুপরামর্শ দেন। সুশীলার মত গুণবতী ধৈর্য্যশীলা রমণী সংসারে অতি বিরল।

বর্ষাকাল। ভোর হইতেই খুব বৃষ্টি হইতেছে। ঘর হইতে বাহির হয় কাহার সাধ্য! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু উঠিয়া কি করিবেন, বাহির হইবার উপায় নাই। সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সারিয়া শয়ন করিতে অধিক রাত্রি হইয়াছিল, সুশীলা এখনও নিদ্রিতা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একবার ধীরে ধীরে ডাকিলেন,—সুশীলা! প্রায়ই এই সময়ে তিনি সুশীলাকে ডাকেন না। আজ অনন্যোপায় হইয়া ডাকিলেন,—সুশীলা! স্বামীর কণ্ঠস্বর সতীর কর্ণে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রেমশক্তি প্রভাবে যেখানে জীব চৈতন্য বিশ্রামলাভ করিতেছিলেন, তথায় ধ্বনিত হইল,—সুশীলা! সুশীলা জাগরিত হইয়া উত্তর করিলেন,—আজ্ঞে!

ভ। খুব ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, বাহির হইবার যো নাই।

সু। আপনার কি বাহিরে যাইবার একান্ত আবশ্যক হইতেছে?

ভ। স্নান করিবার সময় হইল।

সু। এই দুর্যোগে কি নিয়ম-রক্ষা হয়।

ভ। এখন দুই তিন ঘণ্টাকাল এই বৃষ্টি থামিবে না।

সু। দুই তিন ঘণ্টাকাল আপনি বাহির হইতে পারিবেন না।

ভ। তোমার ত সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে কষ্ট হইবে।

সু। আমাদের কি কষ্ট, আপনি সে কথা ভাবিবেন কেন?

ভ। সুশীলা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় না, কতদিন বলিব বলিব মনে করিয়া আর বলিতে পারি না।

সু। (বিষাদ এবং আশ্চর্য্যভাবমাখা স্বরে) কেন আমায় বলেন না, আমায় আপনি কিছু বলিবেন, তাহাতে সাহসের কি প্রয়োজন?

ভ। আচ্ছা! আজকাল সংসার কি করিয়া চলে?

সু। ঠাকুর চালাইতেছেন।

ভ। আজ কিছু সম্বল আছে ?

সু। ঠাকুর যাহা জুটাইবেন।

ভ। তোমার বিশ্বাসবলে সংসার চলিতেছে। আমি তোমার হতভাগ্য স্বামী। উপার্জ্জনাক্ষম স্বামীকে যে তুমি যত্ন কর, সে তোমার সাধ্বীত্বের পরিচয়। কিন্তু আমি তোমার ন্যায় গুণবতী স্ত্রীর নিতান্ত অযোগ্য।

সুশীলা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন, আপনি কি বলিতেছেন? একথা কানে শুনিতে নাই। কেন আপনি ত বলেন, আমাদের কোন সাধ্য নাই. ঠাকুর যাহা করেন তাহাই হয়; তবে আবার অদৃষ্টকে নিন্দা করিতেছেন কেন ?

ভ। সুশীলা! আমাদের কি চিরদিন এমনই যাবে ? দেখ তুমি বড় লোকের কন্যা, আমার গৃহে আসিয়া দুটী ভাল করিয়া খাইতেও পাও না। একি কম দুঃখের কথা! আরও দুঃখের কথা, এই হতভাগ্য উপার্জ্জনাক্ষম স্বামীকে তুমি অধিকতর যত্নের সহিত সেবা কর। হায়! আমি তোমার দুঃখে একটু দুঃখিত হইতেও অক্ষম।

সু। এই সকল কথা মনে স্থান দিতে নাই। ঠাকুর যা করেন. তাই হয়। একদিন আমাদের প্রতি ঠাকুর মুখ তুলে চাইবেন।

ভ। সতীর কথা ফলুক। ইহা বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

পাঠকগণ! দারিদ্র্য-পীড়িত ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীর সহিত ইহা অপেক্ষা সরস কথোপকথন আর আশা করা যায় না। ইহাও আজ ঝড় বৃষ্টি না হইলে কখনই আপনারা শুনিতে পাইতেন না। ক্রমে বৃষ্টির বেগ কিছু কমিয়া আসিল। দম্পতী শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সমস্ত স্থান জলময়। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে

আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহির হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর সম্মুখেই একটী বাঁধান ঘাট আছে। বাঁধাঘাটের দক্ষিণপার্শ্বে একটী বকুলবৃক্ষ। বৃক্ষটী বহুসংখ্যক শাখা প্রশাখা সমন্বিত হইয়া, বৃষ্টি ও রৌদ্র-ক্লিষ্ট পথিককে কিয়ৎকালের জন্য আশ্রয় দিতে সমর্থ হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহির হইয়া দেখিলেন, সেই বৃক্ষতলে একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ পুরুষ চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন। পরিহিত বস্ত্র সহ সমস্ত অঙ্গ এককালে ভিজিয়া গিয়াছে। মহাপুরুষের সুনির্ম্মল শ্রীঅঙ্গ নিঃসৃত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিলেন, ইনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ; সৌভাগ্যবলে অদ্য আমি ইহার দর্শন লাভ করিলাম। এত বৃষ্টি তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই; বোধহয় এক্ষণে বাহ্যজ্ঞানমাত্র আছে কিনা সন্দেহ। একবার ডাকিয়া দেখি, যদি আমাদের কুটীরে পদার্পণ করেন, তবে আমাদের পরম সৌভাগ্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক মহাপুরুষের অগ্রে দণ্ডবৎ পুরঃসর একবার ডাকিলেন,—প্রভু! প্রেমের করুণ স্বরের গতি সর্ব্বত্র। গোলোক, বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ, সমাধিস্থ ঋষি-হৃদয় কোথাও তাহার নিষেধ নাই। মহাপুরুষ চক্ষুঃ মেলিলেন। আয়ত নয়নদ্বয় প্রেমে টলমল করিতেছে দর্শন করিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট হইল।

ভ। প্রভু! অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছে, দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে পদার্পণ করিলে আমি কৃতার্থ হই।

ম। আমিও কৃতার্থ হই। পাণিহাটী গ্রামবাসী আমার প্রভুর বড় প্রিয়।

ভ। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার সঙ্গে আসুন।

ম। চলুন। কতক্ষণ হইল বৃষ্টি হইতেছে?

ভ। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতীব হৃষ্টচিত্তে মহাপুরুষকে সঙ্গে লইয়া একেবারে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। সুশীলা তখন ভিজিয়া ভিজিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠাকুর গৃহের সম্মুখে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন। সেই পুরাতন পট্টবস্ত্রখানি পরিধান করিবার নিমিত্ত মহাপুরুষকে অনুনয় করিলেন। মহাপুরুষ ব্রাহ্মণের অনুরোধে আদ্র বহির্ব্বাসখানি পরিত্যাগপূর্ব্বক সেইখানি পরিধান করিলেন। এদিকে স্বামীর সহিত সমাগত সাধুকে দর্শন করা অবধি. সুশীলার হৃদয়ে যেন এক অভিনব প্রফুল্লভাব স্বতঃই স্ফুরিত হইতেছে। সুশীলা সংসারের অভাবজনিত মানসিক সঙ্কোচ আর অনুভব করিতে পারিতেছেন না। সুশীলা তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম সারিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। আসিয়া ঠাকুর ঘরের সম্মুখে শ্রীশ্রীনারায়ণদেব এবং মহাপুরুষের উদ্দেশে দণ্ডবৎ করিলেন।

ম—মা! আমার কাল অবধি কিছু খাওয়া হয় নাই, কিছু খাইতে দাও।

• মহাপুরুষের অমৃতময়ী কথায় সুশীলার কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় স্রোত বহিয়া গেল। এই কথা শুনিয়া সুশীলা দ্রুত সেইখান হইতে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু ঘরে কিছুই নাই, ভাবিয়া সুশীলা আকুল হৃদয়ে একবার স্মরণ করিলেন,—"দয়াময় হরি!" সুশীলার সেই অস্ফুটধ্বনি তখনই শ্রীহরির নিকট পঁহুছিল। পাঠকগণ! তড়িতের গতি এত শীঘ্রগামী হয় না; সুশীলার এই সংবাদ শ্রীহরি প্রাপ্ত হইয়া কি বিধান করিলেন, তাহা অবগত হউন। ভাবিতে ভাবিতে সুশীলা যেমন গৃহদ্বার অতিক্রম করিবেন, দেখিলেন পাড়ার একটী বালিকা ঘটী হস্তে ধীরে ধীরে আসিতেছে। সুশীলাকে সম্মুখে দেখিয়া বালিকা কহিল,—মাসীমা! মা

তোমার জন্য দুগ্ধ পাঠাইয়াছেন। সুশীলার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল, অধিক কোন কথা বলিতে অক্ষম হইয়া তিনি ঘটিটী বালিকার হস্ত হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক, "এস মা!" বলিয়া তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। উনন জ্বালিয়া সুশীলা সত্বর দুগ্ধটুকু জ্বাল দিলেন, সুন্দর আবর্ত্তিত হইলে, একটী পাথরের বাটীতে ঢালিয়া, তাহা জলপূর্ণ একটী বৃহৎ পাত্রে শীতল করিবার নিমিত্ত রক্ষা করিলেন। ঘরে বাগানের উৎপন্ন সুপক্ক মর্ত্তমান কদলী ছিল, দুইটী, ছোট ছোট করিয়া সংস্কার পূর্ব্বক একখানি রেকাবীতে রাখিলেন। দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ থাকিতে পাত্র হইতে উঠাইয়া, সুশীলা দুইটী পাত্র ঠাকুর ঘরের সম্মুখে স্থাপন করণান্তর স্বামীকে নিবেদন করিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দিয়া প্রসাদ দ্রব্য মহাপুরুষের অগ্রে রক্ষা করিলেন। তদ্দর্শনে মহাপুরুষ অতীব আহ্লাদ সহকারে কিয়ৎ পরিমাণ দুগ্ধ পান করিলেন। সুশীলা বলিলেন,—বাবা! দুধটুকু সব খাইতে হইবে।

ম—মা! আমিই সব খাইব?

সু—হাঁ বাবা! অতি অল্পই দিয়াছি।

মহাপুরুষ সুশীলার আগ্রহে, তাহা হইতে আরও কিছু পান করিলেন। সুশীলা অবশেষ পাত্রদ্বয় উঠাইয়া স্থান মার্জ্জন করণান্তর, মুখশুদ্ধির নিমিত্ত বাবাকে একখণ্ড হরিতকি দিলেন। যে বালিকাটী দুগ্ধ আনিয়াছে, সে এখনও ঘটীর অপেক্ষায় বসিয়া আছে। এতক্ষণ সুশীলার আর তাহার সহিত কোন কথা বলিবার অবকাশ হয় নাই। এক্ষণে সুশীলাকে আসিতে দেখিয়া বালিকা কহিল,—মাসীমা! ঘটী কি থাকবে?

সু—না মা! এই যে ঘটী তুমি লইয়া যাও।

বা—(ঘটী লইয়া) আমি তবে যাই?

সু—সরলা ! তোর মা কি কচ্চে ?

সরলা—মা এই নেয়ে এলেন। গয়লা আসিয়া দুধ দুইয়া গেলে, মা বলিলেন, কয়দিন দিদিকে দুদ দেব দেব মনে করিতেছি, দুদ আর দেওয়া হয় না। আমায় ডাকিয়া কহিলেন, সরলা ! তুই আজ এখনই ঐ ঘটীটা করে তোর মাসীমাকে দুদ দিয়ে আয়ত মা !

সু তোর'মাকে বলিস্, আজ তার গরুর দুদের বড় ভাগ্যি ; দুদ সাধুসেবায় লাগিয়াছে।

স—আচ্ছা ! মাসীমা, তবে এখন আসি।

সু—তোর মাকে আজ বিকেলে একবার আমাদের এখানে বেড়াতে আসিতে বলিস্না মা !

স—আচ্ছা !

এই বলিয়া সরলা ঘটী হাতে প্রস্থান করিল।

মহাপুরুষের অবশেষ পাত্র সুশীলা অতি যত্নে আনিয়া ঘরের এক পার্শ্বে রাখিয়াছেন। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, যে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ প্রসাদ পান। কিন্তু স্বামী এখনও কিছু খান নাই, কাজেই স্বাধ্বী স্ত্রী স্বামীর পূর্ব্বে কেমন করিয়া কিছু খান। যাহা হউক, কেন বুঝিতে পারিতেছেন না, যখন সেই প্রসাদ পানে চক্ষু পড়িতেছে, সুশীলা আর লোভসম্বরণ করিতে পারেন না। ইতোমধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া ডাকিলেন,—সুশীলা !

সু—আজ্ঞে।

ভ—কই, প্রসাদ লইয়া আসিলে দেখি।

সু—কেন ?

ভ—আমায় দাও ত।

সুশীলার যে দশা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও সেই দশা। সুশীলা কিন্তু

ভাবেন নাই যে স্বামীর অবস্থা নিজেরই অনুরূপ। যাহা হউক স্বামীর আজ্ঞায় স্ত্রী অবশেষ পাত্র আনিয়া দিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা হইতে কিছু প্রসাদ পাইয়া সুশীলাকে কহিলেন,—সুশীলা! তুমিও পাও। সুশীলার স্বামীর কথায় আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অন্তরালে গিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুশীলা! আজ রান্না কি হবে?

তখন সুশীলা স্বামীর নিকট দুগ্ধ আসার ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন,—ঠাকুর যাহা করিবেন তাহাই হইবে।

ভ—সুশীলা! তুমি ধন্য, তোমার নির্ভরতা ধন্য।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কথোপকথন করিতে থাকুন, আমরা আর একটী ঘটনা বর্ণন করি। পাণিহাটি গ্রামে এক ঘর ভদ্র পরিবার বাস করেন। তাঁহারা পরম কৃষ্ণভক্ত। বাটীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীনিতাইগৌরের সেবা আছেন। হরিমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাঁহারা অতি শ্রদ্ধা করেন। আজ কি মনে করিয়া, তাঁহারা বাটীর সরকারকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে যথেষ্ট পরিমান চাউল, দাইল, ঘৃত ইত্যাদি দ্রব্য সত্বর পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। এ সমস্তই ঠাকুরের প্রেরণা। সরকার মহাশয় দ্রব্য সমূহ দুইটী ভৃত্যের দ্বারা বহন করাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয়!

স্বামী স্ত্রী উক্তরূপ আলাপন করিতেছেন। সুশীলা কহিলেন,— "দেখুন দেখি, বাহিরে কে ডাকে"। পত্নীর কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আনন্দ ও বিস্ময় এককালে তাঁহাকে অভিভূত করিল। সরকার মহাশয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিয়া কহিলেন, ললিত বাবু এই সমস্ত আপনার ঠাকুর সেবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন।

ভ—বাটীর ভিতর আসুন।

সুশীলা ব্যাপার দেখিয়া একবার প্রেমবিগলিত হৃদয়ে ডাকিলেন,—“দয়াময় হরি”! দ্রব্য সম্ভার সুশীলার ভাণ্ডার গৃহ সম্মুখে রক্ষা করিয়া সরকার মহাশয় ভৃত্য সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সুশীলা কৃতজ্ঞতা পরিপূর্ণ হৃদয়ে ভাণ্ডারগৃহ মধ্যে জিনিষগুলি শৃঙ্খলা সহকারে রাখিয়া দিলেন।

এখন বৃষ্টি একেবারে থামিয়া গিয়াছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার। ক্রমে ক্রমে দুই একটী করিয়া ছাত্র আসিতে আরম্ভ করিলেন। নবীন এবং সুরেন সুশীলাকে বড়ই ভক্তি করে। তাহারা ঝড় বৃষ্টি না মানিয়া প্রত্যহ আসিবেই আসিবে। তাহারা সুশীলার সাংসারিক কার্য্যের অনেক সহায়তা করে। পিসীমা হরিনামে আর পূজা আহ্নিকে প্রায়ই ব্যস্ত থাকেন, কাজেই খুব ইচ্ছা হইলেও তিনি সুশীলার সহায়তা করিতে সময় পান না। এই বাড়িতে এত কাণ্ড হইতেছে, পিসীমা তাহার বিন্দুবিসর্গ জানেন না। তাঁহার আজ আরও সুবিধা, বর্ষা সময়ে তিনি প্রাণ খুলিয়া হরিনাম করিতে করিতে বিভোর হইয়া আছেন। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহার এখনও পর্য্যন্ত বাহ্যেন্দ্রিয়গোচর হয় নাই। কিন্তু আজ সেই বিভোর অবস্থার মধ্যে প্রাণের ভিতর যেন কেমন কেমন করিতেছে। এক একবার তাঁহার বাহির হইতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু তিনি পুনঃপুনঃ সতর্ক হইলেও আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। তখন পিসীমা মনে করিলেন, একি হইল? আজ আমার মন চঞ্চল হইল কেন? এ রকম ত একদিনও হয় নাই। “হরে কৃষ্ণ” বলিয়া তখন স্থিরচিত্ত হইয়া দেখেন, তাঁহাদের ঠাকুর ঘরের দাবায় একখানি আসনোপবিষ্ট একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ পুরুষ। দর্শনমাত্র তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। ধ্যানভঙ্গ হইবামাত্র পিসীমা আর গৃহমধ্যে রহিতে পারিলেন না। ত্রস্ত হইয়া

বাহিরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার মানসিক দর্শন কেবলমাত্র কল্পনা বা স্বপ্ন নহে, জ্বলন্ত সত্য।

পিসীমা ঠাকুর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একটী ঠাকুরের এবং একটী মহাপুরুষের উদ্দেশে দণ্ডবৎ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, "আমি এতক্ষণ হইল, আপনাদের বাটীতে আসিয়াছি, কিন্তু আপনার দর্শন পাই নাই, আপনি আপনার কাজ করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন।

পি—বাবা! আমি বড় হতভাগিনী।

ম—আপনি হতভাগিনী বৈকি, সমস্ত দিন কাহার নাম করিয়া থাকেন।

পি—আমি কিছুই জানি না।

ম—আপনার আর জানিবার কিছু প্রয়োজন নাই।

পি—বাবা! আমার উপর দয়া রাখিবেন।

ম—এখন কিছু খাইতে দেন, আমার মা ত দুদ খাওয়াইয়াই নিশ্চিন্ত।

এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপুরুষের সন্নিধানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সেবার আয়োজন—

ম—মা রাঁধিবেন, ছেলে খাইবে, এক্ষেত্রে আর জিজ্ঞাসা করিবার কি আছে?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপুরুষের উদারতায় আর্দ্র হৃদয়ে ব্রাহ্মণীর নিকট দ্রুত গিয়া এই শুভ সংবাদ দিলেন। সুশীলা আনন্দিত মনে পাক-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। নবীন ও সুরেনের সহায়তায় সুশীলা স্বল্পকাল মধ্যে দাইল, পাঁচতরকারী, অন্ন, একটু পায়স রাঁধিয়া ফেলিলেন। পরে ভোগ সুসজ্জিত করিয়া, সুশীলা পিসীমাকে সংবাদ দিতে কহিলেন। ভোগ ঠাকুর মন্দিরে নীত হইল। যথাবৎ নিবেদিত হইয়া প্রসাদ পাকগৃহে

আসিলে, আরাত্রিক সমাধা হইল। সুশীলা তাঁহার গৃহের দাবায় একখানি আসন পাতিয়া তদগ্রে প্রসাদ দ্রব্যাদি রাখিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভুকে প্রসাদ দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিবামাত্র তিনি ভোজন স্থানে আসিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন।

ম—কই, আমি একা প্রসাদ পাইব, আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ?

ভ—আজ্ঞে, প্রভুর সেবা হইলে, আমি পরে—

ম—আমি সকলের দাস, আমাকে ওরূপ সম্বোধন করিবেন না। মা! আর একখানি আসন দাও।

ভ—এখন আমায় ক্ষমা করুন।

ম—তাকি হয়? এ সম্বন্ধে ক্ষমা করিতে নাই। মা! শীঘ্র লইয়া এস।

তৎশ্রবণে সুশীলা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিমিত্ত আর একখানি আসন পাতিয়া প্রসাদ দ্রব্যাদি আনয়নপূর্ব্বক সম্মুখে রাখিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপুরুষের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত ভোজন করিতে বসিলেন। ব্যঞ্জনাদির সুখ্যাতি করিতে করিতে মহাপুরুষ প্রসাদ পাইতেছেন, পিসীমা বীজন করিতে নিযুক্তা, সুশীলা পরিবেশনকারিণী। পরিতৃপ্তির সহিত আহার পূর্ব্বক মহাপুরুষ কহিলেন,—"অনেক দিন হইল, এমন তৃপ্তির সহিত খাইতে পাই নাই। মার হাতের পাক বড় চমৎকার"। এই কথা বলিতে বলিতে মহাপুরুষ আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত উঠিয়া আচমন করিলেন। তদনন্তর মুখশুদ্ধি গ্রহণ পূর্ব্বক উভয়ে সুশীলার গৃহে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত প্রবিষ্ট হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে সুশীলা মহাপুরুষের বিশ্রামার্থ একটী পৃথক শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। মহাপুরুষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হস্ত ধরিয়া তাঁহার সহিত তদুপরি উপবেশন করিলেন।

অতঃপর সকলের আহারাদি সমাপন হইলে, সুশীলা তাড়াতাড়ি

গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া, মহাপুরুষ এবং স্বামীকে বীজন করিবার জন্য গৃহমধ্যে আসিলেন। বিশ্রামলাভার্থ উভয়ে নীরবে শয্যোপরি শয়ন করিয়া আছেন, উভয়ের চক্ষুঃ মুদ্রিত। পাঠকগণ! উভয়ের মনে কি চিন্তা-স্রোত বহিতেছে, তাহা আপনারা অনুভব করুন। কিন্তু সে যাহা হউক, এই যে দর্শনমাত্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং সুশীলা মহাপুরুষের সহিত অত্যন্ত আত্মীয় এবং পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিতেছেন, ইহার কারণ কি? এই প্রশ্ন অবশ্য রহস্য-জনক। সংসারে যাহা কিছু ঘটনা হয়, তাহার একজন বিধাতা আছেন এবং তাহার উদ্দেশ্য আছে। দর্শনমাত্র একজনের প্রতি আর একজনের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের হৃদয়ে ভালবাসার উদয় হয়, ইহা অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। অথবা যাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমের আগার, তাঁহার নিজের গৃহাদি না থাকিলেও জগৎ তাঁহার গৃহ। তিনি অসঙ্কোচ চিত্তে অপরিচিতজনের বাসমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া সেই পরিবারান্তর্গত আবালবৃদ্ধ-বনিতার চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক সকলের ভালবাসা প্রাপ্ত হইবেন। কিম্বা প্রেম এমনই বস্তু যে তাহা যেখানে থাকুক না কেন, সেইখানে অবস্থান করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয় বস্তু আকর্ষণ করিতে সমর্থ। সকলেই প্রেমের অধীন, কেহই প্রেমের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে শক্তি ধারণ করেন না। প্রেমের গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। অধিকন্তু প্রেমিক যিনি, তাঁহার কি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ আছে? তাঁহাকে মহা সমাদর করুন, তিনি যেমন সন্তুষ্ট—অনাদর, অবজ্ঞা করুন, তিনি তেমনই প্রসন্নচিত্ত। এই যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপুরুষকে এত যত্ন করিতেছেন, তিনি যদি তাঁহার প্রতি অন্যরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলেও মহাপুরুষের চিত্ত কি কিছুমাত্র বিচলিত হইত? প্রেমিক সদানন্দময়, সকল অবস্থাতেই, সকলরূপ ব্যবহারেই তিনি একরূপ। আরও, যিনি প্রেমবস্তু উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ভালবাসা

বা আদর চান না। তিনি সকলকে ভালবাসিতে, আদর করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন। সকলে তাঁহার প্রতি যেমন ব্যবহার করুন না কেন, সকলকে সমানভাবে ভালবাসিয়া যাওয়া তাঁহার জীবনের মহাব্রত। ভটাচার্য্য মহাশয় এবং সুশীলার মহাপুরুষের প্রতি অদ্যকার প্রীতি-ব্যবহার তাঁহাদের জীবনে কিরূপ পরিবর্ত্তন বিধান করিবে, তাহা পাঠকগণ! ক্রমশঃই অবগত হইবেন।

কিয়ৎকাল বিশ্রাম করণান্তর মহাপুরুষ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিলেন। তখন বেলা তিনটা। মহাপুরুষ কহিলেন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমি তবে এখন বিদায় হই।

সু—বাবা! এখনই যাইতে হইবে? আমাদের আপনাকে আর কি বলিবার আছে?

ম—না মা! আমি ত তোমাদেরই। তোমাদের কথা শুনিতে আমার বড় ভাল লাগে। আমার এখন এক স্থানে যাইবার প্রয়োজন আছে।

সু—এখন বড় রৌদ্র, আর কিছু পরে যাইবে বাবা!

ম আচ্ছা মা! আর একটু পরে যাইব। এখন একবার গঙ্গাতীর হইতে বেড়াইয়া আসি। এই বলিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তর তিনি উঠিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মহাপুরুষ যখন আসিলেন, হস্তে দুইখানি পুঁথি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে দিয়া কহিলেন,—"এই গ্রন্থ দুইখানি আমার অনুরোধে আপনি নিত্য পাঠ করিবেন"। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মহাপুরুষকে দর্শনাবধি চিত্তের অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গ্রন্থ দুইখানি ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রেমবিকম্পিত হৃদয়ে মস্তকে ধারণ করিলেন। মহাপুরুষ কহিলেন,—"আমি এখন আসি"। সকলের দেহ হইতে প্রাণ যেন

বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। সকলে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। সহসা ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপুরুষের শ্রীচরণতলে পতিত হইয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—"প্রভু! আমায় কৃপা করুন"। মহাপুরুষ অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাকাইয়া কম্পিত বাহুযুগল দ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উঠাইয়া হৃদয়ে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন,—"কোন চিন্তা নাই, আমরা সকলে একস্থানে গিয়া সুখী হইব"। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সান্ত্বনা করিয়া, সকলে প্রণাম করিলে পর মহাপুরুষ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পিসীমার কথা।

সন্ধ্যাকাল। নির্জ্জন ভাগীরথী তীর। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-স্রোতের শ্রবণ-রসায়ণ কল কল ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়বর্ত্তী কোন বিচিত্র স্রোতের অব্যক্ত মধুর ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া এক আনন্দের উৎস উঠাইতেছে, অনুভব হয়। সুরধুনীর প্রশস্ত বক্ষে অনন্ত তরঙ্গ দর্শনে অন্তঃকরণস্থিত অতুলনীয়া স্রোতস্বিনীর অগণন ভাবতরঙ্গ উচ্ছলিত হইতেছে। তীরবর্ত্তী বিবিধ পাদপরাজি বিশ্রম্ভালাপ পরায়ণ নানাজাতীয় বিহঙ্গকুলের সহিত মন্দাকিনীর অনির্ব্বচনীয় শোভা দর্শন করিতে উৎফুল্লভাবে দণ্ডায়মান। তাহারা একদিন সেই শোভা দর্শন করিতে আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে গঙ্গাতীরেই বসতি করিতেছে। সমীরণ—পত্র, পুষ্প, ফল ও গঙ্গোদক সংগ্রহ পূর্ব্বক আহ্লাদভরে মন্দ মন্দ চলিতেছে। হাঁ গো! তুমি কাহাকে এত উপহার দিবার নিমিত্ত লইয়া যাইতেছ? সমীরণ কি বলিল, বুঝা গেল না।

আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই বকুল বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশে বসিয়া মহাপুরুষের প্রেমময় মূর্ত্তি,—অমিয় বচন,—স্নেহ-পরিপূর্ণ ব্যবহার স্মরণ করিতেছেন। বস্তুতঃ মহাপুরুষ একবার যাঁহার নয়নপথে উদিত হইয়াছেন, তিনি ভুলিতে ইচ্ছা করিলেও কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। মহাপুরুষ সম্বন্ধে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাবিতে ভাবিতে বিগলিত-হৃদয়ে নয়নজলে ভাসিতেছেন, হৃদয়-মন্দিরে মহাপুরুষের সৌম্যমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাঁহার সহিত কথা বলিতেছেন,—"প্রভু! আমি

অধম, আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও আমাকে আপনার অঙ্গীকার করিতে হইবে"। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মহাপুরুষ সম্বন্ধে গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে। মহাপুরুষ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর উপলব্ধি নাই, যে ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছে। সুশীলা রন্ধনাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক ঘাটের নিকট আসিয়া দেখেন, ঠাকুর বকুলতলায় চিন্তামগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন।

সু—বসিয়া কি ভাবিতেছেন?

ভ—কত কি ভাবিতেছি।

সু—আমায় বলিবেন না?

ভ—তোমার তাহা শুনিয়া কি হইবে?

সু—আপনি যে বিষয় ভাবিতেছেন, তাহা আমার শুনিলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু হইবে।

ভ—তোমায় শুনিতে হইবে না, যাও।

সু - আপনি না বলিতে চাহিলে আমি জোর করিয়া শুনিব।

ভ—কেমন করিয়া?

সু—আপনি বলিবেন না কেন?

ভ—সুশীলা! যাহা ভাবিতে গেলে আকুল হই, তাহা কি বলিতে পারা যায়!

অদ্য স্বামী স্ত্রী একই চিন্তায় নিমগ্ন। স্বামী কি চিন্তা করিতেছেন, সুশীলা বুঝিতে পারিলেও তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিতে আগ্রহান্বিতা। সুশীলাকে আপনার মর্ম্মকথা বলিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যেন কিছু লজ্জা-বোধ হইতেছে। বুদ্ধিমতী সুশীলা তাহাও নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই লজ্জাটুকু ভেদ করিতে পারিলেই, তিনি স্বামীর হৃদয়কথা তাঁহারই মুখে শুনিতে পাইবেন. এই অভিপ্রায়ে কহিলেন,—"আমি জোর

করিয়া শুনিব”। সুশীলার কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় তটস্থ অবস্থা লাভ করিয়া কহিলেন,—“যাহা ভাবিতে গেলে ইত্যাদি”। সুশীলা এখন আর কোন কথা শুনিতে ইচ্ছা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। কহিলেন, “এখন আসুন, ঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত হইয়াছে”। ব্রাহ্মণ দম্পতী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপুরুষ প্রদত্ত গ্রন্থ দুইখানি অতি আগ্রহের সহিত নিত্য পাঠ করেন। প্রত্যহ বেলা তিনটা হইতে সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঠাকুর সম্মুখে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠের সময়। পিসীমা ও সুশীলা ঐকান্তিক অভিনিবেশের সহিত এবং ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে প্রতিদিন বিভোর হইয়া যাইতেন। এই স্থলে, পিসীমা সম্বন্ধে একটী ঘটনা সুশীলা কিরূপ অবলোকন করিয়াছিলেন, পাঠকগণ! তাহা শ্রবণ করুন।

ইতোপূর্ব্বে পাঠকগণকে নিবেদন করিয়াছি, পিসীমা বিধবা হইলেও সুখী। বিধবার জীবনে সুখ অসম্ভব কথা; আমার কেন অনেকেরই এইরূপ বোধ হইবে। কিন্তু পাঠকগণ! বৈধব্য জীবনের যিনি বিধাতা, তাঁহার রচনার মধ্যে নিশ্চয়ই মঙ্গল অভিপ্রায় আছে। যদি বিধবা সেই মঙ্গল অভিপ্রায় অনুভব করিয়া, তৎসাধনে যত্নবতী হয়েন, তবে ত তাঁহার বৈধব্য দশার সার্থকতা হইল। মনুষ্য জীবনের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, বিধবার জীবনে কি তাহার সাধন অসম্ভব? যদি এমন কথা হয় তবে স্বীকার করিতে পারি, বৈধব্য-জীবন নিষ্প্রয়োজনীয়। আর যদি এই কথা মিথ্যা হয়, তবে বৈধব্যদশা বিধবার সম্বন্ধে পরম কল্যানকর। বিধবার জীবন সহজে স্বার্থসুখতাৎপর্য্যহীন, বিধবার জীবন বিশুদ্ধ প্রীতি অনুশীলন করিবার অনুকূল অবস্থা। বিধবাকে সহজেই ভাবিতে হইবে, আমার এই জগতে কোন সুখের আশা নাই,—এই সংসারে আমার বলিতে

আমার কেহ নাই। পাঠকগণ! কোন নিরালম্ব অবস্থায় উক্তরূপ চিন্তা যদি কখনও করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে পারিবেন, যে যাহার কেহ নাই,—সংসারে যাহার কোন সুখ নাই, সেই ব্যক্তির যথার্থ সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার উপক্রম হইল, তিনি প্রকৃত সুখের সম্পত্তিশালী হইবেন, তাহারই সূচনা আরম্ভ হইল। আর বিধবার অবস্থা লাভ করিবার জন্য ভগবদ্‌উন্মুখী ব্যক্তিকে অনেক যত্ন করিতে হয়। যে বস্তুর যত পরিমাণ ব্যবহার তাহার তত পরিমাণ অপব্যবহার করা যাইতে পারে। অগ্নি দ্বারা জগৎ কত উপকার লাভ করে, আবার সেই বস্তুর অপব্যবহার হইলে, তাহার দ্বারা সংসারের কত অনিষ্ট সাধিত হয়। বৈধব্য জীবন সম্বন্ধেও সেইরূপ। এখন যাহা বলিতে যাইতেছিলাম সেই কথা হউক।

পিসীমার রসনায় সর্ব্বদা ভুবনমঙ্গল "হরেকৃষ্ণ" নাম নৃত্য করিতেছেন। নামগ্রহণ ব্যতীত পিসীমা আর কোন অনুষ্ঠান করিতে জানেন না। নাম লইতে লইতে পিসীমার হৃদয় একখানি স্বচ্ছ দর্পণ সদৃশ হইয়াছে। পিসীমা সর্ব্বদা কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দে নিমগ্ন থাকেন, তাহা সাংসারিক বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। একদিন সন্ধ্যার অল্প সময় পূর্ব্বে পিসীমা আপনার গৃহমধ্যে বসিয়া নামগ্রহণ করিতে করিতে বাহ্যশূন্য অবস্থায় আসনোপরি উপবিষ্টা আছেন, গৃহের দরজা অনর্গলসম্বদ্ধ। সুশীলা কোন কার্য্য উপলক্ষে পিসীমার গৃহ-সম্মুখস্থ অঙ্গণ হইয়া যাইতে দেখেন, দরজার মধ্য দিয়া একটী উজ্জ্বল রশ্মি নির্গত হইতেছে। তখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়াছেন; সন্ধ্যা হইতে আর অল্পই বাকি আছে। সুশীলা পিসীমার ঘর হইতে উজ্জ্বল রশ্মি বহির্গত হইবার কারণ নিরূপণ করিতে না পারিয়া, গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলেন। দরজা খুলিবামাত্র এক অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ঘটনা সুশীলার দর্শন-গোচর হইল।

অতি সন্তর্পণে সুশীলা পিসীমার গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

সেই অপরূপ দর্শনে সুশীলার হৃদয় উল্লাস-পরিপূর্ণ হইয়াছে। গৃহকর্ম্ম সমুদয় সমাপ্ত হইলে রাত্রিতে সুশীলা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উচ্ছ্বাসের সহিত সেই ঘটনা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সু—পিসীমা——বলিতে গিয়া সুশীলা আর কিছুই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

ভ—পিসীমার সম্বন্ধে কি বলিবে ?

সু—সে অতি আশ্চর্য্য !!

ভ—কি ? বলিলে তবে ত বুঝিব।

সু—আমার সেই হইতে চক্ষুতে কি এক অদ্ভুত দৃশ্য লাগিয়া রহিয়াছে।

ভ—কি বল ত !

সু—মনে হইতেছে স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা ত নয় !

ভ—থাক্, তোমায় এখন আর বলিতে হইবে না।

সু—আমি যতবার বলিতে যাইতেছি, ততবার সেই অপরূপ ঘটনা আমার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া আমায় নির্ব্বাক করিতেছে।

সুশীলার কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিতেছেন, যে সুশীলা পিসীমার সম্বন্ধে কোন অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়াছেন এবং পত্নীর কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সেই ঘটনা বিষয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু সুশীলার অবস্থা পাঠকগণ ! বেশ বুঝিতেছেন, তিনি বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিতেছেন না।

ভ—কি বল না।

সু—প্রথমে দেখি, পিসীমার ঘর তেজোময়। তাহার পর দেখি, পিসীমার পরণের কাপড় নয়নস্নিগ্ধকর উজ্জ্বল্ জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট। পিসীমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-নির্গত আশ্চর্য্য কান্তি দেখিয়া আমার দুই চক্ষু ভাসিয়া গেল। পিসীমার মুখ হইতে অদ্ভূত দীপ্তি বাহির হইয়া আমার হৃদয় সেইরূপ

দীপ্তিময় করিয়া ফেলিল। অধিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমার ভরসা হইল না। দরজা বন্ধ করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

ভ—পিসীমাকে আমরা চিনিতে পারি নাই। পিসীমা মহা অধিকারিণী ব্যক্তি। তুমি ভাগ্যবতী, যে তাঁহার এই অবস্থা দর্শন করিয়াছ।

সু—আচ্ছা! পিসীমার এই অবস্থা কিরূপ?

ভ—হরিনামের মহিমা অসীম, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর।

সু—বলুন না, আপনার পায়ে পড়ি।

ভ—সুশীলা! পিসীমা নামগ্রহণে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছেন। আমাদের চিত্ত সাংসারিক বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মলিন এবং ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। নামের প্রভাবে মন হইতে লৌকিক চিন্তা সমুদয় বিদূরিত হইলে প্রথমতঃ তাহা নির্ম্মল হয়। ক্রমে নামগ্রহণে প্রগাঢ় রুচি জন্মিলে তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত মন তেজোময় স্বরূপ লাভ করিয়া, অপ্রাকৃত চিন্ময় রাজত্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে উপযুক্ত হয়। এই অবস্থাপ্রাপ্তি, নাম-সাধনের প্রথম সিদ্ধি।

সু—নামগ্রহণের এত মহিমা আমরা বুঝিতে পারি না।

ভ—সেই বোধশক্তি সম্প্রতি মলিনতার আবরণে অদৃশ্য। নামগ্রহণ প্রভাবেই হৃদয়াকাশে তাহার পুনরাবির্ভাব হইবে।

সু—আমি পিসীমার চরণামৃত পান করিব, আমার যেন নামের আশ্রয় লইতে মতি হয়।

ভ—আমিও লইব। পিসীমাকে তুমি ভক্তিপূর্ব্বক সেবা কর। আমি তাঁহার কিছুই করিতে পারি না।

সু—আমার সেবা করাতে বুঝি আপনার কিছু করা হয় না?

ভ—হয়, সুশীলা! তোমার ভক্তিগুণে আমিও কৃতার্থ হইব।

সু—আপনি কি কথায় কি কথা বলেন?

সেদিন রাত্রিতে পতি পত্নীর কত কথোপকথন হইল, তাহা পাঠকগণ! অনুভবে অবগত হইতে পারিবেন।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে সুশীলা অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন অনুভব করিলেন। এতদিন সন্তান অভাবে সুশীলার অন্তঃকরণ ম্রিয়মান ছিল। সন্তান-সম্ভবা হইয়া সুশীলা প্রফুল্ল-হৃদয় হইলেন। অতি কষ্টের সহিত সুশীলা সংসার-ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি বিধাতা বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। ললিত বাবু এবং অন্যান্য প্রতিবাসীগণ অতি আগ্রহের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এখন কোথা হইতে কি খরচ আইসে, সুশীলাও বড় একটা হিসাব রাখিতে পারেন না। ক্রমে "ঠাকুর যা করেন, তাই হয়" এই বাক্য সুশীলার হৃদয়ে স্থায়ীরূপে অঙ্কিত হইয়া গেল। সুতরাং আরও একটী গুরু চিন্তা-ভার অপস্থত হওয়াতে সুশীলার হৃদয়ে আর বিষাদের চিহ্নমাত্র রহিল না। ইতঃপূর্ব্বে সুশীলা দেখিতে বড় কৃশ ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি সুশীলাকে কিছু হৃষ্ট পুষ্ট দেখা যায়। পাড়ার মেয়েরা সুশীলার এই অবস্থান্তর দর্শনে সকলেই আনন্দিতা, কেননা গ্রামে এমন একজন ব্যক্তি নাই, যিনি সুশীলার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী নহেন।

কিছুদিন পরে পিসীমা সংবাদ পাইলেন, সুশীলা সসত্ত্বা হইয়াছেন। পিসীমার মনে আনন্দ আর ধরে না। পিসীমা দৃঢ় সংকল্প করিলেন, আর সুশীলাকে সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইবে না, এইবার আমি সমস্ত গৃহকার্য্য দেখিব। আহা! এখন সংসারে সুশীলা যদি শারীরিক পরিশ্রম করে, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা ভাল দেখায় না। নামানন্দে বিভোর পিসীমার এই ঘটনা উপলক্ষে যে চিত্ত-পরিবর্ত্তন তাহার কারণ আছে। পাঠকগণ! মনে করিবেন না উপস্থিত এই মনোভাব তাঁহার হৃদয়ের সাধারণত্বের পরিচয় দিতেছে। যথার্থ পিসীমার যে সংকল্প সেই

কাজ। পিসীমা এখন আর সুশীলা ধমকাইলে শুনেন না। সুশীলা পিসীমার এবম্বিধ আচরণ দর্শনে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিতা। পিসীমা যে সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া করিতে জানেন, এ ধারণা সুশীলার কোন কালে ছিল না। সুশীলা পিসীমাকে যখন অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সাংসারিক কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে দেখিলেন, তখন তিনি "পিসীমা সম্বন্ধে অযথা ধারণা মনে পোষণ করিয়া অপরাধ করিয়াছি" বলিয়া অনেক সময়ে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিতেন। পিসীমা সুশীলার কথায় হাসিতেন মাত্র।

আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় পত্নী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন জানিয়া একদিন রাত্রিতে সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—সুশীলা! তুমি ঠাকুরের নিকট কি সন্তান প্রার্থনা কর?

সু—আমি কি প্রার্থনা করিব। ঠাকুর যা দেন।

ভ—আচ্ছা! যদি তোমার একটী মেয়ে হয়।

সু—কেন, আপনি কি জানিতে পারিয়াছেন, মেয়ে হবে?

ভ—আমি বল্‌ছি, যদি হয়।

সু—সব ঠাকুরের ইচ্ছা।

ভ—সুশীলা! তোমার একটী মেয়ে হবে।

সু—তা বেশ।

ভ—আচ্ছা সুশীলা! সহসা তোমার গর্ভসঞ্চারের কারণ কিছু মনে কর?

সু—আপনার কিছু অনুমান হয় নাকি?

ভ—আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ।

সু—আপনি বলুন না কেন।

ভ—তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে নাই।

স্থ—কেন, আমি কি অপরাধ করিলাম?

ভ—সুশীলা! তোমার কিন্তু একটী মেয়ে হ'বে।

স্থ—আপনারও মেয়ে ত?

সে দিবস রাত্রিতে স্বামী স্ত্রীতে কত কথোপকথন হইল, তাহা আর বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুশীলা পিত্রালয়ে।

একমাস দুইমাস করিয়া প্রায় চারি মাস অতীত হইল। পিসীমা সুশীলাকে এখন আর সংসারের কোন পরিশ্রমের কাজ করিতে দেন না। সুশীলার মা এই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া একদিন নগেন্দ্র বাবুকে সুশীলাকে আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। সুশীলা ত এখন সাংসারিক কোন কাজ কর্ম্ম করিতে অপটু, এই সময়ে একবার পিত্রালয়ে যাইবার সুযোগ হইতে পারে। অনেক দিবস হইল, সুশীলা পিত্রালয়ে যান নাই, কাজেই পিসীমা আর কোন আপত্তি না করিয়া সুশীলাকে পাঠাইয়া দিলেন। বিদায়কালে পিসীমা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"মা! আমায় ফেলিয়া বেশী দিন থাকিও না"। পিসীমার স্নেহাভিনয় দর্শনে সুশীলা আর্দ্র হৃদয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে কহিলেন, "পিসীমা! আমি আবার অতি শীঘ্র আসিব"। এই বলিয়া সুশীলা পিসীমার চরণ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। আজ সুশীলা বাপের বাড়ী যাইবে, পাড়ার অনেক বৌ-ঝি সুশীলাকে দেখিতে আসিয়াছেন, সকলেই সুশীলার বিরহ-চিন্তায় ব্যাকুলা। নগেন্দ্র বাবু এই ঘটনা দেখিয়া, অতীব আশ্চর্য্যান্বিত। ভাবিলেন, আমার ভগিনীকে সকলেই ভালবাসেন।

নৌকায় নগেন্দ্রবাবু ও সুশীলা উঠিলেন, সঙ্গে একটী টিনের বাক্স। দুই ভাই-বোনে কথোপকথন করিতে করিতে নৌকারোহণে যাইতেছেন। কথায় কথায় সুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা! বউ দিদি আজকাল সকলের সহিত কেমন ব্যবহার করিতেছেন?

ন—সেই রকমই সুশীলা! তুমি এবার যাইয়া যদি তাহার কিছু করিয়া উঠিতে পার!

সু—সব ঠাকুরের ইচ্ছা দাদা! আপনার মেয়েটী কেমন আছে?

ন—তার খুব অসুখ, ডাইনীর হাতে কি ছেলে মেয়ে বাচে?

সু—ছি দাদা! ও কথা বলিতে নাই।

ন—আমি কি সাধ করে বলি; তুমি আমার দুঃখ জাননা, তাই ও কথা বলিতেছ।

সু—আপনি চিন্তা করিবেন না, ঠাকুর বউ দিদিকে অবশ্য ভাল করিবেন।

ন—সুশীলা! তোমার কথা সত্য হউক; আমি যে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না!

সুশীলা দাদার অবস্থা বুঝিয়া ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"ঠাকুর! দাদার দুঃখ আর রাখিও না"। আহা! সাধ্বী ধর্ম্মপরায়ণা সুশীলার প্রার্থনায় ঠাকুর সংসার মুক্ত করিতে পারেন, পতির অবাধ্য নারীর কথা অতি সামান্য।

সু—ছি, দাদা! শান্ত হও, সকলই আপনার আপনার অদৃষ্টের দোষবশতঃ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। এখন অন্য উপায় আর চিন্তা না করিয়া, ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা প্রার্থনা করুন, কিসে আমাদের চিত্ত ভাল হয়,—কেমন করিয়া আমরা আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবাসী সকলকে সরল প্রাণে ভালবাসিয়া জীবন কাটাইতে পারি।

নৌকায় বসিয়া সুশীলা ও নগেন্দ্রবাবুতে কথোপকথন হইতে থাকুক, ইতোমধ্যে নগেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া রাখি।

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, নগেন্দ্রবাবুরা বনিয়াদি ঘর। কিন্তু সম্প্রতি

বসতবাটীটুকু ছাড়া তাঁহাদের আর কোনই সম্পত্তি ছিলনা। কয়েক বৎসর হইল, নগেন্দ্রবাবুর পিতাঠাকুর ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিধবা জননীর একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রকে লইয়া সংসার। নগেন্দ্রবাবু, পিতার তত্ত্বাবধানে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তাহার পর কোন বড় আপিসে বার হাজার টাকা জমা দিয়া তিন শত টাকা বেতনের একটী চাকুরী পাইয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুদের পূর্ব্বাবস্থায় যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইয়া প্রতিপালিত হইতেছিলেন, অবস্থান্তর ঘটিলেও তাঁহাদের বিদায় লইতে বলা যায় না। সকলেই অনাথা, নিরাশ্রয় ; উক্ত সামান্য আয় মধ্য হইতেই সকলকে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন হইতে বঞ্চিত করা না হয়, ইহা গৃহিণী এবং নগেন্দ্রবাবুর অভিমত এবং সেই মতানুযায়ী এতদিন সংসার চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কয়েক মাস হইল, নগেন্দ্রবাবুর বেতন হ্রাস হওয়ার জন্য নগেন্দ্রবাবুর বৃহৎ সংসার অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হইতেছে। এই এক বিষয় লইয়া নগেন্দ্রবাবুর তাঁহার স্ত্রীর সহিত মনের অমিল। পত্নী মনে করেন, স্বামী এত উপার্জ্জন করেন, আমার ভাল দুই একখানি অলঙ্কার দিবার চেষ্টা না করিয়া, অন্যায়রূপে সকলের জন্য অর্থব্যয় করেন কেন? তিনি সকলকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিতে স্বামীকে পরামর্শ দেন, কিন্তু সুশীলার ভ্রাতা নগেন্দ্রবাবুর হৃদয় তাঁহার পত্নীর মত সঙ্কীর্ণ নহে। কাজেই তিনি পত্নীর বাক্য পালন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অধিকন্তু নগেন্দ্র বাবু ধর্ম্মভীরু হইয়া অপরাপর সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রীর সহিত একচিত্ত হইয়া, ব্যবহার করিতে অপারক। স্ত্রী চান স্বামীটী শাশুড়ীর বাধ্য না হইয়া, তাঁহার কথামত চলিবেন। কিন্তু তিনি যত স্বামীকে মনের মত করিয়া, গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন, ততই তিনি নগেন্দ্রবাবুর চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইতেছেন। পত্নী মনে করেন, আমি স্বামীকে শিখাইয়া আমার মতে

আনিব, আবার নগেন্দ্রবাবু ভাবেন, তিনি উপদেশ দানে স্ত্রীকে মনের মত করিয়া সংশোধন করিবেন। এই অবস্থায় পাঠকগণ! বুঝিতে পারেন, স্বামী স্ত্রীতে কেমন সুন্দর যোজনা হইয়াছে। পরস্পর হয় ত কতদিন ধরিয়া কেহ কাহারও সহিত কথা বলেন না। কতদিন পত্নী মান করিয়া, শয্যার আশ্রয় গ্রহণে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন; মনে আশা, স্বামী আসিয়া কর্ণরসায়ণ তোষামোদ-বাক্য-প্রয়োগে আহারাদি করাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন। নগেন্দ্রবাবুর এরূপ ঘটনায় ভ্রূক্ষেপও নাই। মার নিকট আহারাদি কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ পূর্ব্বক বহির্ব্বাটীতে নিশাযাপন করিয়াছেন। একবার স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া স্ত্রী পিত্রালয়ে যাইলেন; সেইখানে সেইরূপ, সকলের সহিত ঝগড়া করিয়া আবার আপনি ভাইয়ের দ্বারা শ্বশুরালয়ে সংবাদ দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এই ঘটনার পর হইতে বৌয়ের মনে আর সুখ নাই। তিনি এখন বেশ বুঝিয়াছেন, তাঁহার কথা আর দাঁড়াইবে না। মনের দুঃখে বউ আর কাহারও সহিত আলাপাদি করেন না, আপন মনে থাকেন। নগেন্দ্রবাবুর মাতাঠাকুরাণী অতি নিরীহ ভালমানুষ, বধুর চরিত্র বুঝিয়া তাঁহার কোন কথায় থাকেন না। পুত্র বাধ্য আছে, তাঁহার বিবাদের বিশেষ কোন কারণ নাই। পরিবারের এই অবস্থায় সুশীলা পিত্রালয়ে আসিতেছেন।

ক্রমে নৌকাখানি হাবড়া-ঘাটে আসিয়া পঁহুছিল। একখানি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া দুই ভাই-বোনে বাটী আসিয়া উপনীত হইলেন। অনেক দিন পরে মাতা কন্যা পরস্পর দর্শনে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অনেক দিন পরে সুশীলা পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, এই কথা পাড়ায় সংবাদ যাইবামাত্র, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে দেখিতে আসিলেন। সুশীলা সকলের সহিত প্রীতি-আলাপন করিলে পর, সন্তুষ্ট মনে সকলে

আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অবশেষে সুশীলা দাদার গৃহে যাইয়া দেখেন, বউ ঠাকুরাণী শয্যায় শুইয়া আছেন। সুশীলা পালঙ্কের নিকট গিয়া ডাকিলেন,—"বউ দিদি"! সুশীলার মিষ্ট স্বর, তাহাতে যেন কত ভালবাসা-মাখা। বউ আর মৌন থাকিতে পারিলেন না; কহিলেন,—"সুশীলা এসেছ? আমার মেয়ের, ভাই ভারি অসুখ" বলিয়া একটু কাঁদিলেন।

সু—ভয় কি, ভাল হইয়া যাইবে।

বউ—ভাই! আমি এখন তোমাদের বাড়ীর কণ্টকস্বরূপ হইয়া আছি। আমার মরণ হ'লেই বাঁচি।

সু—ছি ছি! একথা মুখে আনিতে নাই, তোমার দুঃখ কিসের?

ব—আমি তোমার দাদার দুচক্ষের বিষ হইয়াছি, এর চেয়ে আর দুঃখ কি হইবে?

সু—স্বামী কি স্ত্রীকে কখনও অপ্রীতি করেন? তবে ঘর করিতে গেলে কত কি হয় ভাই! তা'বলে কি চিরদিন সমান যায়?

অনেক দিনের মধ্যে বউ এমন মিষ্ট আশ্বাস বাক্য আর কাহারও নিকট শুনেন নাই। সুশীলার আশ্বাস-বাক্যে বৌয়ের হৃদয়ে যে দুঃখ, আক্রোশানলে জ্বলিতেছিল, তাহা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। বউ ভাবিল, সুশীলা এখন আমার বন্ধু, সুশীলাকে মনের সুখ দুঃখের কথা বলিতে পারিব।

সু—বউ দিদি! রাত্রি হইয়াছে, খাওয়া দাওয়া করিবে না?

ব—তুমি ভাই যাও। আমায় বামন দিদি এইখানেই কিছু দিয়া যাইবে এখন।

সু। সে কি ভাই! তুমি বাড়ীর বউ, তোমার এ রকম আল্‌গা আল্‌গা ভাবে থাকা ভাল দেখায় না। চল ভাই! কতদিন পরে এলাম,

আজ একসঙ্গে বসিয়া খাইব।

বউ সুশীলার কথায় আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। সুশীলা বউ দিদির হাত ধরিয়া পাকগৃহে তাঁহাকে আহার করাইতে লইয়া আসিলেন। খাইতে খাইতে উভয়ের মধ্যে অনেক কথোপকথন হইল। অনেক দিবস পরে বউ মনের অনেক কথা বলিয়া কিয়ৎপরিমাণে শান্তি-লাভ করিলেন। এখন সুশীলা বউ দিদির কথায় সায় দেওয়া ছাড়া আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না। সুশীলার অনুরোধে নগেন্দ্রবাবু আজ পত্নীর প্রকোষ্ঠে আসিলেন। এই ঘটনার মধ্যে সুশীলার প্রেরণা অনুভব করিয়া বধূর, ননদিনীর উপর শ্রদ্ধা বই অবজ্ঞার ভাব কিছুতেই আসিতে পারিল না।

পরদিবস নগেন্দ্র বাবু আপিসে যাইলে একটী সুসংবাদ পাইলেন। তাঁহার যে বেতন হ্রাস হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববৎ হইয়াছে। একথা নগেন্দ্র বাবু মাতাঠাকুরাণী এবং সুশীলা ব্যতীত আর কাহাকেও জানাইলেন না। এদিকে সুশীলা পঞ্চমাস গর্ভিনী; পঞ্চম মাসে সুশীলার মাতাঠাকুরাণী কন্যাকে বিশেষ উৎসবের সহিত পঞ্চামৃত পান করাইলেন। ইহার অল্প-কাল পরে কয়েক দিনের মধ্যে নগেন্দ্রবাবুর পীড়িত কন্যাটী ইহধাম পরিত্যাগ করিল। মেয়েটীর মৃত্যু হইলে নগেন্দ্রবাবু একদিন সুশীলাকে কহিলেন,—"দেখ সুশীলা! আমি যা বলেছিলাম, তাই ঘটিল; ডাইনীর হাতে কি ছেলে মেয়ে বাঁচে?"

সু। ছি দাদা! অমন ক'রে কাহাকে বলিতে নাই। তার পরমায়ু নাই, সে মরিয়া গেল। বউ দিদির তাতে দোষ কি?

ন। তুমি দেখ্‌ছি একেবারে তোমার বউ দিদির পক্ষ হইয়া দাঁড়াইলে। তবে আর তোমার সাক্ষাতে তাহার নিন্দা করা হইবে না।

কন্যাশোকে বৌয়ের হৃদয় অধিকতর ম্রিয়মাণ হইল। সুশীলা

বুঝিলেন, এই অবস্থায় বউ দিদিকে দুই এক কথা বলিলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। একদিন বিকালবেলা বউ আপনার কক্ষায় একা বাগানের দিকে সম্মুখ করিয়া একখানি চৌকির উপরি বসিয়া আছেন। অন্তঃ-করণে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। সুখ থাকিবেই বা কিসে? পিত্রালয়ে, শ্বশুরালয়ে,—কোথায়ও কেহ দেখিতে পারেন না। এই দুঃখের উপর কন্যাটী মরিয়া গেল। অবসাদগ্রস্তচিত্তে আপনার অদৃষ্ট কথা ভাবিতে ভাবিতে বউ কাঁদিতেছেন। কখনও মনে করিতেছেন,—"আর আমার বাঁচিয়া থাকায় ফল কি? আমি মরিব"। আবার সুশীলার ভালবাসা স্মরণ করিয়া, অতি শোকাতুর-হৃদয় শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। এমন সময় সুশীলা চুপি চুপি গৃহের অভ্যন্তরে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে সুকোমল চম্পকাঙ্গুলি দ্বারা বউ দিদির চক্ষুর্দ্বয় আবরণ করিলেন। হস্ত-স্পর্শে অনুভব করিলেন, বউ দিদি কাঁদিতেছেন।

সু। বউ দিদি! কাঁদিতেছ কেন ভাই? হরি দিয়াছিলেন, তিনি আবার লইয়াছেন। ইহাকে দুঃখ ভাবিয়া কষ্ট পাইও না।

বউ। ভাই! দুঃখ করিয়া কাঁদি না। এ জন্মে আমি আর কাহারও ভালবাসার পাত্রী হইব না; তবে আর আমার বাঁচিয়া থাকায় ফল কি?

সু। আচ্ছা! বউ-দিদি! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, সরলভাবে তাহার উত্তর দিবে?

ব। তোমার নিকট আমার আর কোন কথা গোপন নাই। এই বিপদকালে তুমি না থাকিলে আমি বিষ খাইয়া মরিতাম। এই বলিয়া সুশীলার গলা ধরিয়া বউ অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

সু। বউ স্থির হও। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দাও। বউ মুখ তুলিয়া কহিলেন,—"বল"।

সু। আচ্ছা! তোমার সহিত দাদার ভালবাসা না হইবার কারণ কি?

ব। আমি বলি, এত লোক পোষণ করিতে গেলে কেমন করিয়া চলিবে? কয়দিন, যে কষ্টে সংসার চলিয়াছে, তাহা আর তোমায় কি বলিব?

সু। এখন এক প্রকার সংসার নির্ব্বাহ হইতেছে ত?

ব। তা চলিবে না কেন? কিন্তু দেখ এই শাঁখা ছাড়া আমার আর কি আছে?

সু। আচ্ছা ভাই! এখন যদি তোমার গায়ে অনেক অলঙ্কার থাকিত, তাহা হইলে কি তোমার মনের দুঃখ দূর হইত?

ব। তা কি হয়! গহনায় কি এই দুঃখ যায়?

সু। তবে এই দুঃখ যায় কিসে?

ব। তোমার দাদা যদি আমায় ভালবাসে, তবে আমি আর কিছু চাই না।

সু। সুদ্ধ দাদার ভালবাসা পাইলে হইবে না ভাই! মা, আত্মীয় স্বজন, বাটীর পশু পক্ষীটি র পর্য্যন্ত ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে, তখন হৃদয়ে সুখ পাইবে। সকলে দাদার উপার্জ্জনে প্রতিপালিত হয়, ইহাতে তুমি অমত করিয়া সকলের মনোদুঃখের কারণ হইয়াছ; তাহাতেই এমন দুঃখ পাইতেছ, আর দাদাও তোমায় ভাল বাসেন না।

ব। আমি ত ভালর জন্যই বলিতাম।

সু। তুমি আপনার সুখের জন্য বলিতে। দেখ, ভগবান সকলকে খাইতে দেন, দাদা উপলক্ষ মাত্র। আর দেখ, মরিবার সময় কি কিছু সঙ্গে যাইবে? যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, সকলের সহিত ভালবাসা থাকিলে কেমন হয়, আর মনের অমিল, বিবাদ চলিলে কেমন হয়?

ব। আমারই মনের দোষে কষ্ট পাইতেছি; সুশীলা তুমি ঠিক বলিয়াছ।

সু। এখন হইতে তুমি মাকে সেবা কর। দেখ, তুমি পুত্রবধূ হইয়া শ্বাশুড়ীর সেবা কর না।

ব। ভাই! মা আমায় কাছে যাইতে দেন না।

সু। দেন না কেন জান?

বউ সুশীলার কথায় নীরব হইলেন। তখন সুশীলা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"দেখ বউ-দিদি! এই সংসার কয়দিনের জন্য? দেখ, তোমার মেয়েটী এক বৎসর না যাইতে যাইতে মরিয়া গেল। মরিয়া কোথায় গেল বল দেখি? সংসারে আসিল, কোন সুখভোগ করিল না—কেবল আসিল আর যাইল। এ সব কথা কি কখনও ভাবিয়া দেখ? এই বাড়ী, এই ঘর, যাঁহারা এক সময় করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়? তুমি আজ এই ঘরে বসিয়া আছ, তুমিই বা আর দুই দিন পরে কোথায় থাকিবে? তবে কয়দিনের জন্য কেন আর কাহাকেও পর ভাব, কাহাকেও আপন ভাব। সকলকেই আপন ভাব, সুখে থাকিবে। দেখ, তুমি সকলকে পর ভাবিয়া দুঃখ পাইতেছ। কেন যে দুঃখ পাও, তাহা ঠিক করিতে পার না। এখন সকলকে আপন ভাব, সুখে থাকিবে। সকলকে ভালবাস; যখন দাদা প্রতিপালন করিতেছেন, ভাব সকলেই তোমাদের আপন। ভাই লক্ষ্মী দিদি! মাকে, দাদাকে, সকলকে আর কষ্ট দিও না।

সুশীলার উপদেশে আজ বৌয়ের চক্ষুঃ ফুটিল। সুশীলা এক একটী উপদেশ দিতেছেন, আর বউ অঝোর নয়নে কাঁদিতেছেন। অবশেষে বউ কহিলেন,—"সুশীলা! আজ হইতে আমি তোমার কথা শুনিব"। তখন সুযোগ বুঝিয়া সুশীলা কহিলেন,—"বউ দিদি! আমার আর একটী কথা

শুনিতে হইবে"।

ব। তোমার কথা আমি প্রাণ দিয়া শুনিব; কি বল?

সু। ভাই! তুমি সর্ব্বদা ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিবে,—'এ পর্য্যন্ত আমি বুঝিতে না পারিয়া যে সকলকে দুঃখ দিয়াছি, তাহার জন্য ঠাকুর! তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমায় সুমতি দাও, যেন এখন হইতে আমি স্বামীর মনোমত হইয়া চলিতে পারি'। আর তুমি মনে মনে হরিনাম করিবে।

বউ স্বীকৃত হইলে সুশীলার কার্য্য শেষ হইল।

সেইদিন রাত্রিতে নগেন্দ্রবাবু পত্নীর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিলেন। অনুতাপ দগ্ধ স্ত্রী স্বামীর চরণে ধরিয়া সে দিবস অনেক কাঁদিলেন,—অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নগেন্দ্রবাবু একেবারে বিস্মিত। ভাবিলেন, সুশীলা স্পর্শমণি; সুশীলার স্পর্শে ডাকিনী বুঝি দেবী হইল।

ন। আজ তোমার কি হয়েছে?

ব। আজ সুশীলার উপদেশে আমার চক্ষুঃ ফুটিয়াছে; তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

ন। তবে সুশীলা তোমার গুরু হইয়াছে?

ব। যথার্থই সুশীলা আমার গুরু। সুশীলার কাছে সর্ব্বদা আমার থাকিতে ইচ্ছা করে।

ন। সুশীলার উপর তোমার এত ভক্তি কি করিয়া হইল?

ব। সুশীলার মিষ্ট কথায় প্রাণ জুড়াইয়া যায়। ভালবাসাময় উপদেশ, না শুনিয়া থাকিতে পারা যায় না। সুশীলার গুণেই সুশীলার উপর ভক্তি হয়। আমি এতদিন যে অসীম কষ্ট পাইতেছিলাম, সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছি। এখন কেবল মনে হইতেছে, আমি সকলের নিকট অপরাধী, সকলের নিকট হইতে ক্ষমা চাহিতে মন সর্ব্বদা দৌড়াইতেছে।

পত্নীর মুখে অভাবনীয় কথা শুনিয়া, নগেন্দ্রবাবু আশ্চর্য্য হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এইবার হইতে তুমি মায়ের সেবা করিবে" ?

ব। হাঁ, সুশীলা মায়ের সেবা করিতে বলিয়াছে।

ন। আচ্ছা! আমি যে তোমায় কত করিয়া বুঝাইয়াছি, তখন আমার কথা শুনিতে না কেন ?

ব। কি জানি, তাহা আমি বলিতে পারি না। তখন আমার বড় দুর্ব্বুদ্ধি ছিল।

ন। সুশীলার ভালবাসায় যে তোমার দুর্ব্বুদ্ধি যাইল, ইহা আমাদের সংসারের পরম মঙ্গল। (পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন) কিন্তু আমার কথা তুমি কখনও শুনিতে না, এ দুঃখ চিরদিন থাকিবে।

ব। কেন, আমি এখন হইতে তোমার কথা শুনিব।

নগেন্দ্রবাবু পত্নীর কথায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, দেখ কিরণ! তুমি অনেক কষ্ট পাইয়াছ, আমিও সংসারে সুখ পাইব এ আশা জনমের মত পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সুশীলা আমাকে যথার্থই আশ্বাস দিয়াছিল। আজ সুশীলার মত ভগিনী না পাইলে, আমার জীবন ক্রমশঃ অধিকতর দুঃখময় হইয়া দুঃসহ হইত।

বহুদিনের পর দম্পতী পরস্পর মনের কথা বলিয়া প্রফুল্ল হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সুশীলার সহিত নগেন্দ্রবাবুর সাক্ষাৎ হইলে কহিলেন, "সুশীলা! তুমি বড় জোর মন্ত্র দিয়াছ"। সুশীলা ঈষৎ হাসিলেন।

পিত্রালয়ে তিন মাস অতীত হইলে একদিন সুশীলা, মা এবং দাদার নিকট স্বামীগৃহে যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

মা। এখন তোমাকে কেমন করিয়া যাইতে দিতে পারি!

সু। পিসীমা আমায় অনেক দিন না দেখিলে থাকিতে পারেন না,— আরও তিনি একা সংসারে কাজ কর্ম্ম করিতেছেন, আমি সম্মুখে থাকিলে

তিনি উৎসাহের সহিত চলেন ফিরেন।

মা। এই সময় কেমন করিয়া তোমায় যাইতে দিব! আমার বড় ইচ্ছা এইখানেই তোমার সাধ দিই।

সু। মা! কাহারও একটু মাত্র অসুখের কারণ হইয়া আনন্দ করা উচিত নয়।

ন। সুশীলা! তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, তাহাতেই মা সম্মত হইবেন।

সু। দাদা! মা সকলি বুঝেন, তবে আমার প্রতি স্নেহ বশতঃ এইরূপ না বলিয়া থাকিতে পারিতেছেন না!

মা। তুমি কতদিনের পর বাড়ীতে আসিয়াছ; এতদিন বাড়ীখান যেন হতশ্রী হইয়াছিল, তোমার আসিবার পর একটু লক্ষ্মীশ্রী-সম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের বাড়ী তুমি মা! আবার আঁধার করিয়া চলিয়া যাইবে?

সু। মা! তোমার গৃহ-লক্ষ্মী গৃহে রহিল। বউদিদি এখন তোমার কেমন বাধ্য হইয়াছেন। সংসারে পরস্পর মনের মিল হইলে তাহার লক্ষ্মীশ্রী হয়।

দুই তিন দিনের মধ্যে সুশীলা দাদার সহিত স্বামী-গৃহে আসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুশীলার কন্যা—গৌরপ্রিয়া।

সুশীলা স্বামীগৃহে আসিলেন। পিসিমা অনেক দিনের পরে আবার সুশীলাকে দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। পিসীমার এখন আর একটী কাজ বাড়িয়াছে। একজন একটী সসত্ত্বা গাভী দিয়া গিয়াছেন। পিসীমাকে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়। তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছাত্রগণ পিসীমাকে এ বিষয়ে অনেক সহায়তা করিয়া থাকেন।

একদিন দুইদিন করিয়া দিন যাইতেছে। সুশীলা কোন পরিশ্রমের কাজ কর্ম্ম না করিয়া বাগানখানির তদারক করেন। সুশীলার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে বাগানটী অতীব রমনীয় হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি সুশীলা স্বপ্নে এবং জাগ্রতে অভিনব বিস্ময়ের ঘটনা নিরীক্ষণ করেন। সুশীলা বাগানে কিংবা কোথায়ও হাঁটিয়া যাইবার সময় দেখেন, তাঁহার আগে পিছে বহু দিব্য মূর্ত্তি সমুদয় চলিতেছেন। সেই সকল দিব্য মূর্ত্তি সমুদয় দেখিয়া সুশীলার ভয় হয় না। কিন্তু এরূপ দেখিবার কারণও তিনি নিরূপণ করিতে পারেন না। একদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সবিশেষ বিবরণ শুনিয়া কহিলেন, আমিও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ দেখিয়া থাকি। তাহা শুনিয়া সুশীলার মনে আর সন্দেহ রহিল না। সুশীলা গদ্গদ স্বরে কহিলেন, "ঠাকুর যা করেন"। এইত গেল একরূপ ঘটনা। আর একদিন সুশীলা রাত্রিতে হঠাৎ স্বপ্ন দেখেন,—একটী জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকাকে সিংহাসনোপরি বসাইয়া বহুসংখ্যক অপরূপ নর নারী পূজা করিতেছেন। বালিকা

সুশীলাকে দেখিয়া ডাকিল, 'মা'! নিদ্রাভঙ্গ হইলে সুশীলা স্বামীকে স্বপ্ন বিবরণ কহিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎশ্রবণে বিস্মিত হইলেন।

এইরূপ স্বপ্নে জাগরণে সুশীলা কত কি অভূত-পূর্ব্ব ঘটনা দেখেন। সুশীলার মুখে সর্ব্বদা শুনা যায়, "ঠাকুর যা করেন"। সুশীলা দেখিতে এখন দেবীর ন্যায় হইয়াছেন। প্রকৃতই সুশীলা দেবী। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বপ্নে একদিন অপরূপ একটী বালিকাকে দেখিয়াছেন।

ক্রমে দশমাস অতীত হইল। শুভদিনে শুভক্ষণে সুশীলার একটী পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মিল। প্রসব-গৃহ আলোকোদ্ভাষিত হইল। পাড়ার মেয়েরা সকলেই সুখ্যাতি করিয়া বলিল, "এমন পরমা সুন্দরী কন্যা আমরা দেখি নাই"। আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয় পঞ্জিকা দেখিলেন, অতি শুভ-ক্ষণে কন্যা জন্মিয়াছে।

একুশ দিবস অতীত হইল, প্রতিবাসী সকলের উৎসাহে অতি সমারোহে এবং আনন্দের সহিত ষষ্ঠী পূজা উৎসব নিষ্পন্ন হইল। সুশীলার মাতা ঠাকুরাণী সুবর্ণ বলয় দিয়া নাতিনীর মুখ দেখিলেন। সুশীলার দাদাও ভাগিনেয়ীর মুখ চুম্বন করিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিলেন।

ক্রমে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিলে পর সুশীলা পিসীমাকে অবসর প্রদান করিয়া পুনরায় সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন। সুশীলার সংসারে এখন আর কোন অস্বচ্ছলতা নাই। বিশেষত যেদিন হইতে সুশীলার কন্যাটী জন্মিয়াছে, কোথা হইতে কে জিনিষ পত্র যেন ভাণ্ডার গৃহে রাখিয়া যায়। নগেন্দ্র বাবু স্বীয় পত্নী-প্রেরিত হইয়া সুশীলাকে সাহায্য করেন। সুশীলার মাও গোপনে কিছু কিছু করিয়া কন্যার নিকট পাঠাইয়া দেন। ফলতঃ, পূর্ব্বের মত সুশীলার সংসারে আর কোন কষ্ট নাই। বরং তৎপরিবর্ত্তে বিলক্ষণ স্বচ্ছলতা দাঁড়াইয়াছে।

একমাস দুইমাস করিয়া সুশীলার কন্যা ছয় মাসের হইল। অন্নপ্রাশন

উপলক্ষে সুশীলার পিত্রালয় হইতে আবার সকলে আসিলেন। সকলে আনন্দের সহিত এই উৎসবে যোগ দান করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং সুশীলার তৃপ্তি বিধান করিলেন। ললিত বাবু উক্ত দিবসে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বহু পরিমাণ দ্রব্যাদি উপহার দিয়াছিলেন।

ক্রমে দিন দিন কন্যাটী যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, আধ আধ কথা কহিতে শিখিয়া, "মা-মা", "বা-বা-বা-বা" ইত্যাদি অর্দ্ধস্ফুট-স্বর উচ্চারণ করিয়া সুশীলার কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারে অমৃত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অনেক দিন পরে সুশীলার মনোবাঞ্ছা বিধি পূর্ণ করিলেন। পিসীমা এখন সুশীলার কন্যাটীকে ক্রোড়ে লইয়া থাকিতে ভালবাসেন। কন্যাটীকে ক্রোড়ে করিলেই পিসীমার প্রাণ জুড়াইয়া যায়। পিসীমা অনেক সময় ভাবেন, "এ মেয়েটী সাধারণা নহে, কোন অপরূপ শক্তি বিশেষ আসিয়া আমাদের ঘরে জন্ম লইয়াছে"।

সূতিকা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিসীমার যত্নে সুশীলার কোনই অসুবিধা নাই। সুশীলা দেখিতে আরও সুন্দর হইয়াছেন। কন্যা কোলে সুশীলাকে যিনি দেখিতেন, তিনি ভাবিতেন, "এই কি সেই সুশীলা"। প্রকৃতই সুশীলার দর্শন এখন অতি নয়নানন্দকর হইয়াছে। সুশীলার কন্যা যেমন সুন্দরী তেমনি সর্ব্ব সুলক্ষণ-সমন্বিতা। অন্নপ্রাশনের দিবস নাম-করণ হইয়াছে, "গৌরপ্রিয়া"।

মহাপুরুষ যে হস্তলিখিত পুঁথি দুইখানি দিয়া গিয়াছেন, আজকাল সেই গ্রন্থ দুইখানি ব্যতিরেকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর কিছু পাঠ করেন না। গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে একখানি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, আর একখানি শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। গ্রন্থ বিষয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরাগের প্রথম চিহ্ন স্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের নামে প্রিয়া শব্দ যোগ করিয়া কন্যার নামকরণ করিলেন।

গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করিতে করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠ সময়ে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাতে সাত্ত্বিক লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পায়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন পাঠ করেন, পিসীমা মালা হাতে করিয়া পাঠ শুনিতে বসেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এবম্বিধ অবস্থা সন্দর্শনে পিসীমা পরমানন্দিতা। পিসীমার আদেশানুযায়ী ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংখ্যা "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্র জপ করেন, অঙ্গে তিলক চিহ্ন ধারণ করেন। একটী অভিনব ভাব তরঙ্গে সম্প্রতি ভট্টাচার্য্য পরিবার দোদুল্যমান। মহাপুরুষের কৃপাবলে এ সমস্ত অভিনব পরিবর্ত্তন।

গৌরপ্রিয়ার আবির্ভাব দিবস হইতে এক একদিন এক একরূপ ঘটনায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সংসার ক্রমশঃ সুখপুষ্ট হইতে লাগিল। একদিন আর একটী ঘটনা বড়ই আশ্চর্য্য। কন্যাকে ঘরের বারান্দায় শয়ন করাইয়া সুশীলা পুষ্করিণীতে গিয়াছেন। আসিয়া দেখেন, একটী প্রাচীন সর্প ফণা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করিতেছেন। তদ্দর্শনে সুশীলা যেমন সভয়ে কন্যার নিকটবর্ত্তী হইবেন, অমনি সর্পরাজ অন্তর্হিত হইলেন। সুশীলা কন্যাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করণান্তর প্রার্থনা করিলেন. "দয়াময় হরি! তুমি এই দুঃখিনীর ধনকে রক্ষা করিও"। অল্পক্ষণ পরে কন্যাকে ৬নারায়ণের চরণামৃত পান করাইলেন। এই সংবাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং পিসীমা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা উভয়ে ভাবিলেন, গৌরপ্রিয়া সামান্য কন্যা নহে।

অবিরল ধারে কালের স্রোত বহিতেছে। কালের প্রবাহ মধ্যে কত লোকের কত অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? আজ কেহ হাসিতেছে, আবার পরশ্ব তাহাকে কাঁদিতে দেখা যায়। আজ কেহ রোগে শোকে অভিভূত হইয়া ভাবিতেছে, "আমি চিরদুঃখী"; আবার দুইদিন পরে সেই ব্যক্তি জগৎ সুখময় মনে করিয়া কত উৎসব কল্পনা

করিতেছে। কালের গতি বিচিত্র! কিন্তু কয়জন ব্যক্তি সংসারে কাল, কর্ম্ম, অদৃষ্ট তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর?

পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারে পিসীমা এবং সুশীলা ব্যতীত আর কেহ কাজ কর্ম্ম করিবার লোক ছিল না। সম্প্রতি একজন বিধবা সদ্গোপ বালা নিরাশ্রয় হইয়া সুশীলার সংসারভুক্ত হইয়াছে। তাহার দ্বারা বাহিরের কাজ কর্ম্ম অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। গাভীটী উপযুক্ত সময়ে প্রসূত হইয়া গৌরপ্রিয়ার দুগ্ধ যোগাইতেছে। সুশীলা স্বয়ং গাভীটার তত্ত্বাবধান করিয়া তাহার লালন করেন।

ক্রমে গৌরপ্রিয়ার বয়স দুই বৎসর হইল। গৌরপ্রিয়া এখন বেশ হাঁটিয়া বেড়ায়। গৌরপ্রিয়া এখন যা শুনে, তাই শিখিতে পারে। এক দিন গ্রামের রাস্তা দিয়া এক সম্প্রদায় "নিতাই গৌর! তোমরা দু'ভাই দয়া কর মোরে"। বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। গৌরপ্রিয়া বাবার সঙ্গে কীর্ত্তন শুনিয়া আসিয়া সেই দিন হইতে বাটীর অঙ্গনে নাচিয়া নাচিয়া "নিতাই গৌর! তোমরা দু'ভাই দয়া কর মোরে"। বলিয়া গান করিয়া বেড়ায়। তদ্দর্শনে পিতা মাতার হৃদয়ে যে কি বাৎসল্য রসের উৎস উঠে, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ অনুমান করিতে সমর্থ হইবেন।

পিতা মাতার নয়নানন্দকারিণী এই বালিকা ক্রমে চারি বৎসরের হইল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গৌরপ্রিয়াকে দেখিতে অতীব সুন্দর হইতেছে। কিন্তু গৌরপ্রিয়া অনেক সময়ে বড় চঞ্চলতা করে। একদিন বৈকাল বেলা সুশীলা তাড়াতাড়ি পাকগৃহে রন্ধনকার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে গৌরপ্রিয়া খেলিতে খেলিতে আসিয়া কহিল, "মা! আমি রাঁধ্‌ব"।

সু। দেখ, এখন রান্না ঘরে ঢুকো না মা!

গৌ। আমি যে রাঁধ্‌ব।

সু। কোন্ নোংরা জায়গা থেকে আস্‌ছেন, উনি এখন রাঁধ্‌বেন।

গৌ। আমি নোংরা জায়গা থেকে আসিনি, আমি রাঁধ্‌ব।

এই বলিয়া গৌরপ্রিয়া রান্না ঘরে ঢুকিতে যায়, সুশীলা বড় সঙ্কটে পড়িলেন। উননে হাঁড়ি, এখন গৌরপ্রিয়াকে ধরিলে, আবার কাপড় ছাড়িতে হইবে। রাগ করিয়া কহিলেন, "দূর্ হ' হতভ গা মেয়ে"। মা কুপিতা হইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া গৌরপ্রিয়া আর কোন উৎপাত করিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বাবার কাছে গিয়া মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। সেইদিন রাত্রিতে শ্রীশ্রীনারায়ণদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং সুশীলাকে স্বপ্নে কহিলেন, "গৌরপ্রিয়া কখনও নোংরা নয়, তোমরা তাহাকে 'দূর হ' বলিয়াছ, আমি তাহাতে বড় দুঃখ পাইয়াছি"। জাগ্রত হইয়া স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে স্বপ্নের কথা আলাপন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, "দেখ সুশীলা! তোমার কন্যা সামান্যা নহে।" গৌরপ্রিয়া সম্বন্ধে উভয়ে এইরূপ আলাপন করিতেছেন, এমন সময় নিদ্রিত বালিকা "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুশীলা কন্যাকে কোলের মধ্যে লইয়া গৌরপ্রিয়ার সুকোমল গণ্ডে চুম্বন করিয়া কহিলেন,—"কি হইয়াছে মা!"

গৌ। হাঁ মা! নিতাই গৌর কে?

সু। মা! তাঁরা ঠাকুর।

গৌ। ঠাকুর কি মা?

সুশীলা বড় ফাঁপরে পড়িলেন। ঠাকুর কি, কি করিয়া বুঝাইবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "মা ওঁকে জিজ্ঞাসা কর"।

গৌ। (বাবার গলা ধরিয়া) বাবা! ঠাকুর কি?

বালিকাকে কি বলিয়া "ঠাকুর কি?" বুঝাইয়া দিবেন, পণ্ডিত মহাশয়ের বুদ্ধিতেও সহসা আসিল না। তখন সুশীলা বুঝাইলেন, "নিতাই

গৌর সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং নিতাই গৌরকে সকলে পূজা করেন বলিয়া তাঁহারা ঠাকুর"।

গৌ। মা! আমি নিতাই গৌর পূজা ক'র্‌ব।

সু। আচ্ছা।

গৌ। মা! নিতাই গৌর কোথায়, আমি দেখ্‌ব।

সুশীলা ভাবিলেন, "অবোধ বালিকার সহিত আর কতক্ষণ বকিব" কহিলেন,—"তোকে একদিন নিতাই গৌর দেখাইব।"

নবম পরিচ্ছেদ

রাধাপদ ও হেমলতা।

পরমার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল শ্রীভগবতোন্মুখ জনের কিরূপ অভাবনীয় ঘটনা ক্রমে মহৎকৃপা লাভ হয়, এবং অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্বিষয়ে কিশোরী বাবু একটী উদাহরণ স্থল। সতের কৃপা শক্তি প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে অতি বহির্ম্মুখ জনকেও শ্রীভগবত-পরায়ণ হইয়া আদর্শ স্থানীয় হইতে দেখা যায়। সজ্জনের অপার মহিমার গৌরব অনন্ত জীবনেও গান করিয়া সাধ মিটে না। এই সংসারে সাধু-সহবাসলব্ধ জন ধন্য।

মহাপুরুষের সহিত মিলনের পর আমাদের কিশোরী বাবুর অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি মায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীশ্রীরাধারমণ-সুখদা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। পাঠকগণ ৩য় পরিচ্ছেদে সেই ভবনের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা-পরিপাটী বিষয়ে কিশোরী বাবুর বিশেষ লক্ষ্য হইল। যে দেশ হইতে যাহা কিছু ভাল দ্রব্য সংগৃহীত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ অনুসন্ধান-পরায়ণ হইলেন। কিশোরী বাবুর মাতা এবং ভগিনীকে পূর্ব্বে অতি সংগোপনে সৎকার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিতে হইত; কিন্তু সম্প্রতি কিশোরী বাবুই উৎসাহ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিশোরী বাবু শ্রীশ্রীরাধারমণের প্রসাদ ব্যতীত অনিবেদিত কোন বস্তু গ্রহণ করেন না। নিভৃত প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে সর্ব্বদা অন্তর্ম্মুখী বৃত্তিতে অবস্থান করিতে ভালবাসেন। শ্রীশ্রীরাধারমণের একখানি প্রতিচিত্র লইয়াছেন, অতি ভক্তি সহকারে তিনি সেই চিত্রের পূজা

করিয়া থাকেন। পতিপরায়ণা ব্রজসুন্দরী স্বামীর একান্ত অনুগত হইয়া চলিতে তৎপরা। দম্পতীর এতাদৃশ পরিবর্ত্তন দর্শনে পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই চমৎকৃত। এইভাবে আট বৎসর অতীত।

কিশোরী বাবুর পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত রাধাপদ, কন্যার নাম শ্রীমতী হেমলতা। রাধাপদর বয়ঃক্রম এখন দ্বাদশ বৎসর; হেমলতা রাধাপদ হইতে তিন বৎসরের ছোট। ভাই ভগিনীতে বড় সদ্ভাব। এক সঙ্গে খেলা করে, পরস্পর মনের কথা বলাবলি করে। রাধাপদ হেমলতার সঙ্গে খেলিতে, তাহার কথা শুনিতে বড় ভালবাসে। রাধাপদ বাটীতে শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করে। কিশোরী বাবু পুত্রকে বিদ্যালয়ে দেন নাই, দুইজন সুশিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। একজন প্রাতে এবং একজন মধ্যাহ্নে রাধাপদকে পাঠ শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর হেমলতা মায়ের কাছে পড়ে। দুই ভাই ভগিনী অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন, অল্পকালমধ্যে অনেক শিখিয়া ফেলিয়াছে। দুইজন যেমন অপূর্ব্ব রূপবান্ রূপবতী, তেমনই সুশীল সুশীলা।

দুই ভাই ভগিনী একত্রে খেলা, একত্রে ভোজন, সর্ব্বদা একত্রে অবস্থান করে। রাধাপদর একটী পুতুল আছে, নাম রাধারমণ; আর হেমলতার পুতুলের নাম বিনোদিনী। ভ্রাতা ভগিনী ঠাকুরের নামে পুতুল দুইটীর নাম রাখিয়াছে। আমরা এখন আর পুতুল বলিব না, নাম ধরিয়া ডাকিব। রাধাপদ রাধারমণকে বেশ ভূষা পরায়, কোন উৎসবের দিন হইলে কত ছন্দে সাজায় গোজায়। রাধাপদ আপনি খাইবার পূর্ব্বে রাধারমণকে খাওয়ায়। একজন মানুষকে যত না ভালবাসা যাইতে পারে, রাধাপদ রাধারমণকে ততোধিক ভালবাসার চক্ষে দর্শন করে। তাহার নিকট রাধারমণ আর একটী পুত্তলী নহে, জীবন্ত ভালবাসাময় মূর্ত্তি। রাধাপদ রাধারমণের সঙ্গে কত কথা বলে, কখনও হাসে, কখনও বা

রাধারমণের উপর রাগ করে। আবার কখনও রাধারমণ রাগ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহার তোষামোদ করে। আহা! বালকের সরল প্রীতির বশে প্রেমময় সেই মূর্ত্তির ভিতর হইতে কথা বলেন। ক্রমশঃ বালক রাধারমণগত-প্রাণ হইল। স্বপ্নে পর্য্যন্ত রাধারমণের সহিত কথা বলে। বিনোদিনীর সম্বন্ধে বালিকা হেমলতার সেইরূপ অবস্থা। বাবার সহিত ঝগড়া করিয়া হেমলতা বিনোদিনীর নিমিত্ত ছোট ছোট গহনা গড়াইয়া লইয়াছে, ভাল কাপড় সংগ্রহ করিয়াছে। হেমলতা চুল বাঁধিয়া দিয়া, ভাল কাপড় পরাইয়া, অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া, গলায় ফুলের মালা দিয়া বিনোদিনীকে দাদার রাধারমণের নিকট লইয়া আইসে।

একদিন বৈকাল বেলা দুই ভাই ভগিনী খেলা করিতেছে; রাধাপদ বলিল "হেমলতা! তোমার বিনোদিনীর সহিত আমার রাধারমণের বিয়ে দিবে?"

হে। তোমার রাধারমণ কাল, আমার বিনোদিনী কেমন সুন্দর; কালর সঙ্গে সুন্দর মেয়ের কেমন করিয়া বিয়ে দিব?

রা। কালর সঙ্গে সুন্দর মেয়ের বিয়ে হ'লে ত ভাল দেখায়। আমার রাধারমণ সুন্দর কাল।

হে। সুন্দর কাল কি দাদা! সুন্দর বুঝি আবার কাল হয়?

রা। আমার রাধারমণের কেমন চুল, কেমন নাক, কেমন সুন্দর ঠোঁট দেখ দেখি?

হে। তা' হ'ক দাদা! তোমার রাধারমণ বড় কাল। আমি তোমার রাধারমণের সহিত আমার বিনোদিনীর বিয়ে দিব না।

রা। তবে কার সহিত তোমার বিনোদিনীর বিয়ে দিবে?

হে! আমি বিনোদিনীর বিয়ে দিব না।

রা। তবে আমার রাধারমণের কার সঙ্গে বিয়ে হবে?

হে। একটা কাল মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দাওগে।

রা। তুমি আমার রাধারমণকে কাল বলিও না।

হে। তোমার রাধারমণ ত কাল, তা' কাল বলিব না কেন ?

রা। আমার রাধারমণকে যে কাল বলে, সে কাল।

হে। কালকে কাল বলিলে ফরসা লোকও কাল হইবে, বাঃ! আচ্ছা, তোমার রাধারমণ সুন্দর। * * * দাদা! রাগ করিলে ?

রাধাপদ হেমলতার কথায় অভিমান করিয়া, তথা হইতে উঠিয়া গেল। হেমলতা জানিত না যে তাহার কথায় দাদার এরূপ কষ্ট এবং অভিমান হইবে। আর বলিয়া ফেলিয়াছে, এখন উপায় নাই। দাদা যখন মুখভার করিয়া উঠিয়া যাইল, তখন হেমলতার দাদাকে কিছু বলিতে সাহস হইল না।

সেদিন আর রাধাপদ হেমলতার সহিত কোন কথা বলিল না। এক-সঙ্গে খাইল, এক ঘরে শয়ন করিল, কিন্তু কোন কথার আলাপন হইল না। দাদার এইরূপ ব্যবহারে হেমলতা মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইল। তার পর দিবস এইভাবে গত হইল। দুই দিন গেল, হেমলতা আর দাদার সঙ্গে কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছে না, কিন্তু কি উপায়ে দাদার অভিমান ভঙ্গ করিবে তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পরদিন প্রাতে রাধাপদ আপন মনে রাধারমণকে কাপড় পরাইতেছে। হেমলতা বিনোদিনীর গলার একছড়া হার খুঁজিয়া পাইতেছে না; উৎকণ্ঠা সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা! আমার বিনোদিনীর গলার হার ?

রা। তা আমি কি জানি ?

হেমলতার প্রশ্নে রাধাপদ যে ভগিনীর সহিত কথা বলিবে না বলিয়া সংকল্প করিয়াছিল তাহা ভুল হইয়া গেল, উত্তর করিল "তা আমি কি জানি"।

হে। দাদা! সে হার কোথা গেল, বিনোদিনী এখন কি পরিবে?

রা। সুন্দর মেয়ের আর গহনা পরিয়া কাজ কি? সুন্দর বলিয়া বড় অহঙ্কার, হার কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে; যেমন দুষ্ট মেয়ে তেমনি হইয়াছে।

হে। তোমার রাধারমণের মত নয়, লোকের ঘরে ঘরে মাখন চুরি করিয়া খায়।

কিশোরী বাবুর বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, হেমলতা একদিন শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরির কথা শুনিয়াছিল।

রা। দেখ হেমলতা! সে দিন তুমি আমার রাধারমণকে কাল বলিয়াছিলে আজ আবার চোর বলিলে।

হে। (পরিহাসচ্ছলে) কই দেখি, হয়ত রাধারমণই আমার বিনোদিনীর হার চুরি করিয়াছে।

এই বলিয়া হেমলতা ঝটিতি, যেখানে রাধাপদ রাধারমণকে কাপড় পরাইতেছিল, তথায় চলিয়া আসিল, আসিয়াই রাধারমণের গলায় যে হার পরাণ রহিয়াছে, তাহা রাধারমণের গলার হার নহে, সম্ভবতঃ বিনোদিনীর, সন্দেহ করিয়া বলিল, "দেখি, রাধারমণের গলায় ও হার কার!" হার ধরিয়া দাদাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাদা! এ হার কার? রাধাপদ হেমলতার কথায় থতমত খাইয়া কহিল, "কই দেখি।" রাধাপদ একেবারে অবাক্, "এ হার কার তা আমি জানি না, হয়ত রাধারমণেরই হইবে"।

হে। এ হার রাধারমণের নয়, এ আমার বিনোদিনীর গলার হার, তোমার রাধারমণ চুরি করিয়া লইয়াছে।

রা। আমার রাধারমণ কখনও চোর নয়।

হে। তবে হার কোথায় পাইল?

রা। তোমার বিনোদিনী আমার রাধারমণের কাছে আসিয়া দিয়া গিয়াছে।

হে। আমার বিনোদিনী তোমার রাধারমণের সঙ্গে কথাও বলিতে যায় না। কাল লোকের সঙ্গে আবার লোকে কথা বলে।

রা। তুমি রাধারমণকে কাল বলিলে কি হইবে! তোমার বিনোদিনী রাধারমণের গলায় হার পরাইয়া দিয়া যায়।

হে। দাদা! এত মিথ্যা কথা বলিতে তোমায় কে শিখাইল? রাধারমণের সঙ্গে তুমি আর থাকিও না।

রা। আমার রাধারমণকে অমন করিয়া নিন্দা করিও না। বিনো-দিনীর জন্য রাধারমণকে একদিন তোমায় খোসামোদ করিতে হইবে।

হে। তোমার রাধারমণের জন্য বিনোদিনীর একদিন খোসামোদ করিতে হইবে।

রা। আচ্ছা দেখা যাবে।

হে। আমার বিনোদিনীর হার দাও।

রা। এ হার বিনোদিনী রাধারমণকে দিয়াছে, আবার লইবে? ছি!

হে। আচ্ছা, একছড়া হার বিনোদিনী রাধারমণকে দান করিল।

রা। এই তোমার বিনোদিনীর হার লও।

এই বলিয়া রাধাপদ যেমন হার খুলিতে যাইবে, দেখিল রাধারমণের মুখ অতীব বিষণ্ণ, যেন হার দিতে হইবে বলিয়া চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। হঠাৎ রাধাপদর হৃদয় এক অভিনব ভাবে পূর্ণ হইল, রাধাপদ কাঁদিয়া ফেলিল। হেমলতা দাদাকে কাঁদিতে দেখিয়া ছল ছল নয়নে দাদার হাত ধরিয়া সাদরে কহিল, "দাদা! কাঁদিও না, আমি তোমার রাধারমণের সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ দিব"। রাধারমণের মুখ প্রফুল্ল হইল, তদ্দর্শনে

রাধাপদর ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। রাধাপদ হাসিয়া কহিল, "সত্য করিয়া বল"। হেমলতা বলিল, "সত্য করিয়া বলিতেছি"।

সেই দিন হইতে রাধাপদ ও হেমলতা, দুই জনের বড়ই সদ্ভাব হইল। প্রত্যহ বিকাল হইতে দুইজনে রাধারমণ ও বিনোদিনীকে বেশ ভূষায় সুসজ্জিত করিয়া ক্রোড়ে লইয়া বাগানে বেড়াইতে যায়। বাগানে ভাই বোনে ফুল কুড়ায়, মালা গাঁথে। রাধারমণ ও বিনোদিনীকে একত্রে বসাইয়া দুই জনের গলায় মালা দেয়। একত্র অবস্থান কালে দুইজনের নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে দুইজনে মুগ্ধ হইয়া হাসে, কাঁদে, গান করে।

একদিন রাধাপদ হেমলতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হেমলতা! তুমি সেদিন কহিয়াছিলে, তোমার বিনোদিনীর সঙ্গে রাধারমণের বিয়ে দিবে?"

হে। কেন দাদা! আমিত বিনোদিনীকে তোমার রাধারমণকে দিয়াছি।

রা। এস আমরা ভালদিন দেখিয়া দুইজনের বিবাহ দিই।

হে। না দাদা! বিয়ে ভাল নয়।

রা। কেন?

হে। বিয়ে হইলে সকলে জানিতে পারিবে যে।

রা। জানিলেই বা।

হে। না দাদা! আমাদের বিনোদিনী রাধারমণের ভালবাসা জানিতে দেওয়া হইবে না।

রা। আচ্ছা! হেমলতা! তোমার বিনোদিনী আমার রাধারমণকে ভালবাসে?

হে। হাঁ দাদা! বড় ভালবাসে। তোমার রাধারমণ আমার বিনোদিনীকে ভালবাসে?

রা। রাধারমণ বিনোদিনীকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারে না।

হে। তবে আবার বিয়ের কথা বল কেন? ভালবাসার চেয়ে কি বিয়ে বড়?

রা। তা নয়, কিন্তু বিয়ে ত লোকের হয়।

হে। তা' হোক। আমরা বিনোদিনী-রাধারমণের বিয়ে দিব না। এমনি দুইজনকে বাগানে আনিয়া একত্র বসাইব। দুইজনের গলায় মালা পরাইয়া দিব। দুইজনকে খাওয়াইব। দুইজনের সম্মুখে আমরা গান করিব,—নাচিব।

রাধাপদ হেমলতার এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। কোন্ সৌভাগ্যবলে বালক বালিকা এই অল্প বয়সে এমন বিশুদ্ধ প্রেমের খেলা শিখিল, তাহা কে বলিতে পারে?

দশম পরিচ্ছেদ।

মহাপুরুষ—কিশোরীবাবুর আলয়।

এই সংসারে কেমনে সুখে থাকা যায়? এই প্রশ্ন প্রাণী মাত্রেরই আলোচনার বিষয়। প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইয়া তদনুযায়ী জীবন-পথে চলিতে পারিলে আর দুঃখের কারণ থাকে না। এই সংসারে কি উপায়ে সুখী হওয়া যায়, এতদ্বিষয়ে কিশোরী বাবুর জীবন শিক্ষাপ্রদ। আত্মসুখকামী ব্যক্তি কখনও সংসারে সুখী হয় না। সুখের কারণ ভাল-বাসা। ভালবাসার লক্ষণ একজনের সুখবিধান করিয়া সুখী হওয়া। আত্মসুখ বিধান করিবার জন্য যে মনের অভিপ্রায়, তাহার নাম কাম—এই নিকৃষ্ট বৃত্তিপরতন্ত্র হইয়া জীব নিয়ত বিষম দুঃখজালে জড়িত হইতেছে। নিরুপাধি ভালবাসা বলিয়া একটী বৃত্তি আছে, স্বীকার করিলে, সেই ভাল-বাসার দুইটী পাত্র স্বীকার করিতে হয়—একটী বিষয় আর একটী আশ্রয়। এই ভালবাসার বিষয় একজন ব্যতীত দুইজন হইতে পারে না, তাহা ভালবাসা তত্বাভিজ্ঞ জন মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীভগবান সেই অকৈতব বিমল প্রেমের একমাত্র বিষয় এবং অনন্ত জীব সেই প্রেমের আশ্রয়। জীব এই বিশুদ্ধ প্রেম প্রয়োজনে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় পূর্ব্বক তাঁহার সেবা প্রাপ্ত হইলে সুখের অবধি লাভ করে।

এই দেহে কিরূপে ভগবৎ সেবা লাভ হয়? শ্রীগুরু, ভক্ত, শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীভগবানের স্বরূপ। অতএব ইঁহাদিগের (মধ্যে কোন একটীর) সেবা করিলে শ্রীভগবানের সেবা করা হয়। এতদ্বিষয়ে আর কোন পরপক্ষ উঠাইবার আবশ্যক নাই। শ্রীভগবান সম্বন্ধ এবং প্রেম

প্রয়োজন নিরূপিত হইলে প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রেমাধীন জনের চেষ্টা ও ক্রিয়ানুযায়ী যে আমাদের সাধন-প্রকরণ হইবে, এতদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুদেবে রতি, ভক্তের কৃপা সঞ্চার, ভক্তিশাস্ত্র-বাক্যে শ্রদ্ধা, শ্রীনাম গ্রহণে আসক্তি, শ্রীবিগ্রহে নিত্যত্ব স্থাপন হইলে সাধক সেবা প্রাপ্তি বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করিলেন। অতএব এই সংসারে অবস্থান করিয়া আমরা সেবা লাভে সুখী হইব না কেন?

এবম্বিধ আচরণ সহকারে কিশোরী বাবু শ্রীভগবতানুশীলনে পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহার চিত্ত সদাই নিরহঙ্কার, মন মহা-পুরুষের কৃপানুভবে সাহসী, হৃদয় সেবালোলুপ। কিন্তু শ্রীশ্রীরাধারমণের উপস্থিত সেবা পরিপাটিতে তিনি তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। কিরূপ সুব্যবস্থা হইলে শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা বিষয়ে পরমোৎকর্ষ অনুভব হয়, এতদ্‌সম্বন্ধে তিনি সতত হৃদয়ে শ্রীগুরুদেবের পরামর্শ প্রার্থনা করেন। এই নিমিত্ত কয় দিন হইতে প্রভু দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল।

একদিন বেলা এগারটার সময় মহাপুরুষ একটী সুন্দর বালক সঙ্গে কিশোরীবাবুর আলয়ে উপনীত হইলেন। "একজন সাধু পুরুষ আসিয়া-ছেন" সংবাদ পাইবামাত্র কিশোরীবাবুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি ধমনীতে ধমনীতে আনন্দের বন্যা বহিয়া গেল। অতি যত্নে আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া মহাপুরুষের—যে মূর্ত্তি তিনি নিরন্তর ভাবনা করেন—দর্শন লাভ করিবা মাত্র নিজ মস্তক তদীয় শ্রীচরণ-সংলগ্ন করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"শ্রীরাধারমণে মতি হউক"। শিষ্যবৎসল-প্রভু শিষ্যকে প্রেমালিঙ্গনচ্ছলে আনন্দিত করিয়া, অতি মধুর কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুশলে আছ?"

কি। আপনার কৃপায়।

ম। শ্রীরাধারমণের কৃপায়। চল দর্শন করিতে যাই।

কিশোরী বাবু রাধাপদকে ডাকিয়া কহিলেন,—"দণ্ডবৎ কর"। মহা-পুরুষ বালককে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"শ্রীরাধারমণে মতি হউক"। রাধা-পদ জলপাত্র আনিলে কিশোরী বাবু প্রভুর চরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পাদোদক রক্ষা করিলেন। তদনন্তর মহাপুরুষ সকলের সহিত শ্রীশ্রীরাধারমণ দর্শনে গমন করিলেন। তখন ভোগ আরাত্রিক হইতেছে। আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে, সকলে দণ্ডবৎ করিলে, ঠাকুরের শয়ন দেওয়া হইল। ইতঃপূর্ব্বে বাটীর মধ্যে সংবাদ গিয়াছিল, তথায় কিশোরীবাবুর সহিত মহাপুরুষের আগমন হইবামাত্র সকলে আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণাগ্রে প্রণাম করিলেন। কিশোরী বাবু নিজ প্রকোষ্ঠে মহাপুরুষকে লইয়া গেলেন। মহাপুরুষের পশ্চাদ্‌গামী বালকের সুন্দর এবং কমনীয় মূর্ত্তি দর্শনে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ে প্রভূত স্নেহ সঞ্চার হইল। কিশোরী বাবুর জননী ব্যস্ত ভাবে আসিয়া মহাপুরুষকে বীজন করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ম। মা! এই বালককে কিছু খাইতে দাও। আমিও ক্ষুধান্বিত।

কিশোরী বাবু ভগিনীকে প্রসাদ আনয়ন করিতে বলিয়া ব্রজ সুন্দরীকে আসন দিতে ইঙ্গিত করিলেন। প্রসাদ দ্রব্যাদি আসন অগ্রে রক্ষিত হইলে কিশোরী বাবুর জননী মহাপুরুষকে প্রসাদ পাইতে অনুনয় করিবা-মাত্র তিনি মহাপ্রসাদ অগ্রে প্রণাম পুরঃসর আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আহার করিতে করিতে সেই বালককে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কিছু অন্ন ব্যঞ্জন একত্র মাখিয়া তাহাকে খাইতে দিলেন। বালক তখন কিশোরী বাবুর ভগিনী প্রদত্ত সন্দেশ আহার সমাপ্ত করিয়া মহাপুরুষের অধরামৃত গ্রহণ পূর্ব্বক খাইতে আরম্ভ করিল। তাহা শেষ হইলে মহাপুরুষ বালককে পুনরায় সেইরূপ করিয়া আর এক মণ্ড দিলেন, এইরূপে তাঁহার সঙ্গে খাইতে খাইতে বালকের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল।

ভোজন সমাপ্ত হইলে মহাপুরুষ আচমন পূর্ব্বক মুখশুদ্ধি গ্রহণ করিলেন। বালককে কিশোরী বাবুর ভগিনী অতি যত্ন সহকারে আচমন করাইয়া দিলেন। বালকটীকে দেখা অবধি তাঁহার হৃদয়ে অভিনব বাৎসল্য-রসের উদয় হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে, বালকটীকে তিনি ক্রোড়ে করিয়া লালন করেন। কিন্তু সহসা তিনি আপন হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। সকলকে প্রসাদ পাইতে আদেশ করিয়া, মহাপুরুষ বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে আপাদ মস্তক উত্তরীয় দ্বারা আবরণ পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিলেন। ব্রজসুন্দরী বাতাস করিতে লাগিলেন।

প্রভুর আজ্ঞাক্রমে কিশোরী বাবু অবশিষ্ট প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর সকলের আহারাদি সমাপন হইল। আজ মহাপুরুষের দর্শনে কিশোরী বাবুর বাটীর সকলেই উৎফুল্ল হৃদয়, সকলেরই তাঁহাকে অতি আত্মীয় বলিয়া অনুভব হইতেছে। মহাপুরুষের দর্শন অপরূপ। বদন প্রফুল্ল কমলের ন্যায়, তাহাতে লোচনদ্বয় প্রেমে ঢল ঢল করিতেছে। সুপীন বক্ষঃস্থল। আজানুলম্বিত বাহু। উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন কি অপরূপ বস্তু দিয়া বিধাতা কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছে। সুললিত অঙ্গ-মাধুর্য্য, দর্শনে প্রাণ কাড়িয়া লয়, অনুভব হয়, কোন অসাধারণ দেবতা সৌভাগ্যবলে অগ্য নয়ন-গোচর হইলেন।

অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকার সময় মহাপুরুষ উঠিয়া বসিলেন। বালকের অসাক্ষাতে কিশোরী বাবুকে কহিলেন, "এই বালককে তুমি অতি যত্নের সহিত পালন কর, ইহার দ্বারা শ্রীভগবান সংসারের অনেক মঙ্গল সাধন করিবেন। তোমার ভগিনীর ইহার প্রতি স্বাভাবিক পুত্র ভাব আছে, তাঁহার তত্ত্বাবধানে ইহাকে রাখিবে। আর এক বৎসর পরে ইহার উপনয়ন সংস্কার দিবে। কায়মনোবাক্যে শ্রীরাধারমণের সেবা কর।

রাধাপদ শ্রীরাধারমণের ভাবী সেবক, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিও। হেমলতা কোথায়? তাহাকে দেখিতে পাইনা কেন?"

হেমলতা দরজার আড়ালে থাকিয়া মহাপুরুষকে দর্শন করিতেছে, দাদার মত নিকটে যাইতে খুব ইচ্ছা হইলেও স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ সেইরূপ করিতে পারিতেছে না। মহাপুরুষ হেমলতার উদ্দেশ করিবা মাত্র রাধাপদ তাহাকে ধরিয়া আনিল। মহাপুরুষ হেমলতাকে সঙ্কুচিত ভাবে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, "তুমিত আমার দিদি হও, নিকটে আসিতে লজ্জা পাইতেছ কেন"? অবনতমুখী হেমলতাকে তিনি ক্রোড়ে লইলেন।

ম। হেমলতা! তুমি আমার কে হও?

এবার হেমলতা একটু হাসিল!

ম। বল হেমলতা! তুমি আমার কে হও?

হে। আপনার ছোট বোন।

ম। না, তুমি আমার দিদি হও।

হে। আপনি আমার দাদা।

মহাপুরুষ অতি আনন্দের সহিত হেমলতার মুখ চুম্বন করিলেন। আর কিশোরী বাবুকে কহিলেন, "শ্রীরাধারমণের সহিত হেমলতার বিবাহ দিও, তাহার যোগ্য অন্য বর আর নাই"।

ম। হেমলতা! তুমি কা'কে বিয়ে কর্‌বে?

হে। (ধীরে ধীরে) বিয়ে ভাল নয়।

এই কথায় রাধাপদ হেমলতার সে দিনকার কথা মনে পড়িয়া ভাবিল, হেমলতা বড় দুষ্টু, আমাদের খেলার কথা প্রকাশ করিতেছে।

ম। কেন?

হে। আপনি জানেন।

ম। আমি জানিলে কি জিজ্ঞাসা করি।

হে। আপনি জানেন না?

ম। আচ্ছা! তুমি বল না কেন?

হেমলতা নীরব থাকিয়া মহাপুরুষের দিকে একবার চাহিল, তাহাতেই তিনি উত্তর পাইলেন; আর কোন কথা হেমলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না।

হেমলতার সহিত মহাপুরুষের এত কথোপকথন, সকলে ভাল বুঝিতে পারিলেন না। কেবল রাধাপদ হেমলতার অন্তর জানে বলিয়া কিছু বুঝিতে পারিল। পর দিবস ব্রজ সুন্দরী মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বিদায় লইবার পূর্ব্বে মহাপুরুষ নির্জ্জনে কিশোরী বাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "হেমলতার সহিত তোমার রাধারমণের কোন ঘটনা হইবে, তাহাতে মনে কিছু অন্যথা ভাবিও না"। এতদ্‌শ্রবণে কিশোরী বাবু মহাপুরুষের বাক্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না।

বিদায় কালে মহাপুরুষের চরণ ধরিয়া বালক অনেক কাঁদিল। মহাপুরুষ কহিলেন, "বাবা! তোমার কোন ভয় নাই, সংসার তোমায় বাঁধিতে পারিবে না"। বালক সম্বন্ধে এ স্থলে সবিশেষ পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক নাই। সংক্ষেপে পরিচয় এই, বালক বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। বিমাতার পীড়নে মনের দুঃখে গৃহ হইতে বাহির হইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কাঁদিতেছিল। শ্রীভগবতেচ্ছায় মহাপুরুষ আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। অল্পবয়স্ক সুকুমার বালক এই জনশূন্য স্থানে কি দুঃখে কাঁদিতেছে, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট হইতে অধিকতর বেগে অশ্রু বর্ষণ ব্যতীত আর কোন উত্তর পাইলেন না। হৃদয়ের আবেগে বালক মহাপুরুষের চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। তিনি বালকের আকৃতি

দর্শনে তাহার ভবিষ্যৎ অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত যাইবে" ?

বা। যাইব।

প্রীতিময়-হৃদয়-সম্পন্ন জনের অনুগামী হইতে কাহারও মনে কোন বিচারের উদয় হইতে পারে না। বালক অবিচারিত চিত্তে মহাপুরুষের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইল।

ম। তোমার নাম কি ?

বা। রমণী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ম। ক্ষুধা পাইয়াছে ?

বা। না।

ম। তবে আমার সঙ্গে আইস।

বালককে সঙ্গে লইয়া মহাপুরুষ কিশোরী বাবুর আলয়ে আসিলেন। তাহার পর যে ঘটনা হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন।

সূর্য্যদেবের অস্তগমন করিতে আরও কিছু বিলম্ব আছে। কিশোরী বাবু মহাপুরুষকে উদ্যান-গৃহে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। মহাপুরুষের অল্পক্ষণ মাত্র সহবাসে কিশোরী বাবুর হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। মহাপুরুষের সদুপদেশ বাক্য যেন কোন সুবিমল সৌন্দর্য্যময় প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া অমৃত প্রস্রবণ সদৃশ তাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ, মন, দেহ স্নিগ্ধ করিতেছে। অবশেষে কিশোরী বাবু শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবা বিষয়ে নিজমনোভাব শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিলেন। তদ্‌শ্রবণে মহাপুরুষ কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিগ্রহ অভেদ, ইনিই অভীষ্ট বস্তু হইয়া তোমার সহিত কথা বলিবেন, সেবাগ্রহণ করিবেন, তোমার মনোভিলাষ নিরন্তর পূর্ণ করিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিবে। এতদ্বিষয়ে মনের ক্রটী থাকিতে শ্রীবিগ্রহ সেবা সুখ অনুভূত হইতে পারে না।

বৈষ্ণব-চরণে অনন্যশরণ গ্রহণ, সর্ব্বজীবে সম্মানদান এবং সর্ব্বদা শ্রীনাম স্মরণ কর, অচিরে সেবা পরিপাটী সম্বন্ধে সকল বিষয় তোমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি পাইবে এবং সর্ব্বাপরাধ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া নিরন্তর সেবামৃত সাগরে ডুবিয়া থাকিবে। তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমি প্রভুর নিকট সর্ব্বদা জানাই-তেছি।

বালক কিশোরী বাবুর গৃহে রহিল। কিশোরী বাবুর গৃহে কিছুরই অভাব নাই। কিশোরী বাবুর ভগিনী বালককে পুত্রবৎ স্নেহ এবং লালন করিতে লাগিলেন। রাধাপদর শিক্ষক বালককে কিশোরী বাবুর আজ্ঞা-ক্রমে অতি যত্ন সহকারে পাঠ শিক্ষা দেন। অপিচ তাহার রাধাপদ ও হেমলতার সহিত খেলা করিবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু এত সুখের মধ্যেও রমণীমোহন অতি চিন্তাশীল। রমণী কাহারও সহিত মিশিতে ভালবাসে না। বাটীর সকলেই রমণীকে ভালবাসে। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি, বালককে কিছুতেই কেহ উল্লাসযুক্ত করিতে পারিতেছেন না। বালক সর্ব্বদা মহাপুরুষের প্রেমময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক গম্ভীর-চিত্ত। সর্ব্বদা চিন্তা করে, কেন আমি এখানে রহিলাম, কেন তাঁহার সঙ্গে যাইলাম না?

এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত, ক্রমে রমণী মোহন প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। কিশোরী বাবুর আদেশক্রমে ভৃত্যেরা সকলে রমণী মোহনকে রাধাপদর ন্যায় সম্মান করে। একদিবস অপরাহ্ন সময়ে রমণী নিজ প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে একখানি চেয়ারোপরি উপবিষ্ট আছে, এমন সময় রাধাপদ আসিয়া কহিল, "রমণী দাদা!"—রমণী রাধাপদ হইতে কয়েক মাসের বড় হইবে—তোমায় আমাদের সঙ্গে কত দিন বেড়াইতে যাইতে বলিয়াছি, তুমি যাও নাই, আজ আমি তোমায় ধরিয়া লইয়া যাইব; বাবা তোমায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

র। ভাই! আমায় মাপ কর, তোমরা বেড়াইতে বাহির হইলে, আমিও একটু হাঁটিয়া আসিব।

রা। দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, আজ আমার কথা শুনিতে হইবে।

রমণীর মনের ভাব বৈরাগ্য-ময়। সর্ব্বদা আপনাকে দীন মনে করিয়া সকলের সঙ্গে ব্যবহার করে। নির্জ্জনে একা একা বেড়াইতে ভালবাসে। মহাপুরুষ উপদেশ করিয়াছেন, "বাবা! ভগবান ব্যতীত আর আমাদের কেহ আত্মীয় নাই"। একা নির্জ্জন স্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে রমণী শ্রীভগবানের উদ্দেশে কাঁদে, আর প্রার্থনা করে, ঠাকুর! কবে তোমায় আপন ভাবিতে শিখিব?

র। আচ্ছা রাধাপদ! আমায় লইলে তোমার কি লাভ হইবে, কেন এত মিনতি করিতেছ?

রা। তোমার অমন ভাব আমায় ভাল লাগে না। তুমি আমাদের সঙ্গে হাস না, খেলা কর না।

রমণী অতি বাল্যকাল হইতে চিত্তের সুখ কাহাকে বলে জানে না। কবে সে খেলা করিয়াছে, তাহার মনে নাই। বিমাতার উৎপীড়নে রমণী গৃহে সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ থাকিত। সংসারের সেই বিভীষিকাময় চিত্র রমণীর হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাধাপদর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে রমণীর হৃদয় হইতে বিমর্ষভাব দূরীভূত হইল।

র। আচ্ছা ভাই! তুমি যদি একান্ত না ছাড়, তবে চল।

রমণীর মুখে এই কথা শুনিয়া রাধাপদ ভারী খুসী হইল। নিজে উদ্যোগ করিয়া রমণীর কাপড় জামা গোছাইয়া দিল। রাধাপদর আগ্রহে রমণী আজ অকপট ভালবাসার অনুরোধ এড়াইতে পারিল না। সুসজ্জিত হইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। কিশোরী বাবু অপরাহ্ন সময়ে পুত্র কন্যা

সঙ্গে অশ্বযানে ভ্রমণে বহির্গত হন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে গাড়ি হইতে নামিয়া সকলে পদব্রজে বেড়াইতে থাকেন। রমণী-দাদা সঙ্গে থাকার কারণে, রাধাপদ এবং হেমলতার চিত্ত উল্লাস যুক্ত। ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয় প্রীতিপূর্ণ এবং অতি কোমল। হেমলতা কহিল, "রমণী দাদা! তুমি আমাদের সঙ্গে রোজ বেড়াতে এস না কেন?" রমণী হেমলতার কথায় আর কোন উত্তর করিতে পারিল না। রমণী কি কারণে গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, বালক বালিকা তাহা কি করিয়া বুঝিবে?

একদিন কিশোরী বাবু তিরস্কারচ্ছলে পত্নীকে কহিলেন, "রমণীকে তোমরা আদর কর না, তাহাকে সর্ব্বদা বিষণ্ণ দেখা যায়"।

ব্র। তা তুমি কেন আদর কর না; আমরা না হয় আদর জানি না বা করি না।

কি। না আমি বলিতেছি, প্রভু তোমাদের এমন একটী সুন্দর বস্তু দিয়া গিয়াছেন, তোমরা তাহাকে যেন অযত্ন না কর।

ব্র। আদর জানি না, অনাদর করিতেও শিখি নাই। কিরূপ যত্ন করিতে হইবে, তুমি বলিয়া দাও, সেই মত করিব।

কিশোরী বাবু জানেন পরিবারস্থ সকলেই রমণীকে ভালবাসে, তথাপি স্ত্রীর নিকট কাহারও পক্ষ হইতে এতদ্বিষয়ে কোন ত্রুটী হয় কি না, জানিবার অভিপ্রায়ে ভৎর্সনাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু পত্নীর উত্তরে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে ব্রজসুন্দরী কহিলেন, রমণীর স্বভাব ঐ প্রকার, সে সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন। তোমার মুখেই ত শুনিয়াছি, মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, তাহার দ্বারা সংসারের অনেক মঙ্গল সাধিত হইবে। 'চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বাভাবিক গম্ভীর হয়। স্ত্রীর কথায় রমণী-বিষয়ে কিশোরী বাবু আশ্বস্ত হইলেন।

রমণীর বয়স এই তের বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। মেধাবী বালক

অতি অল্প কালের মধ্যে, অনেক অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়াছে। রাধাপদ এবং রমণী সতীর্থ, ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তক পাঠ করে। একদিন বেলা নয়টা, রমণী আপন কক্ষা মধ্যে পাঠ সমাপন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছে। এমন সময় সহসা হেমলতা দাদার প্রকোষ্ঠ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল, কহিল, "দাদা! আমি রাধাপদ-দাদার সহিত খেলা করি, তুমি কেন আমাদের সঙ্গে খেলা কর না?" রমণীর খেলিবার বয়স হইলেও, বয়স্ক হইলে যেমন খেলা করিতে আর ভাল লাগে না, তাহার চিত্ত তদ্‌ভাবাপন্ন। রমণী উত্তর করিল, "খেলা, হেমলতা! আমায় ভাল লাগে না"। হেমলতার নিকট রমণী মনের কথা গোপন করিতে পারিল না। অথচ ইচ্ছা করিলেই রমণী হেমলতাকে যথার্থ উত্তর না দিয়া অন্য কথায় ভুলাইতে পারিত। কিন্তু ভালবাসাময় হৃদয়ের নিকট কোন কথা অপ্রকাশিত রাখা যায় না। অপ্রকাশিত রাখিবার চেষ্টাও বৃথা। তাই রমণী বলিয়া ফেলিল, "খেলা ভাল লাগে না"।

হে। কেন ভাল লাগে না?

র। তোমায় কেন খেলিতে ভাল লাগে?

হে। তাইত দাদা! আমি বলিতে পারি না।

র। কেন খেলা ভাল লাগে না, আমিও জানিনা।

রমণী কি সত্য কথা বলিল? না, এবার সত্য কথা বলিলে, হেমলতা মনে দুঃখ পাইবে। কিন্তু হেমলতা ছাড়িল না, কহিল, "না দাদা! তুমি গোপন করিতেছ। তুমি জান, কেন খেলা ভাল লাগে না। আমি জানি না বলিয়া, তুমিও জাননা, তা' কি হয়? বল না দাদা! কেন খেলা ভাল লাগে না? তোমার পায়ে পড়ি।"

সরলা বালিকার আত্যন্তিক সহানুভূতি দর্শনে রমণীর প্রাণ গলিয়া গেল, উত্তর করিল, সে কথা এখন বলিব না, আর একদিন বলিব।

হে। কবে বলিবে দাদা ?

র। একদিন বলিব।

হেমলতা এ বিষয় জানিবার জন্য দাদাকে এখন আর অধিক পীড়াপীড়ি করিল না।

হে। চল দাদা! আমরা পুকুরে স্নান করিতে যাই।

রমণী বড় সঙ্কটে পড়িল ; যেমন অধিক কথা বলিতে ভালবাসে না, হেমলতা তেমনি কথা কহাইতে ছাড়িবে না। অথচ হেমলতার কথায় এবং ব্যবহারে রমণী ক্রমেই আকৃষ্ট হইতেছে।

র। আমি কিছু পরে স্নান করিব।

হে। না দাদা! এখনই চল, তুমি একটাও কথা শুন না।

রমণী আর হেমলতার কথায় আপত্তি করিতে পারিল না, তাহার সঙ্গে স্নান করিতে যাইল।

রাধাপদ ও হেমলতা দুই ভাই বোনে এইরূপে রমণী দাদাকে আর একা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে দিত না। যখনই দাদার মুখ বিমর্ষ দেখিত অমনি কত রকম কথা, প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া উত্তরে রমণীকে প্রফুল্ল করিত। রাধাপদ ও হেমলতার সঙ্গ প্রভাবে ক্রমশঃ রমণীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

রমণীর এই ভাবান্তর দর্শনে কিশোরী বাবু এবং বিমলার আনন্দের সীমা রহিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

হেমলতার পাঠ-গ্রহণ।

রমণী গৃহে থাকিতে কখনও কাহারও স্নেহ পায় নাই। বালকের কোমল অন্তঃকরণ ক্রমে কঠিন হইয়া যাইতে লাগিল। রমণী ভাবিত, এ সংসার আমার পক্ষে বিষময়; পিতা মাতার ভালবাসা হইতে যে বঞ্চিত, তাহার অদৃষ্টে বিধাতা কখনও সুখ লিখেন নাই; তবে আর আমার বাঁচিয়া ফল কি? বালক কখনও মনে করিত, বিষ খাইয়া মরি; কখনও ভাবিত, বাটী হইতে চলিয়া যাই। কিন্তু দশ এগার বৎসরের বালক সংসারের কি জানে,—কি চিনে? কেবল নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া কল্পনা করিত, আর আপনার অদৃষ্ট-কথা স্মরণ করিয়া নয়নজলে ভাসিত। রমণীর বিমাতার পুত্র কন্যা ছিল। কিন্তু হায়! এই সংসার কি স্বার্থভাব পরিপূর্ণ! সতীন-পুত্র বলিয়া বিমাতা রমণীর উপর অসহ্য উৎপীড়ন করিত। আহা! বালক আর কত সহিবে? পিতা, পত্নীর বাধ্য হইয়া রমণীকে অযথা তাড়না এবং ভর্ৎসনা করিতেন। আত্মসুখ! তোমার সীমা কোথায়? আত্মসুখ-বশবর্ত্তী হইয়া পিতা সন্তানের উপর অত্যাচার করেন, ইহা অপেক্ষা আর জীবের ঘৃণিত অবস্থা কি হইতে পারে?

এখনও পর্য্যন্ত রমণীর হৃদয় কোমলতা লাভ করিতে পারিতেছে না। বিমলার অতুলনীয় স্নেহ, রাধাপদ ও হেমলতার অকপট ভালবাসা পাইয়াও রমণীর হৃদয়ের অসুস্থতা সারিতেছে না। মহাপুরুষের কৃপা এবং রাধাপদ ও হেমলতার সঙ্গ না হইলে রমণীর ভবিষ্যত জীবন কিরূপ ঘোর অন্ধকারময় হইত, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? যাহা হউক রমণী

আর পূর্ব্বের মত ম্রিয়মাণ থাকে না; রাধাপদ ও হেমলতার সঙ্গে তাহাদের মনের মত হইয়া চলে ও বেড়ায়। একদিন বৈকাল বেলা তিনজনে বাগানে বেড়াইতে গিয়াছে। বেড়াইতে বেড়াইতে হেমলতা কহিল, রমণী-দাদা! তুমি আমাদের মধ্যে কাহাকে বেশী ভালবাস?

র। আমি তোমাদের মধ্যে কাহাকেও ভালবাসি না।

হে। না দাদা! ভালবাস না, তা'কি হয়?

র। আমি ভালবাসা কারে বলে, তাই জানিনা, হেমলতা!

হে। তুমি ভালবাসা জাননা দাদা?

র। না হেমলতা! আমি কখনও কাহাকে ভালবাসি নাই, আমাকেও কখনও কেহ ভালবাসে নাই।

হে। কেন দাদা! আমি ত তোমায় ভালবাসি।

রমণী এইবার হেমলতার কথায় কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, তা' হবে। আমি যখন ভালবাসা কারে বলে জানিনা, তখন কেমন করিয়া, আমার প্রতি তোমার ভালবাসা বুঝিব? আচ্ছা, ভালবাসা কারে বলে?

হে। ভালবাসা কারে বলে, তাইত দাদা! ভালবাসা কারে বলে কেমন করিয়া বুঝাইব? ভাল লাগিলেই ভালবাসা হয়। দাদাকে, তোমাকে ভাল লাগে, তাই ভালবাসি। আমাদের কি দাদা! তোমার ভাল লাগে না?

র। তোমাদের ভাল লাগে, কিন্তু আমি ত ভালবাসিতে পারি না। আচ্ছা রাধাপদ! আমার হৃদয় কি বিভিন্ন উপকরণে গড়া?

রা। না দাদা! তুমি ভালবাস, বুঝিতে পার না।

র। তা কেমন করিয়া হয়, আমি বুঝিতে পারিব না কেন?

রাধাপদ ও হেমলতার অন্তঃকরণ প্রীতি-পরিপূর্ণ। এখন একজনের বয়স ১৫ বৎসর, আর একজনের বয়স ১২ বৎসর। সংসার দৃষ্টান্ত হইতে

ভ্রাতা ভগিনী হিংসা-দ্বেষ কাহাকে বলে জানে না। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রমণীর কোমল হৃদয় পিতামাতার অপ্রীতি ব্যবহারে নীরস হইয়া গিয়াছে। রমণীর হৃদয়বর্ত্তী স্বাভাবিক ভালবাসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহা এত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, যে এ পর্য্যন্ত কখনও ভালবাসার অনুভবে রমণী চিত্তে সুখ পায় নাই। সম্প্রতি রাধাপদ এবং হেমলতার প্রতি রমণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং ক্রমে তাহার অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ প্রীতির স্রোত বহিবে, তাঁহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রীতি মানব মনের প্রাণ। শুদ্ধ প্রীতির অভাবে মানব-মন বিকার-গ্রস্ত হয়। রমণী হেমলতা এবং রাধাপদর মধ্যে যে ভালবাসার কথোপ-কথন হইতেছে, সে ভালবাসা সংসারের কুটিলতা দেখে নাই, সে ভালবাসা অপ্রাকৃত চিন্ময় তত্ত্ব নিরূপণ করিতেও সমর্থ হয় নাই। আত্মসুখময়ী বৃত্তি-চরিতার্থতায় অথবা অপচয় বিহীন নিরুপাধি বিশুদ্ধ প্রেমাবস্থায় এই ভালবাসার পর্য্যবসান হইতে পারে। আত্মসুখ সম্বন্ধযুক্ত যে ভালবাসা তাহা ভালবাসা নহে, অতি নিকৃষ্ট বৃত্তি।

তখন হেমলতা রাধাপদর দিকে চাহিয়া কহিল, দাদা! ভালবাসা কি শিখিতে হয়?

রা। যাহারা পরস্পর ভালবাসে, পরস্পর পরস্পরের ভালবাসার শিক্ষক।

হে। তা' হ'লে দাদা! তুমি আমার ভালবাসার শিক্ষক।

রা। সেইরূপ আমার সম্বন্ধে তুমিও হেমলতা! তোমায় দেখিবামাত্র আমার হৃদয়ে কত নূতন নূতন ভাবের সঞ্চার হয়। তোমার সহিত কথা বলিতে গিয়া কত নূতন নূতন কথা মনে আসে, কখনও বলা যায়, কখনও বা বলা যায় না।

হে। দাদা! তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমি মনে করিয়াছিলাম, ভালবাসা আপনিই হয়, ভালবাসা মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা। যেমন ক্ষুধা লাগে,

তেমনি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। দেহের নিমিত্ত আহারের প্রয়োজন, মনের পুষ্টির নিমিত্ত ভালবাসার প্রয়োজন। ক্ষুধা বোধ না হইলে শরীরের কোন অসুখ হইয়াছে বুঝা যায়, হৃদয়ে ভালবাসা না থাকিলে তাহার কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে।

পাঠকগণ! হেমলতা দ্বাদশ বৎসরের বালিকা! ভালবাসা সম্বন্ধে কেমন সুন্দর সিদ্ধান্ত করিল। নির্ম্মল হৃদয় স্বচ্ছ দর্পণ সদৃশ, তাহার অগ্রে যাহাই স্থাপন করা যায়, তাহা অতি পরিষ্কার প্রতিফলিত হয়। রমণীর অবস্থাসম্বন্ধে হেমলতা সামান্য প্রণিধান করিবামাত্রই, দাদার চিত্তের অবস্থা বুঝিয়া ফেলিল। এখানে হেমলতার কথাই ঠিক, কিন্তু রাধাপদর কথা মিথ্যা নহে। রাধাপদ ও রমণী হেমলতার এই কথায় পরম আহ্লাদযুক্ত হইল। রাধাপদ বলিয়া উঠিল, হেমলতা! তোমার কথাই ঠিক।

হেমলতার কথায় রমণী প্রকৃতই আপনার মনের অবস্থা নিরূপণ করিবার উদ্দেশ পাইল। রমণী একটু হাসিয়া কহিল, আচ্ছা হেমলতা! তুমি আমার মনের চিকিৎসক হইয়া ঔষধ দাও দেখি। রমণী দাদার কথায় হেমলতা লজ্জিত ভাবে কহিল, কি জানি দাদা! আমি কি বলিতে কি বলিয়াছি।

পাঠকগণ! ভ্রাতা, ভগিনী এবং রমণী, এই তিন জনের মধ্যে যে ভালবাসার আলাপন শুনিলেন, তাহার সম্বন্ধে আপনাদের মনে কি কিছু অসম্বন্ধ বোধ হইল? রাধাপদ ও হেমলতা পরস্পর পরস্পরকে দেখিলে তাহাদের মনে কি ভালবাসার তরঙ্গ উঠে, তাহা অব্যক্ত। ভ্রাতা ভগিনীর ভিতর এই প্রীতি বিষয়ক আলোচনা রমণী ও রাধাপদর ভবিষ্যৎ জীবনে আলোক স্বরূপ হইয়া তাহাদিগের উভয়কে পথ প্রদর্শন করিবে।

আরও এক বৎসর অতীত হইল। রমণী ও রাধাপদ এইবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। শিক্ষকদ্বয় অতি যত্নে দুইজনকে পড়াইয়া যান।

উভয়ে সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে শিক্ষকগণ পুরস্কৃত হইবেন; কিশোরী বাবু ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। হেমলতার বয়স এই ত্রয়োদশ বৎসর। এখন হেমলতা স্বাভাবিক গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু রাধাপদ বা রমণীর সহিত হেমলতা সেইরূপ সরল ভাবে ভালবাসার আলোচনা করে। হেমলতার এখন আর শকুন্তলা বা মাইকেলের গ্রন্থাবলী দেখিতে ইচ্ছা হয় না। শ্রীচৈতন্য ভাগবত শেষ করিয়া হেমলতা এখন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিতেছে। কিশোরী বাবু হেমলতার পাঠে অভিনিবেশ দর্শন করিয়া আপনি কন্যাকে গ্রন্থ পাঠ শিক্ষা দেন। বালিকার মস্তিষ্ক অতি তীক্ষ্ণ। পাঠ লইতে লইতে পিতাকে এমন সূক্ষ্ম প্রশ্ন করে যে কিশোরী বাবু সেই সকলের আলোচনা করিয়া আনন্দ পান। একদিন বালিকা পিতার নিকট বসিয়া পাঠ করিতেছে, রাধাপদ ও রমণী এমন সময়ে সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইল।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥

শ্রীচৈ, চ, ৪র্থ অধ্যায় আদি খণ্ড।

হে। যে ভালবাসায় কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নাই, তাহা ভালবাসা বা প্রেম নহে, কাম অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা। এই স্থানের অভিপ্রায় কি?

কি। এই স্থানের অভিপ্রায় কাম এবং প্রেমের স্বরূপ নির্ণয়।

হে। কাম এবং প্রেমের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

কি। কাম এবং প্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করা প্রথম আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত সাধ্য সাধন তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তি জীব নির্লিপ্ত ভাবে কাম এবং প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করিতে সক্ষম। কাম এবং প্রেমের যথাযথ স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলেই জীবের শাস্ত্রসম্মত প্রকৃত জ্ঞান অনুশীলন করা হইল। আর সেই নির্ণয়ানুযায়ী সাধন পথে উন্নতি লাভ করিতে পারিলেই জীবের জ্ঞানানুশীলন সার্থক হইল। প্রেম প্রতিপাদনে বিমুখ যে জ্ঞান তাহা সম্পূর্ণ জ্ঞান নহে, জ্ঞানের কলা মাত্র।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা প্রথমে কহিয়াছেন, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছার নাম কাম। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়, সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারে আমরা রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ এই পাঁচটী বিষয় আস্বাদন করিয়া থাকি। সেই আস্বাদনের তাৎপর্য্য যদি আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয়, তবে তাহার নাম কাম। অর্থাৎ একটী বিকসিত সৌরভান্বিত কুসুমের সৌন্দর্য্য এবং সৌগন্ধ নয়ন ও নাসিকা দ্বারে আস্বাদন করিবার সময়ে ইন্দ্রিয়-পরিচালক মনের অভিপ্রায় যদি নিজসুখ-সম্ভোগ হয়, তাহা হইলে সেই অভিপ্রায় কাম নামে অভিহিত হইবে। কামের স্বভাব আত্মসুখ স্পৃহাযুক্ত স্বতন্ত্র ভোক্তৃত্ব। আত্মসুখ বশবর্ত্তী হইয়া যখন আমরা কোন বস্তু ভোগ করিতে অভিলাষ করি তখনই আমাদের বুদ্ধি শ্রীভগবান হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হয়। স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি হইতে আত্মসুখাভিলাষের উদ্গম। এই স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি আমাদের যাবতীয় অনর্থ এবং যন্ত্রণার কারণ। আত্মেন্দ্রিয় চরিতার্থতার পরিণাম বিবিধ দুঃখ। আত্মসুখরত ব্যক্তিকে কেহই ভালবাসেন না। আত্মসুখ সম্ভোগ চেষ্টা লোক, সমাজ এবং ধর্ম্ম-বিগর্হিত এবং অতীব নিন্দনীয়। আত্মসুখভোগশীল জীবের প্রথম ভ্রম সম্বন্ধ, দ্বিতীয় ভ্রম প্রয়োজন, তৃতীয় প্রমাদ অভিধেয়, "কাম গাঢ় অন্ধকার, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর"। কামহত ব্যক্তি হিতাহিত বোধ শূন্য, অর্থাৎ জীব আত্মসুখাভিসন্ধি-পরায়ণ হইলে তটস্থশক্তি হইতে বহির্ভূত হইয়া মায়া শক্তির অন্তর্গত হয়।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবান হইতে জীব স্বতন্ত্র নহে। তাঁহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ ভুলিয়া জীব মায়াগ্রস্ত। কিন্তু নানাবিধ যন্ত্রণায় জীব চিরদিন থাকিতে পারিবে কেন ? তটস্থাশক্তি-সম্ভূত হইলেও আনন্দ জীবের নিত্য এবং স্থায়ী স্বরূপ। সেই যন্ত্রণাভোগ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন মানসে সাধু শাস্ত্র এবং গুরুপ্রসাদে জীব আত্মসুখের চেষ্টা বর্জ্জন পূর্ব্বক প্রথম সম্বন্ধ, দ্বিতীয় প্রয়োজন, তৃতীয় অভিধেয় নির্ণয় করিতে যত্নবান হয়।

হে। এখন প্রেমের স্বরূপ বুঝাইয়া দেন।

কি। তটস্থা বুদ্ধিযোগে আমরা স্রষ্টা এবং সৃষ্টির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করিতে পারি। স্রষ্টার সৃষ্টি করিবার তাৎপর্য্য সম্ভোগ।* প্রীতি সেই সম্ভোগময়ী বৃত্তি। সেই সম্ভোগের মূল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান হ্লাদিনীশক্তি। সুতরাং অল্পায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, শ্রীভগবানের যাবতীয় সৃষ্টি তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিযোগে সম্পাদিত হয়। অতএব স্রষ্টা এবং সৃষ্টির ভোক্তা ও ভোগ্য সম্বন্ধ। সচ্চিদানন্দময় স্রষ্টার সৃষ্টিও সচ্চিদানন্দময়ী, কিন্তু স্রষ্টাকে সেবা করিয়া সুখী করিবার অভিপ্রায়ে আশ্রয় ভাব-সম্পন্ন হইয়া, তাহা আনন্দাংশে প্রধানা। এখন সৃষ্ট বা ভোগ্য বস্তুর ভোক্তা বা স্রষ্টার প্রীতি বাঞ্ছা করাই স্বাভাবিক। সেই স্বভাবানুযায়ী ভোগ্য অনন্তরূপে সৃজিত হইয়া বিভিন্ন অনন্ত প্রকারে সচ্চিদানন্দময়ের সুখবিধান করিতে তৎপর। প্রেমের স্বভাব সুখী করা। বিষয়, ভোক্তা এবং আশ্রয়, ভোগ্য জাতীয়-প্রেমের

* চিন্ময় রস জগতের সহিত যে সকল পাঠকবৃন্দের পরিচয় ভ্রম হইয়া আছে, তাহাদিগের স্রষ্টা-তত্ত্ব এবং সৃষ্টি-তত্ত্ব দ্বারা ভোক্তা এবং ভোগ্য অথবা বিষয় আশ্রয় বুঝিতে সুবিধাজনক।

উভয়বিধ স্বভাব ক্রমান্বয়ে সেবা গ্রহণ করিয়া এবং সেবা করিয়া সুখী করা।†

এখন বুঝিতে পারিলে, অন্য সম্বন্ধে প্রীতি হওয়ার কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত প্রীতি-তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছার নাম প্রেম।

হে। আপনি যাহা বলিলেন, এখন মনে করিয়া রাখিতেছি, পরে আরও পরিস্ফুট ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কি। হাঁ, মনে ধারণা করিয়া রাখিতে পারিলেই, অতি শীঘ্র বুঝিতে পারিবে। কৈশোর বয়স এই সমস্ত গভীরতত্ত্ব অনুশীলন করিবার উপযুক্ত সময়। ভোগ-বিক্ষিপ্ত চিত্তে কোন সুসিদ্ধান্ত তিষ্ঠিতে পারে না। সর্ব্বদা এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বিষয় অনুশীলন করিতে থাক; সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের নাম অনুক্ষণ লইতে পারিলে, ভ্রম কখনও আমাদের চিত্ত গ্রাস করিতে পারিবে না।

আমাদের কিশোরীবাবুর হৃদয়ে মহাপুরুষের কৃপায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মর্ম্ম বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। হেমলতা পিতার নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিল। সংসারে কত বালিকা আছে, কয়জন বালিকার ভাগ্যে এমন পিতা মিলিয়া থাকে? কয়জন পিতার ভাগ্যে বা এমন বালিকারত্ন লাভ হয়?

সম্প্রতি পূর্ব্বের মত হেমলতা রাধাপদ বা রমণীর সঙ্গ করিতে অবসর

† অনন্তর বিষয় আশ্রয় স্বভাব নির্ণয় আরও পরিস্ফুট ব্যক্ত হইবে। চিন্তাশীল পাঠকগণ! উপস্থিত আলোচনা হইতে সেই অভিব্যক্তি অনুধাবন করিতেও পারিবেন।

প্রাপ্ত হয় না। তাহারা উভয়ে পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বড়ই ব্যস্ত। তথাপি সন্ধ্যাকালে একবার করিয়া বাগানে তিন জনে মিলিত হয়। দাদাদের পরীক্ষা শেষ হইলে হেমলতা এই সকল বিষয় তাঁহাদের সহিত চর্চ্চা করিবে, এই প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

ক্রমে রমণী ও রাধাপদর পরীক্ষা অতি নিকটবর্ত্তী হইল। কিশোরী বাবু দুইজনকে যথারীতি উৎসাহ দেন। হেমলতা দাদাদের জন্য শ্রীরাধারমণের নিকট প্রার্থনা করে। কয়দিবস পরেই পরীক্ষার দিন আসিল। কিশোরীবাবু পরীক্ষা মন্দিরে রাধাপদ ও রমণীর তত্ত্বাবধান-কল্পে দুই জন উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করিলেন। একদিন, দুইদিন, তিনদিন করিয়া চারিদিন অতিবাহিত হইলে রাধাপদ ও রমণী পরীক্ষার চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

এদিকে হেমলতার চিত্ত ক্রমশঃ শ্রীরাধারমণে অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বালিকা পিতার সহিত দর্শন করিতে গিয়া অনিমেষ নয়নে শ্রীরাধারমণের প্রফুল্ল-কমল মুখপানে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বালিকার আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না। শ্রীরাধারমণকে এরূপ প্রেমের চক্ষে দর্শন করিতে কে শিখাইল, তাহা কে বলিতে পারে? হেমলতা অতি মনোযোগের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করে, আর সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেম বিষয় স্মরণ করে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গৌরপ্রিয়ার শ্রীবিগ্রহলাভ।

সুশীলার আর সন্তান সন্ততি হইল না। সুশীলা বেশ বুঝিতে পারিলেন, যে, মহাপুরুষের কৃপায় তাঁহাদের কন্যারত্নটী লাভ হইয়াছে। গৌরপ্রিয়ার বয়ঃক্রম এখন আট বৎসর। মায়ের কাছে বাঙ্গালা পড়িতে শিখিয়া গৌরপ্রিয়া পিতার নিকট সংস্কৃত শিখিতেছে। গৌরপ্রিয়া বড়ই অধ্যয়ন-প্রিয়। অল্প বয়সের মধ্যেই মহাভারত, রামায়ণ গ্রন্থ শেষ করিয়া গৌরপ্রিয়া এখন মহাপুরুষ-প্রদত্ত হস্তলিখিত পুঁথি শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করে। প্রেম-পীযূষ-পূরিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদ্ভুত লীলা সমুদয় পাঠ করিতে করিতে গৌরপ্রিয়াতে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রথম কয়েক দিবস গৌরপ্রিয়া সর্ব্বদা শ্রীভাগবত পড়িত। দিন নাই, রাত্রি নাই গৌরপ্রিয়া গ্রন্থ সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে। এক এক দিন গৌরপ্রিয়ার ভাগবত পড়িতে পড়িতে এত অশ্রুবর্ষণ হয় যে, দুইটা চক্ষু ফুলিয়া যায়। সুশীলা অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া কন্যাকে দুইটী খাওয়াইতে পারে। মেয়ের পাঠে ঐকান্তিক অভিনিবেশ দর্শনে সুশীলা কহিতেন, "মেয়েটা পড়ে পড়ে দেখ্‌ছি পাগল হবে।" গৌরপ্রিয়া বলিত, "মা! পড়ে পড়ে কি কখনও লোকে পাগল হয়?"

গৌরপ্রিয়া অনেক স্তব-স্তোত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছে। সংস্কৃত স্তোত্র এরূপ সুস্পষ্ট এবং সুস্বরে পাঠ করে যে, পথিক পণ্ডিতের আকৃষ্ট চিত্তে পাঠ শ্রবণ করিতে আগ্রহ হয় এবং একবার পাঠিকার সহিত পরিচয় করিতে অভিলাষ জন্মে। প্রাতঃকালে স্নান সমাপন পূর্ব্বক ঠাকুর পূজার জন্য

গৌরপ্রিয়া কুসুমচয়ন করে এবং মালা গাঁথিয়া দেয়। পূর্ব্বোক্ত ফুলের বাগানটী গৌরপ্রিয়ার প্রযত্নে আরও উন্নতি লাভ করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িতে পড়িতে গৌরপ্রিয়ার নিতাই গৌরের উপর অতিশয় ভক্তি জন্মিল। পাঠ করিবার কালে লীলানিচয় চক্ষের সম্মুখে অভিনীত হইতেছে, গৌরপ্রিয়ার এইরূপ স্ফূর্ত্তি হইত। যেদিন "জগাই মাধাই উদ্ধার" বিষয় পাঠ করে, নিত্যানন্দকে মাধাই প্রহার করিলে গৌরপ্রিয়া দুঃখে এবং ক্রোধে হুঙ্কার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া দেখেন, গৌরপ্রিয়ার অঙ্গ পুলকে কণ্টকিত। হঠাৎ কন্যার মূর্চ্ছাবস্থা অবলোকনে সুশীলা ভীত হইলেন; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যার ঈদৃশ প্রেমাবস্থা দর্শনে কন্যার সৌভাগ্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আর একদিবস শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস পাঠ করিতে করিতে গৌরপ্রিয়া অদ্ভুত সাত্ত্বিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর কেহ জানিতে পারেন নাই।

ক্রমে গৌরপ্রিয়ার বয়স নয় বৎসর হইল। এই সময়ে এক দিন মহাপুরুষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। গৌরপ্রিয়া সে দিন জিদ্ করিয়া মহাপুরুষের নিকট দীক্ষিত হইল। গৌরপ্রিয়ার সমবয়স্কাদিগের সহিত খেলা করিতে মন হয় না। তাহার কারণ গৌরপ্রিয়ার চিত্ত বালিকা বয়স হইতেই ভিন্ন ভাবে মার্জ্জিত হইতেছে। গৌরপ্রিয়ার নিতাই গৌর এবং তাঁহাদের লীলা ভাবিতে ভাল লাগে; স্বপ্নেও গৌরপ্রিয়া নিতাই গৌর ব্যতীত আর কিছু দেখে না। একদিন ভোর নিশায় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, গৌরপ্রিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, "মা! তুমি নিতাই গৌর দেখেছ, নিতাই গৌর দেখিতে কেমন?" গৌরপ্রিয়া স্বপ্নে দুইজন অপরূপ কিশোর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কে, নিরূপণ করিতে না পারিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা!

তুমি নিতাই গৌর দেখেছ, নিতাই গৌর দেখিতে কেমন?" গৌরপ্রিয়ার এক এক বার মনে হইতেছে, স্বপ্নদৃষ্ট কিশোরদ্বয় নিতাই গৌর।

সু। আমি কেমন করিয়া নিতাই গৌর দেখিব মা! তুমি দেখেছ?

গৌ। এইমাত্র স্বপ্নে আমি দুইজন সুন্দর লোক দেখ্‌লাম, মনে হইতেছে তাঁহারাই নিতাই গৌর।

সু। কেমন দেখিলে বল দেখি।

গৌ। মা! সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সুন্দর গলায় সুন্দর মালা, সুন্দর গায়ে চন্দন মাখান, হাতে সুন্দর উজ্জ্বল গহনা। সুন্দর চাহিয়া আমার প্রতি হাসিলেন।

সু। হাঁ, মা! তুমি যাঁহাদের দেখেছ তাঁহারাই নিতাই গৌর।

গৌ। তুমি কেমন করিয়া জানিলে তাঁহারা নিতাই গৌর?

সু। আমি শুনিয়াছি, নিতাই গৌর ঐরূপই দেখিতে।

গৌ। মা! আমি তাঁহাদের চিনিতে পারিলে জিজ্ঞাসা করিতাম, তাঁহারা আমার সহিত কথা বলিলেন না কেন।

আর এক দিবস গৌরপ্রিয়া স্বপ্ন দেখিল, নিতাই গৌর দুই ভাই কহিতেছেন, "তুমি আমাদের রাঁধিয়া দিবে, আমরা খাইব"। গৌরপ্রিয়া স্বীকার করিলে তাঁহারা কহিলেন, "কবে দিবে"? গৌরপ্রিয়া কহিল, "যে দিন কহিবে"। ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুযায়ী এই স্বপ্নকথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। একদিন পূর্ণিমার শেষ রজনী, জ্যোৎস্নার আলোকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অঙ্গন ভরিয়া গিয়াছে; চতুর্দ্দিক নীরব। স্বপ্নের মধ্যে গৌরপ্রিয়া শুনিল, "গৌরপ্রিয়া! এই আমরা আসিয়াছি, তুমি আমাদের আজ রাঁধিয়া খাওয়াইবে"? সেই অমৃতময় বাণী শ্রবণে গৌরপ্রিয়া কহিল, কোথা? ধ্বনি হইল, "এই তোমাদের অঙ্গনে"। গৌরপ্রিয়া গৃহের দরজা উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া সেই

অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশি দর্শনে বিবশ হইয়া পড়িল। ঠাকুরের কৃপায় আত্ম-সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়া দর্শন করিল, দুইটী অনুপমেয় রূপলাবণ্যবান শ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ। গৌরপ্রিয়া দেখিল, জ্যোৎস্নার আলোক খর্ব্ব করিয়া শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের অঙ্গ হইতে অপূর্ব্ব সুষমা নির্গত হইতেছে।' দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া গেল। সেই দিন হইতে গৌরপ্রিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। ধন্য গৌরপ্রিয়া! এত অল্প বয়সে কয়জন সাক্ষাৎ ভগবৎ কৃপার ভাজন হয়।

এই অপরূপ ঘটনায় পিতা মাতা এবং সমস্ত পাড়া প্রতিবাসী বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। সকলে নবীন বিগ্রহদ্বয়কে নানাবিধ উপহার প্রদান করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে প্রচুর উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন এবং মহোৎসবাদি আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক হইতে গ্রামের অধিবাসীগণ এই অভিনব ঘটনা-বিবরণ শ্রবণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে সমাগত হইয়া ঠাকুর দর্শন করিতে লাগিলেন। গৌরপ্রিয়াকে দেখিবার জন্য সকলের আগ্রহ হইল। সকলেই গৌরপ্রিয়ার রূপ দর্শনে প্রশংসা করিতে তৎপর। এতদুপলক্ষে যে অর্থাগম হইল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদ্দারা একটী ক্ষুদ্র ঠাকুর মন্দির আর দুইখানি প্রকোষ্ঠ—একখানি বাহিরে এবং একখানি ভিতরে—নির্ম্মাণ করাইয়া লইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পাণিহাটীতে মহোৎসব—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে কিশোরীবাবু।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্লা ত্রয়োদশী। পাণিহাটীতে সমারোহের সহিত প্রতি বৎসর ঐ দিবসে দাস গোস্বামীর মহোৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। পাণিহাটী-গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী বটবৃক্ষতলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাসের শিরোদেশে শ্রীচরণ অর্পণপূর্ব্বক কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার আজ্ঞাতে তিনি প্রেমধন চুরি করিয়াছেন, এই অভিযোগে চিড়ামহোৎসব ব্যয় দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। আহা! যেমন বিচারক, তেমনি চোর; যেমন অপহৃত বস্তু, তেমনি দণ্ড! রঘুনাথ আহ্লাদের সহিত দণ্ড শিরোধার্য্য করণান্তর সমারোহের সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই দিবস বৃক্ষতলে, তৎচতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থানে এবং জাহ্নবীজলে দাঁড়াইয়া সমাগত ব্যক্তিগণ পরমানন্দে চিড়া প্রসাদ গগনভেদী হরিধ্বনির সহিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাঠকগণের যদি দণ্ডমহোৎসব বিষয়ে পাঠ করিতে বাসনা হয়, তবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ একবার দেখিবেন।

হেমলতা শ্রীচরিতামৃত বর্ণিত পাণিহাটী গ্রামে দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পাদিত হয়, তাহা শুনিয়াছেন। পাণিহাটী গ্রাম তাহাদের বাটী হইতে অতি নিকটে, এই বৎসর পিতাকে উৎসব দর্শনার্থ তথায় লইয়া যাইতে অনুরোধ করিল। কিশোরী বাবু

কন্যার প্রস্তাবে রাধাপদ এবং রমণীকে লইয়া পাণিহাটীতে যাইতে সম্মত হইলেন। সঙ্গে দুইজন দ্বারবান এবং দুইজন ভৃত্য থাকিবে। পূর্ব্ব দিবস নৌকার বন্দোবস্ত করা হইল। পরদিবস অতি প্রাতঃকালে প্রস্তাবানুযায়ী সকলে যাত্রা করিলেন। কিশোরী বাবু সঙ্গে একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়াছেন। জাহ্নবী বক্ষে তরণী নাচিয়া নাচিয়া চলিতে লাগিল।' মৃদুমন্দ সুশীতল সমীরণ আরোহিগণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, তাঁহাদিগের হৃদয়ে কোন অপূর্ব্ব প্রেমময়ী স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিল। আবিষ্টচিত্তে কিশোরীবাবু হেমলতাকে দণ্ডমহোৎসব বিবরণ পাঠ করিতে কহিলেন। পিতার কথামত হেমলতা পাঠ আরম্ভ করিল। এক স্থানে আছে,—

"নিকটে না আস চোরা ভাগ দূরে দূরে ॥
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে ॥"

ইহার পূর্ব্বেও এক জায়গায়—

"শুনি প্রভু কহে, চোরা দিলি দরশন ॥"

হেমলতা প্রশ্ন করিল, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু রঘুনাথকে চোরা বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন?

কি। নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমদাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের ভাণ্ডার। রঘুনাথের সম্বন্ধে এস্থলে প্রেমদাতার এই অভিযোগ যে, রঘুনাথ তাঁহার অজ্ঞাতে প্রেমধন অপহরণ করিয়াছে। চোরা অতি প্রেমের তিরস্কার।

পাঠ সমাপ্ত হইল। রমণী ও রাধাপদ পাঠ শ্রবণে যে বিমল আনন্দ লাভ করিল, তাহা বর্ণনাতীত। ক্রমে নৌকাখানি পাণিহাটীর একটী ঘাটে আসিয়া লাগিল। সেই ঘাটের উপরেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী। এই স্থানের অল্প উত্তরে মহোৎসব ক্ষেত্র এবং শ্রীচরিতামৃত বর্ণিত বট-বৃক্ষ। অতি উৎসাহে হেমলতা সকলের অগ্রে নৌকা হইতে অবতরণ

করিল। একটী সুন্দরী বালিকা তীরবর্ত্তী বৃক্ষতলে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে। প্রথমেই হেমলতার মনোযোগ সেই বালিকার প্রতি আকৃষ্ট হইল। নিকটবর্ত্তী হইয়া পঠিত পুস্তকখানির দিকে চাহিয়া দেখিতে বুঝিতে পারিল, "শ্রীচৈতন্যভাগবত।" গ্রন্থখানি মুদ্রিত পুস্তক। হেমলতা গ্রন্থপাঠিকার সহিত আলাপ করিবার জন্য স্বতঃই উৎকণ্ঠিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, ভাই! তুমি এ কি গ্রন্থ পাঠ করিতেছ? গ্রন্থ শব্দের ব্যবহার শুনিয়াই গৌরপ্রিয়ার অপরিচিতা সমবয়স্কার প্রতি ভক্তি জন্মিল; প্রীতিমাখা স্বরে উত্তর করিল, "শ্রীচৈতন্যভাগবত।" বলিতে বলিতে পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের প্রতি এতই ধাবিত হইল, তৎক্ষণাৎ দুইটী হৃদয় একীভূত হইয়া, এক অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ প্রকটিত করিল। কিশোরী-বাবু, রমণী এবং রাধাপদ চিত্রপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া মূর্ত্তিমান দুইটী ভাবরাশি দর্শন করিতেছেন। অল্পক্ষণ পরে লজ্জা আসিয়া উভয়ের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিল। হেমলতা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তোমার নাম কি?"

গৌ। গৌরপ্রিয়া।

হে। তোমার পিতার নাম কি?

গৌ। শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য।

হে। তোমাদের বাড়ী কি এইখানে?

গৌ। এই যে সম্মুখেই আমাদের বাড়ী! তুমি আমাদের বাড়ী যাবে?

হে। ভাই! আমি, বাবা ও দাদাদের সঙ্গে আসিয়াছি। তাঁহারা ঐ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

কিশোরী বাবু, রমণী এবং রাধাপদ তীরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে উভয়কে দেখিতেছেন। উভয়েই পরমা সুন্দরী, উভয়েরই মুখ-কমল

একটী অপূর্ব্ব ভাব ভূষিত হইয়া দর্শকের নয়নে সুধারাশি ঢালিয়া দিতেছে। উভয়েরই দর্শন স্বতঃই প্রাণীমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক।

গৌ। তা' হলেই বা। তোমার বাবা কি আমাদের বাড়ী যাবেন না!

হে। কেন যাবেন না, তবে—

গৌ। তবে আর কি, চল আমার মা তোমায় দেখিলে কত ভালবাসিবেন।

গৌরপ্রিয়া হেমলতার হাত ধরিয়া যেখানে কিশোরীবাবু, রমণী ও রাধাপদ দাঁড়াইয়া আছেন, সেইখানে আসিলে হেমলতা কহিল, "বাবা! এই গৌরপ্রিয়া আমার সই, চলুন এদের বাড়ী যাই।"

কি। তুমি গ্রামে আসিতে না আসিতে সই পাতাইয়া লইলে। তবে চল তোমার সইয়ের বাড়ী দেখিয়া আসি।

এই বলিয়া সকলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপনীত। গৌরপ্রিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া বাবাকে সংবাদ দিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তখন পাঠ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। গৌরপ্রিয়ার কথায় বাহিরে আসিয়া অভ্যাগত চতুষ্টয়কে অভ্যর্থনা করিয়া বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রেমময় মূর্ত্তি, মনোহর দর্শন, সুমিষ্ট কথা শুনিয়া কিশোরীবাবু তাঁহার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। কিশোরী বাবু কিন্তু ভাবেন নাই, যে ঘটনা এতদূর বিস্তারিত হইবে। তিনি মনে করিয়াছিলেন, একবার বাহির হইতেই গৌরপ্রিয়াদের বাড়ী দেখিয়া স্নানাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক ঠাকুর দর্শন করিতে যাইবেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন অতি মিনতি বাক্যে সকলকে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য আগ্রহ করিলেন; তখন কিশোরী বাবু ভাবিলেন, মানুষের অভিপ্রায়ানুযায়ী কিছুই হয় না, রাধারমণ যা' করেন।

এদিকে হেমলতার হাত ধরিয়া গৌরপ্রিয়া মার নিকট লইয়া গেল। সুশীলা অতি আদর করিয়া হেমলতার পরিচয় গ্রহণ করিলেন, হেমলতাও অতি নম্রভাবে সুশীলাকে আপনাদের পরিচয় দিলেন। বালিকার সুন্দর রূপ ও বিনয় বচনে সুশীলা আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিয়ৎকাল আলাপনের পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সকলকে স্নান করিতে অনুনয় করিলে কিশোরীবাবু, রমণী এবং রাধাপদকে লইয়া গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নানাবিধ কথোপকথনে কিশোরীবাবুকে পরম আপ্যায়িত করিতেছেন। স্নান সমাপন হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৌরপ্রিয়াসেবিত শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ দর্শন করাইতে লইয়া গেলেন। শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ অতি অপরূপ মনোহর দর্শন। ঠাকুরদ্বয়ের প্রাপ্তি ঘটনা ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি উৎসাহ এবং আহ্লাদের সহিত কিশোরী বাবুর নিকট বর্ণন করিতেছেন, আর কিশোরী বাবু তৎশ্রবণে আশ্চর্য্য হইতেছেন। কথায় কথায় মহাপুরুষের কৃপার কথা হইল। মহাপুরুষের কথা উঠিতেই কিশোরী বাবুর সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরমার্থ সম্বন্ধ ধার্য্য হইয়া গেল। উভয়ে মহানন্দে আলিঙ্গন প্রত্যালিঙ্গন করিলেন। রমণী ও রাধাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রণাম করিলেন।

গৌরপ্রিয়া হেমলতাকে স্নান করাইতে লইয়া গেল। গৌরপ্রিয়ার অনেক নূতন কাপড় আছে। মার অনুমতি লইয়া তন্মধ্য হইতে একখানি ভাল কাপড় হেমলতার স্নান হইলে তাহাকে পরিতে দিল। হেমলতা কহিল, ভাই! আমার ত কাপড় আছে, তুমি আবার কাপড় আনিলে কেন?

গৌ। কেন ভাই! আমার কাপড় কি তোমায় পরিতে নাই?

হেমলতা গৌরপ্রিয়ার কথায় আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। কাপড়খানি হেমলতা পরিলে গৌরপ্রিয়ার অন্তরে যে উল্লাস হইল, তাহা

কে বর্ণন করিতে পারে? আহ্লাদের ভরে গৌরপ্রিয়া ডাকিল, 'সই'! হেমলতা উত্তর করিল, 'সই'! আহা! দুটী বালিকা অপরূপ রূপবতী, গুণবতী, গঙ্গাতীরে আজ সই সম্বন্ধ স্থাপন করিল। পাঠকগণ! ক্রমে অবগত হইবেন, গৌরপ্রিয়া ও হেমলতা কেবল ইহ জগতে সই নহে, আর একটী সুখময় রাজ্যে যেখানে "প্রেমের হাট, প্রেমের বাট, প্রেমের তরঙ্গ" সেখানেও তাহারা সই। তাহার পর গৌরপ্রিয়া হেমলতাকে তাহার নিতাই-গৌর দেখাইল। গৌরপ্রিয়া রাধারমণ-গত প্রাণ, নিতাই গৌরাঙ্গ দেখিয়া দুইজনকে বড় ভালবাসিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়—কিশোরী বাবু, রমণী, রাধাপদ, হেমলতা ও গৌরপ্রিয়াকে দর্শন করাইতে লইয়া গেলেন। যেখানে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে পুরী হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক দধি, চিড়া খাওয়াইয়াছিলেন, সেই বটবৃক্ষমূলে সকলে ভূমি-লুণ্ঠিত হইলেন। তদনন্তর পার্ষদ-ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের পাটে শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তি অগ্রে প্রণাম পূর্ব্বক এবং মালতী বৃক্ষের পরিসর দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। দর্শন শেষ হইলে সকলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে হেমলতা ও গৌরপ্রিয়া শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ লীলা-বিষয়ক কত আলাপন করিল।

এদিকে ভট্টাচার্য্য গৃহিণী পাককার্য্য সমাপন পূর্ব্বক ভোগদ্রব্য ঠাকুর-গৃহে লইয়াছেন। এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় সকলের সহিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুর-মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক অতি প্রীতিসহকারে ভোগ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিলেন। ভোগ সরিলে আরাত্রিক হইল। সুশীলার প্রকোষ্ঠ-সম্মুখস্থ পিণ্ডায় পিসীমা সকলের নিমিত্ত আসন করিলেন। সুশীলা পরিবেশন করিয়া দিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিশোরীবাবু, রমণী, রাধাপদ, হেমলতা গৌরপ্রিয়াকে লইয়া প্রসাদ দর্শনে আসিলেন। শ্রীনিতাই-

গৌরাঙ্গ-প্রসাদ দর্শনে সকলে উল্লসিত হইয়া প্রণাম করণান্তর ভোজন করিতে বসিলেন। কিশোরী বাবু রন্ধন-কার্য্য-নিপুনা সুশীলার পাকের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ভোজন সমাপন হইলে আচমন করণান্তর মুখশুদ্ধি লইয়া সকলে সুশীলার গৃহে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। বেলা ১ টার সময় পুনরায় উৎসব দর্শনে বহির্গত হইলেন। বৃক্ষরাজ পরিক্রমকারী বহু সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন, অসংখ্য মালসা-ভোগ অর্পণ, বহু লোকের হরিল্লুট প্রদান, গগনভেদী হরিধ্বনি—সকলে আবার যেন সেই লীলা প্রকট দেখিতে লাগিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু—

আজ্ঞা দিলা 'হরি' বলি করহ ভোজন।
'হরি হরি' ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন॥

তাহার পর দিবা শেষে বিশ্রামান্তর শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাটীতে উৎসবানন্দ হইল। দর্শনে মহানন্দ লাভ করিয়া আমাদের কিশোরী বাবুর সম্প্রদায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত তদীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কিশোরী বাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

ভ। আবার কেমন করিয়া দেখা হইবে?

কি। একদিন আমাদের বাটীতে আপনার পদার্পণ হইবে না কি?

ভ। একদিন আমার শ্রীরাধারমণ দর্শন লাভ হইলে আমি বহু ভাগ্য মনে করিব।

হেমলতা গৌরপ্রিয়াকে কহিল, সই! তুমিও বাবার সঙ্গে যাইবে? গৌরপ্রিয়া কহিল, যাইব। সুশীলা হেমলতাকে অন্তরালে ডাকিয়া স্নেহ-চুম্বন করিয়া কহিলেন, মা! আমায় ভুলিও না। সুশীলার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে হেমলতা কাঁদিয়া ফেলিল। ভালবাসা সময়ের অপেক্ষা করে না।

পিসীমাতাঠাকুরাণী এবং সুশীলাকে রাধাপদ ও রমণী প্রণাম করিল। হেমলতাকে দেখিয়া গৌরপ্রিয়ার যে তাহাকে হৃদয়ে ধরিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই সাধ এক্ষণে পূর্ণ হইল। আজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অঙ্গনে অপরূপ ভালবাসার অভিনয়—পাকগৃহের সম্মুখে পিসীমা এবং সুশীলা দণ্ডায়মানা, হেমলতা গৌরপ্রিয়ার আলিঙ্গনে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং কিশোরী বাবুর সপ্রেম নিরীক্ষণে, রাধাপদর অভিনব হৃদয়ভাব, রমণী গম্ভীর দর্শক। সকলে ঠাকুর অগ্রে প্রণাম পূর্ব্বক জাহ্নবীকূলে আসিয়া নৌকারোহণ করিলেন। তীরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং গৌরপ্রিয়া, বহির্দ্বারে পিসীমা এবং সুশীলা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। রাধাপদর হৃদয়ে একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইল—গৌরপ্রিয়ার সুন্দরী প্রেমময়ী মূর্ত্তি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হেমলতা—ঈশ্বরতত্ত্ব ও প্রেমরাজ্য।

রাধাপদ ও রমণীর পরীক্ষা শেষ হইলে, কয়েক দিবস পরে কিশোরী বাবু তাহাদের শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতে দিলেন। পিতার আদেশে উভয়ে অতি আনন্দের সহিত পাঠ আরম্ভ করিল। ক্রমে পড়িতে পড়িতে উভয়ের পাঠে চিত্তের এত অভিনিবেশ এবং কৌতূহল জন্মিল যে এক ক্ষণের জন্য পাঠ ছাড়িতে দুঃখ লাগিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলামাধুর্য্য কালের প্রভাবে আশানুযায়ী আমাদের আস্বাদনীয় হইয়া পড়িতেছে না। এই লীলাপাঠে চিত্ত যে অতীব বিশুদ্ধভাবে পরিমার্জ্জিত হয়, এতদ্‌সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মানই সুকঠিন। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যের সংঘটন হইতে পারে না। সুবিমল বিচিত্র আনন্দপ্রদ শ্রীগৌরাঙ্গচরিতামৃত পানে আমাদের অপ্রবৃত্তির কারণ নির্দ্ধারণ করিতে যত্নবান হওয়া উচিত।

শ্রীশচীনন্দন প্রেমভক্তিযোগে মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানের ভজন শ্রেষ্ঠ নির্ণয় করিয়া স্বয়ং আদর্শস্বরূপে সেই নিরুপাধি প্রেমভক্তি-ধর্ম্ম যাজন পূর্ব্বক জীবকে তাহাই অনুশীলন করিবার জন্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যময়। আত্মসুখলিপ্সা জীবের প্রধান দুর্ব্বলতা। সেই দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন জীব সম্পূর্ণ নিষ্কামধর্ম্ম অনুশীলন করা একান্ত দুরূহ বোধ করে। শ্রীভগবানের মাধুর্য্য অকৈতব প্রেমভক্তি অনুশীলন সাপেক্ষ। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে শ্রীভগবানের ভুক্তি মুক্তি লালসাময়ী সকাম উপাসনা হইতে পারে বলিয়া জীবের নিকট তাঁহার মাধুর্য্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যানুভূতি অনায়াসকল্পিত। সুতরাং স্বভাবতঃ আত্মসুখবাসনাক্রান্ত হইয়া শ্রীমন্মহা-

প্রভুর উজ্জ্বল রসময়ী লীলা আমাদের আস্বাদন করিবার প্রবৃত্তি হয় না। ইহাই মূল কারণ।

বিশুদ্ধ অহৈতুকী প্রেমভক্তিযোগ ব্যতীত শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ মাধুরীর একবিন্দু অনুভবগম্য হওয়া একান্ত অসম্ভব। সেই নিত্য নব নব আনন্দদা প্রেমভক্তি এবং আত্মসুখতাৎপর্য্যময়ী ভুক্তি মুক্তি কামনা—একজন অনন্ত ভুবন প্রকাশিকা, নয়ন মন স্নিগ্ধকর, সুনির্ম্মল জ্যোতির অভ্যন্তরবর্ত্তিনী, অতুলনীয়া নিত্য নবায়মান সৌন্দর্য্যগুণালঙ্কৃতা, অলৌকিক হৃদয়হারী ভাবভূষিতা চারু তারুণ্যময়ী দেবী,—আর একজন দুর্গন্ধময় ঘন তমসাপরিবৃতা নিরন্তর বিভীষিকাপ্রদায়িনী বিকটাকৃতি "পিশাচী"। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রিত। সেই ভুক্তি মুক্তি স্পৃহারূপিনী পিশাচী হৃদয়ে বাস করিলে প্রেমভক্তি দেবী তাহাতে অধিষ্ঠান করিতে পারেন না। মধুর হইতে সুমধুর প্রেমরস পরিপূরিত শ্রীমন্মহা প্রভুর লীলাপূর আজ আত্মেন্দ্রিয় সুখের দাস হইয়া আমরা আস্বাদন করিতে বঞ্চিত আছি।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইল। উচ্চ সম্মানের সহিত রমণী এবং রাধাপদ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেন। এতদিন কিশোরী বাবু উভয়কে বাটীতেই পড়াইতেন, কিন্তু উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে দুইজনকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভুক্ত করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। বাড়ীর গাড়ীতে করিয়া দুইজন কলেজে যাতায়াত করে। এই সময়ে হেমলতার আগ্রহে কিশোরী বাবু রমণী ও রাধাপদকে লইয়া পাণিহাটীতে মহোৎসব দর্শনে গমন করেন, সে বিবরণ পাঠকগণকে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

হেমলতা স্বাভাবিক চিন্তাশীলা এবং অতিশয় সূক্ষ্মবুদ্ধি-সম্পন্না। আজ কি কারণে চিন্তাস্রোত হেমলতার চিত্তে খরতর প্রবাহিত। একা একা বাগানে বেড়াইতে গিয়া হেমলতা পুষ্করিণীর অপর পারে চত্বরোপরি বসিয়াছে। পার্শ্বে একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ, অদ্ভুত সৌগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক

হেমলতার চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত আস্ফালন করিতেছে। ক্ষণকাল মধ্যে গোলাপ কুসুমেরই জয় হইল। হেমলতা চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইলেও সেই অপূর্ব্ব গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া একবার গোলাপের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিল, অতি নিকটবর্ত্তী ফুলটীকে নির্ম্মল গৌরবর্ণ বাহুলতা প্রসারণ পূর্ব্বক আরও নিকটে আনয়ন করিয়া দেখিল,—কি সুন্দর! কি সুন্দর রং, কিবা সুকোমল, কি পরিপাটী-সহকারে এক একটী দলের উপরিভাগে আর একটী সজ্জিত! আহা! কে এমন সুন্দর করিয়া ইহাকে সৃজন করিল? ইহাতে কে এমন সৌগন্ধ অর্পণ করিল? কই, কাহাকেও ত ইহাকে সৃষ্টি করিতে দেখা যায় না! এই বৃক্ষ রোপিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে ফুল ধরিল। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য, এই সৌগন্ধ কোথা হইতে আসিল? এই বৃক্ষের বীজে এই সৌন্দর্য্য এবং এই সৌগন্ধের কারণ সূক্ষ্মভাবে নিহিত ছিল। স্বীকার করিলাম, পুষ্প সহিত বৃক্ষের কারণ বীজ, কিন্তু পুনরায় এই পুষ্পটীত বৃক্ষের কারণ হইতেছে। বীজ একবার কারণ আবার কার্য্য। কারণ কেমন করিয়া কার্য্য হয়? বীজের কারণ বৃক্ষ, বৃক্ষের কারণ বীজ—এই যে কারণ শব্দের ব্যবহার, ইহা বহিরঙ্গ অথবা স্থূল অনুভবের কথা। কার্য্যেরই কারণ হয়, পরন্তু কারণের কারণ থাকিতে পারে না। যাহা কারণ বলিয়া নিরূপিত হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাওয়া ভুল। তবে যে আমরা "বৃক্ষের কারণ বীজ" অথবা "বীজের কারণ বৃক্ষ" বলিয়া থাকি, সে স্থলে কারণ শব্দ যথার্থ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কারণের আর কারণ হইতে পারে না, এই সত্য উপলব্ধি হইলে, এক বই দ্বিতীয় কারণ নাই। অতএব কারণ অদ্বয়-তত্ত্ব। অযথার্থ তাৎপর্য্যে কারণ শব্দ ব্যবহৃত হয় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ অদ্বয় কারণ-তত্ত্বকে "সর্ব্বকারণ-কারণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, সেই কারণের স্বরূপ কি? কার্য্য বিচারে কারণের স্বরূপ অনুভব করিতে হইবে। কার্য্য এবং কারণ এতই মাখামাখি তত্ত্ব যে একটীর উপলব্ধি হইলে আর একটীর উপলব্ধি হইবে। গোলাপের সৌন্দর্য্য এবং সৌগন্ধ অনুভব হইলে, ইহার কারণের সৌন্দর্য্য এবং সৌগন্ধ-বিশিষ্টতা বুঝা যায় এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে যত সুন্দর এবং সুগন্ধ পদার্থ আছে, সকলের কারণ একই। অতএব সেই অদ্বয় কারণ-তত্ত্ব অসীম সৌন্দর্য্য এবং সৌগন্ধ-সম্পন্ন। কার্য্য-লক্ষণে প্রকাশ পায় এই কারণ অনন্ত শক্তি সম্পন্ন।* অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটী প্রাণী, অনন্ত উচ্চ পর্ব্বতমালা, নদ-নদী, সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য এই সমুদয়ের যাহা কারণ, তাহা যে অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন ইহা অনায়াসে বুঝা যায়। কার্য্য দেখিয়া কারণকে আর জড় বস্তু বলিয়া নিরূপণ করা যায় না। অতএব কারণ চৈতন্যময়। কারণ সৎ—কেহ তাহার আদি বা অন্ত নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় না। কারণ আনন্দময়। বিকসিত কুসুমের সৌন্দর্য্য দর্শনে এবং সৌগন্ধ আঘ্রাণে, পূর্ণিমার সুধাকর দেখিবামাত্র প্রাণে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহা কে না অনুভব করিয়া থাকে?

হেমলতা চিন্তাসাগরে ডুবিয়া মণিমাণিক্য কুড়াইতে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। এদিকে রমণী ও রাধাপদ হেমলতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইল। রমণী একবার ডাকিল, হেমলতা! হেমলতা তখন কারণের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ হৃদয়াসনে স্থাপন করিয়া তদ্গত চিত্তে দর্শন করিতেছে, সে কি আর রমণীর কথা শুনিতে পায়!

* এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করিয়া এইরূপে আমরা নিরন্তর পদার্থ-নিচয়ের পঞ্চবিধ মাধুর্য্য—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—আস্বাদন করিতেছি। অদ্বয়-কারণের উক্ত পঞ্চবিধ মাধুর্য্যের আকর-স্বরূপতা স্বীকার্য্য হয়।

রমণী রাধাপদকে কহিল, ভাই রাধাপদ! হেমলতার কেমন একাগ্রতা দেখ, কি ভাবিতে ভাবিতে একেবারে আপনহারা হইয়া গিয়াছে। রমণী তখন হেমলতার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া ডাকিল, হেমলতা! এইবার হেমলতা বাহ্যচৈতন্য লাভ করিয়া কহিল, রমণী দাদা! কখন এলে?

র। তুমি কি ভাবছ?

হে। দাদা! আমি কত কি ভাবিয়া থাকি।

র। কি ভাব্‌ছিলে আমাদের বল্‌বে না?

হে। তুমি সেদিন দাদার সহিত তোমাদের কলেজের কোন একটী ছেলে ঈশ্বর মানে না, বলিয়া গল্প করিতেছিলে। তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইলে ঈশ্বর কেমন করিয়া মানিতে পারিবে? অনুভব ব্যতীত অভিব্যক্তি হইতে পারে না।

তাহার পর হেমলতা—রমণী এবং রাধাপদকে আজিকার অনুভব-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। হেমলতার বিশুদ্ধ মীমাংসা শ্রবণে উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

হে। দাদা! এই সমস্ত সিদ্ধান্ত লইয়া কাহারও সহিত তর্ক করা আমাদের উচিত নহে।

রা। কেন, তর্ক ব্যতীত আলোচনা কিরূপে হইবে?

হে। অভিমানবর্জ্জিত তর্ক-বুদ্ধি হয় না। অভিমানই তর্কের জনক।

র। তবে কিরূপে আলোচনা হইবে?

হে। আপনার প্রতি আমার ভালবাসা থাকিলেই আমাদের মধ্যে আলোচনা হইবে। পরস্পরে প্রীতি না থাকিলে পরস্পরের মধ্যে কোন আলোচনা হওয়া সঙ্গত নহে।

রমণী এবং রাধাপদ হেমলতার কথায় আহ্লাদ সহকারে স্বীকৃত হইল। হেমলতার বয়স এই তের বৎসর। মহাপুরুষের আজ্ঞাক্রমে কিশোরী

বাবু কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু ব্রজসুন্দরী কিছুতেই কন্যার বিবাহ বিষয়ে চিন্তা সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। অপিচ কয়েক মাস ধরিয়া পাড়া-প্রতিবাসীগণ তাঁহাদের অপরিণীতা কন্যা সম্বন্ধে কাণাকাণি করিতেছেন শ্রুত হইয়া, ব্রজসুন্দরী স্বামীকে কোন কথা না বলিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। একদিন রাত্রিতে ব্রজসুন্দরী স্বামীকে উপযুক্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

কি। তুমি ত জান, কোন মানুষের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হইবে না।

ব্র। তুমি পরিহাস করিও না।

কি। আমি সত্যই বলিতেছি।

ব্র। সমাজ আছে ত?

কি। সমাজ থাক্। সমাজ ত আর দৃষ্টিশক্তিহীন নহে। রাধারমণের সহিত হেমলতার বিবাহ হইলে সকলেই দেখিতে পাইবে।

ব্র। আমি আর তোমার কথার উপরে কি বলিব।

কি। তুমি কোন চিন্তা করিও না।

সেইদিন রাত্রিতে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে মাতাপিতার এই পর্য্যন্ত কথোপকথন হইল।

ক্রমে কিশোরী বাবুর মাতাঠাকুরাণীর আসন্নকাল উপস্থিত হইল। বিশেষ কোন ব্যাধির লক্ষণ দৃষ্ট না হইলেও, তিনি ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা অনুমান করিয়া সকলকে সতর্ক করিতে লাগিলেন। একদিন মাতা পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, বাবা! আমি যে কয়দিন বাঁচিব, তোমরা আমাকে কৃষ্ণ নাম এবং কৃষ্ণ কথা শুনাও। মাতাঠাকুরাণীর আজ্ঞানুক্রমে কিশোরী বাবু হেমলতাকে লইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ শুনাইতে আরম্ভ করিলেন এবং রমণী, রাধাপদকে লইয়া তাঁহার নিকট শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেন।

অল্প কয়েক দিবসের মধ্যে হরমোহিনী ঠাকুরাণী দেহত্যাগ করিলেন। প্রাপ্তিকালে কিশোরী বাবুর হাত ধরিয়া কহিয়া গেলেন, "হেমলতার বিয়ের জন্য যেন তোমরা ভাবিও না।"

অতীব সমারোহের সহিত কিশোরী বাবু মাতৃশ্রাদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তদুপলক্ষে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিশোরী বাবুর আলয়ে আগমন পূর্ব্বক উৎসব সম্পাদন বিষয়ে যথাযোগ্য সহায়তা করিয়া শোকমুহ্যমান পরিবারের প্রভূত কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছিলেন। কয়দিবস কিশোরী বাবুর পরিবার দুঃখে ম্রিয়মাণ রহিলেন। কিন্তু দুঃখ বা কষ্ট চিরদিন থাকে না। দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ উক্ত পরিবার পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইলেন।

এদিকে ভক্তিগ্রন্থপাঠে হেমলতার প্রগাঢ়তর অভিনিবেশ দৃষ্ট হইল। দাদাদের সহিত হেমলতা প্রত্যহ বিকালবেলা ভক্তি এবং প্রেম বিষয়ে আলোচনা করে। রমণী এবং রাধাপদ হেমলতার সূক্ষ্মানুভূতি পরিচালনায় আশ্চর্য্য হইতে লাগিল। একদিন বৈকালবেলা রমণী, রাধাপদ এবং হেমলতা তিন জনে উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কথোপকথন করিতেছে,—

হে। দাদা! আজ আমরা কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া জীবনে তদনুযায়ী চলিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইব।

রমণী এবং রাধাপদ বিস্মিতভাবে কহিল, কোন বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত?

হে। আমরা অনেক সময়ে তাহার সম্বন্ধে বলা কহা করিয়াছি, কিন্তু জীবনে তদনুযায়ী চলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিতেছি না। কিন্তু শিথিলতাপ্রযুক্ত যতই এই বিষয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিয়া লইতে কালবিলম্ব করিব, ততই ক্রমশঃ সেই তত্ত্ব অনুশীলন করা কষ্টসাধ্য হইবে।

র। কি তাহা হেমলতা! বল।

হে। এই যে এখন আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতেছি, এই

ভালবাসা কি আমরা যতদিন এই পৃথিবীতে থাকিব, ততদিনের জন্য, না পরজগতেও আমরা আবার এইরূপ পরস্পর ভালবাসিতে পারিব ?

র। আমাদের ইচ্ছা আমরা চিরদিন একত্রে এইরূপ ভালবাসার সহিত যাপন করি।

হে। কিন্তু এই ইচ্ছা ত আকাশ-কুসুমের ন্যায়। এই ঠাঁকুর-মা, এ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, আমরা কি কেহ বলিতে পারি, এখন তিনি কোথায় ? আর তিনি আমাদের এখনও পূর্ব্বেকার মত ভালবাসেন ? এবং তাঁহার প্রতি আমাদেরও সেইরূপ ভক্তি আছে ? অতএব নিরূপণ করিতে হইবে, কিরূপে চিরদিন আমরা ভালবাসার সহিত একত্রে কাটাইতে পারি।

র। হেমলতা ! তুমিই তাহার উপায় স্থির কর।

হে। এই সংসারের ভালবাসা ত দুইদিনের জন্য। আজ কেহ মরিয়া গেল, সাংসারিক হিসাবে যাহারা তাহাকে ভালবাসে, তাহারা দুই চারি দিন কাঁদিল ; আবার যেমন তেমনি, আবার সেই হাসি,—সেই আমোদ। এই ঠাকুর-মা চলিয়া যাওয়াতে আমরা দুই চারিদিন দুঃখ করিলাম, এখন আর কি আমরা সেইরূপ দুঃখ করিয়া থাকি ? আর কয়দিবস পরে ঠাকুর-মা বলিয়া বাড়ীতে কেহ ছিল, বোধ হয় এ কথাও আমরা ভুলিয়া যাইব। এই ত সংসারের ভালবাসা। এই ভালবাসা অতিরিক্ত যদি আর কোন প্রকৃত ভালবাসা থাকে, যাহার বন্ধন আর কখনও ছিন্ন হয় না, যাহা হইলে আর পরস্পর বিরহ হয় না, যদি হয় তবে সেই বিরহে প্রাণ যায় ; পরস্পর এরূপ ভালবাসা হইলে তবে আমরা চিরদিন মহানন্দের সহিত একত্র যাপন করিতে পারি।

র। সেই ভালবাসার রাজ্য কোথায় ? যেখানে স্বার্থভাব নাই। এই সংসারের ভালবাসা ত স্বার্থসুখসম্বন্ধে। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই,

বন্ধু এই যে সংসারের সম্বন্ধ,—এই হইতেছে, এই ফুরাইতেছে। এ স্থলে বুঝা যায়, এই সংসারের যাবতীয় সম্বন্ধ অনিত্য এবং সেই সকল সম্বন্ধজনিত যে ভালবাসা তাহাও অনিত্য, দুইদিনের জন্য।

হে। কেন এই সংসারের ভালবাসা অনিত্য? কেবল স্বার্থভাব পরিপূর্ণ বলিয়া। আমি আত্মসুখবশবর্ত্তী হইয়া বাবাকে ভালবাসি, মাকে ভালবাসি, দাদাকে ভালবাসি। যদি তাহা না হইবে বাবায় আমায় সম্বন্ধ দুইদিনের জন্য কেমন করিয়া হয়? আত্মসুখলালায়িত আমি আজ বাবাকে ভালবাসিতেছি; কেন? বাবা আমায় কত যত্ন করিয়া লালন করেন। দাদাকে ভালবাসিতেছি, দাদা আমায় ভালবাসিয়া কত কি শিখাইয়া দেন। সংসারের ভালবাসা আত্মসুখবাসনা-প্রেরিত, তাই এই আছে,—এই নাই। যেখানে আত্মসুখবাসনার পূর্ণ ভোগ, সেইখানে পূর্ণ সম্বন্ধ,—পূর্ণ ভালবাসা দেখাইতে যাই।

রা। তবে প্রকৃত ভালবাসা কোথাও কি নাই?

হে। এ কথা মনে করিতে কই প্রাণ চায় না। স্বতঃই মনে হয়, আত্মসুখতাৎপর্য্যশূন্য প্রকৃত ভালবাসা আছে, সেই ভালবাসার এক মহান্ রাজ্য আছে। সেখানে একজনকে সকলে ভালবাসিয়া, একজনকে সুখী করিয়া সুখী হয়। সেখানে সমস্ত ভালবাসাময়। সে দেশের লতা-পাতা, ফল-মূল সকলের ভালবাসায় জন্ম, সকলে ভালবাসায় বর্দ্ধিত। সেই দেশের পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু—সকলের ভালবাসা প্রাণ। সেই দেশে যে সূর্য্য উঠে, যে চন্দ্র কিরণ দেয়—সকলে ভালবাসার কিঙ্কর। সেই দেশের সমীরণ ভালবাসা বহন করে। সেই দেশের নদীতে ভালবাসার স্রোত বহে। সেই দেশের রাজা ভালবাসা, রাণী ভালবাসা, পিতা-মাতা, দাস-দাসী, সখা-সখী সকলে নিজ নিজ সম্বন্ধ অনুযায়ী সেবা করিয়া সুখ দেয়, রাজা সেবা গ্রহণ করিয়া সকলকে সুখী করেন। চল দাদা! আমরা

এই দেশের অনিত্য সম্বন্ধ, আত্মসুখতাৎপর্য্যময়ী ভালবাসা ভুলিয়া সেই দেশের ভালবাসায় দীক্ষিত হই।

ক্ষণকালের মধ্যে সহসা সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব নূতন অনুভবের স্রোত বহিয়া গেল। সকলে প্রত্যেক কথানুযায়ী রূপ যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিল। কিয়ৎকাল পরে রমণী কহিল, কি উপায়ে এই মঙ্গলময় ভালবাসায় দীক্ষিত হওয়া যায় ?

হে। এখন হইতে এস আত্মসুখবাসনা ত্যাগ করিতে যত্ন করি। আত্মসুখ-বাসনাই সেই রাজ্য-প্রবেশের মূল অন্তরায়।

র। কি উপায়ে আত্মসুখবাসনা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় ?

হে। সেই প্রেম-রাজ্যের যিনি রাজা, যিনি রাণী, তাঁহাদের নাম কর; তাঁহাদের নামে আত্মসুখবাসনারূপিনী পিশাচী পলাইয়া যাইবে।

র। সেই নাম কি ?

হে। "হরে কৃষ্ণ"—বলিয়া হেমলতা আর বলিতে পারিল না। দেহ অবশ হইয়া ভূমিতে পড়িবে, এমন সময় রমণী অতি সন্তর্পণে ধরিল। হেমলতার অঙ্গ পুলকাবৃত, নয়নে অশ্রুধারা, মধ্যে মধ্যে দেহলতা ঈষৎ কাঁপিতেছে। রাধাপদ হেমলতার কর্ণে কহিল—"হরে কৃষ্ণ"। বলিতে বলিতে রাধাপদ আর অশ্রু সম্বরণ করিতে সমর্থ হইল না। সকলেই কাঁদিতে লাগিল। অল্পকাল পরে হেমলতা চৈতন্যলাভ করিয়া কহিল, "হরে কৃষ্ণ"। অমৃতের প্রবাহ ছুটিল। রমণী কহিল,—"হরে কৃষ্ণ"।

ভালবাসায় প্রাণ-মন হরণ করেন বলিয়া 'হরি'। ভালবাসায় সকলকে আপনার নিকট আকর্ষণ করেন বলিয়া 'কৃষ্ণ'। আর রমণ করেন বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম 'রাম'। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ অপ্রাকৃত চিন্ময় পঞ্চতত্ত্বের আকরস্বরূপ অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য-সম্পন্ন হরি-কৃষ্ণ রাম ভক্তের চক্ষু, রসনা, কর্ণ, ত্বক এবং নাসিকাদ্বারে নিরন্তর রমণ করিয়া তাহাদিগকে

নিত্য নব নব আনন্দে মাতোয়ারা করিতেছেন। কৃষ্ণ প্রেমময়, তাঁহার সহিতই আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ। এস দাদা! আজ তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া আমরা পরস্পর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে চিরদিনের মত আবদ্ধ হই। এ জীবন অন্তে আমরা সেই রাজ্যে নীত হইয়া অনন্ত কালের জন্য একত্র থাকিব, একত্র থাকিয়া সেই প্রেমময় প্রেমময়ীর সেবা করিব।

এইরূপ অপূর্ব্ব আলাপনে সকলে বিভোর; এমন সময় ব্রজসুন্দরী একজন কিঙ্করী দ্বারা সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মাতার আহ্বানে সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কিশোরী বাবুর ভ্রমণে বহির্গমন।

ভট্টাচার্য্য-তনয়া গৌরপ্রিয়াকে দেখা অবধি রাধাপদর প্রায়ই তাহাকে মনে পড়ে এবং গৌরপ্রিয়াকে মনে হইবার কালে কোন অননুভূতপূর্ব্ব ভাব তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। সুশীল সরলমতি রাধাপদ প্রথম কিছু বুঝিতে না পারিয়া নিজ মনোভাবকে কেবল উপেক্ষামাত্র করিত। কিন্তু ক্রমে এরূপ ঘটিল, কোন নির্জ্জন স্থানে একাকী বসিবামাত্র গৌরপ্রিয়ার অপরূপ সুষমামণ্ডিত মূর্ত্তিখানি আলেখ্য সদৃশ ধীরে ধীরে রাধাপদর মানসপথে দণ্ডায়মান হয়। তখন রাধাপদ আর কিছু দেখিতে পায় না, আর কোন বিষয় ভাবিতে পারে না। চিত্তের এরূপ অবস্থায় একদিন রাধাপদ স্বীয় প্রকোষ্ঠে বসিয়া ভাবিতেছে,—আমার একি হইল! গৌরপ্রিয়াকে আমার এত মনে পড়ে কেন? আর তাহাকে মনে হইবামাত্র আমি যেন তন্ময় হইয়া যাই, আর কিছু ভাবিতে পারি না, আর আমার বাহ্য জ্ঞান থাকে না। রমণী দাদা, হেমলতা আমার এরূপ অবস্থা একদিন দেখিলে কি মনে করিবে? রমণী-দাদা এবং হেমলতাকে আমার মানসিক অবস্থার কথা বলা ভাল। তাহারা দুইজনে আমাকে কত ভালবাসে,— আমি কিরূপেই বা এই কথা বলি। * * * গৌরপ্রিয়াকে আমার এত মনে আসে কেন? আমার মন কি গৌরপ্রিয়াকে চায়? গৌরপ্রিয়াকে মন কেন চাহিবে? তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমি না বুঝিয়া এতদিন মনকে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমার মনের ভাব কখনও সঙ্গত নয়।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাধাপদর চিত্ত অবসন্ন হইবামাত্র নিদ্রাদেবী চিন্তাক্লান্ত সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। রাধাপদর হৃদয়সমুদ্রে যে চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা এখন গম্ভীর শান্তভাব অবলম্বন করিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের অভিনয়-ক্ষেত্র হইল। একটী মণিময় মন্দির; তাহার এক অংশে শ্রীরাধা-শ্রীরাধারমণ; অপর অংশে শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ; গৌরপ্রিয়া এবং রাধাপদ উভয়ে মিলিত হইয়া তাঁহাদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহাদের সহিত পরস্পরের নিত্য প্রীতি-সম্বন্ধ হেতু পরস্পর ভালবাসা-সূত্রে নিত্য আবদ্ধ। মুহূর্ত্তের মধ্যে অভিনয় সম্পাদিত হইয়া গেল। রাধাপদ জাগরিত হইল, এখন আর হৃদয়ে কোন তরঙ্গ নাই, তাহা গম্ভীর,—বিক্ষেপ শূন্য। স্বপ্নদৃশ্য প্রত্যক্ষের সদৃশ হৃদয় অধিকার করিয়া আছে।

অপরাহ্ন ৫টা। কিশোরী বাবু প্রত্যহ এই সময়ে পুত্র-কন্যা সহিত বেড়াইতে বাহির হন্। রমণী রাধাপদর বিলম্ব দর্শনে তাহার প্রকোষ্ঠে আসিয়া দেখিল, ভ্রাতা অর্দ্ধশয়ানভাবে একখানি শোফার উপরি বিশ্রাম করিতেছেন। রমণী রাধাপদর মুখের দিকে তাকাইয়া কিছু সন্দেহ করিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

র। চল, বেড়াইতে যাইবে না?

রা। দাদা! আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন বড় আলস্য বোধ হইতেছে।

র। বেড়াইলেই সব সারিয়া যাইবে—উঠ।

এই বলিয়া রমণী রাধাপদর হস্ত ধরিয়া তাহাকে উঠাইল। মুখ প্রক্ষালন করিতে বলিয়া রাধাপদর কাপড়, জামা, চাদর গোছাইয়া দিল।

রা। আমি লইতেছি, তোমার এরূপ করা ভাল নয়।

র। তোমার শরীর খারাপ, আমি আর কি অন্যায় করিতেছি।

রা। না দাদা! তুমি ও-সব রাখিয়া দাও, আমি লইতেছি।

রমণী রাধাপদর কথা শুনিল না, রাধাপদ কাপড় পরিতে লাগিল, রমণী এক একখানি করিয়া রাধাপদর নিকট দিল।

এমন সময় হাস্য-বদনা হেমলতা আসিয়া কহিল, দাদা! আমিও তোমাদের সহিত আজ বেড়াইতে যাইব।

র। তুমি আর কতদিন আমাদের সঙ্গে বেড়াইবে হেমলতা!

হে। দাদা! আপনাদের আজ বাহির হইতেই সন্ধ্যা হইবে; সন্ধ্যার পর আপনাদের সহিত আমার বেড়াইতে দোষ কি?

র। আমি কি সেই কথা বলিলাম।

হে। যা' হ'ক আজ বেড়াইতে যাইবার সম্বন্ধে কোন আপত্তি নাই ত?

র। আমার আপত্তি কিরূপে হইতে পারে?

হে। আমি বেড়াইতে যাইব না, আপনারা যান্।

এই বলিয়া হেমলতা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় রমণীর মুখে আর কথা সরিতেছে না। হঠাৎ যে হেমলতা রাগ করিবে, ইহা রমণী ভাবে নাই। এমন সময় রাধাপদ ডাকিল, হেমলতা! গমনোদ্যতা অভিমানিনী হেমলতা অবনতমুখী হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। রাধাপদ কহিল, হেমলতা! এত সামান্য কথায় তোমার রাগ হইল! হেমলতা কোন উত্তর করিল না।

রা। চল, বেড়াইতে যাই।

হে। আমার বেড়াইতে যাইবার দরকার নাই।

রা। এই বলিলে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইব', আবার

বলিতেছ 'দরকার নাই'। ছিঃ! রাগ করে না, রমণী দাদা তোমায় কত ভালবাসে।

হে। তাঁহারই কথামত আমি বেড়াইতে যাইতেছি না।

রা। দাদা সে ভাবে তোমায় কিছু বলেন নাই। দাদার মনের ভাব, আজ তুমি আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেছ, আর কিছুকাল পরে তুমি ত আমাদের সহিত এরূপ করিয়া বেড়াইতে যাইতে পারিবে না। তাই দাদা বলিয়াছেন, 'আর কতদিন আমাদের সহিত বেড়াইবে'। রাধাপদর বুঝাইবার কৌশলে হেমলতার অন্তর হইতে অভিমান দূরীভূত হইলেও সহসা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কহিল, আমার বেড়াইতে যাইবার কথা উঠানই অন্যায় হইয়াছে, আমায় ক্ষমা কর।

রা। তুমি না বেড়াইতে যাইলে দাদা দুঃখ পাইবেন।

হে। কেন? আমার বেড়াইতে যাওয়ার বিষয়ে তাঁহার আপত্তি বা অনাপত্তি না হইতে পারিলে, দুঃখ বা সুখ কিরূপে হইবে?

রা। এ কথার উত্তর দাদা দিবেন।

র। দেখ রাধাপদ, আমি কি বলিতে কি বলিয়াছি, তোমরা তাহার কতরূপ অর্থ করিয়া বৃথা অভিমান করিতেছ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সকল সময় আর কথা কহিব না।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, কিশোরী বাবু তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। রাধাপদ হেমলতার হাত ধরিয়া কহিল, এ কথার মীমাংসা পরে হইবে, এখন চল দেরী হইতেছে। হেমলতা আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। সকলে সুসজ্জিত হইয়া কিশোরী বাবুর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

ভাদ্রমাস। ৫।৬ দিবস বৃষ্টি হয় নাই, আকাশ বেশ পরিষ্কার। সুরধুনী কল কল নিনাদে উত্তাল-তরঙ্গে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছেন।

মৃদুমন্দ অনিল জাহ্নবীর পূতঃ সলিলে অভিস্নাত হইয়া বিবিধ কুসুম-বিকসিত উদ্যান মধ্য হইতে সৌগন্ধ চয়ন পূর্ব্বক সৌভাগ্যশালী মানবগণকে উপহার দিতেছে। বিহঙ্গকুল মহানন্দে সায়ংকালীন সঙ্গীতরস আলাপন করিতেছে। বৃক্ষলতা সমূহ ধ্যানমগ্নাবস্থ হইলেও জ্যোৎস্নালোকে তাহাদিগকে কম্পিত ও পুলকিত হইতে দেখা যাইতেছে।

কিশোরী বাবুর শকট অনতিকালমধ্যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজপথাবলম্বনে একটী নির্জ্জন মনোরম স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। পদচারণ করিবার অভিপ্রায়ে সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। সকলেই প্রফুল্লহৃদয়, কেবল রমণী গম্ভীর-চিত্ত। কোন সুন্দর দৃশ্য দর্শনে রমণীর মহাপুরুষকে মনে হয়, আর প্রফুল্লতা থাকে না। প্রফুল্লতা এবং গাম্ভীর্য্য চিত্তের এই উভয় অবস্থা, কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ এই বিচার সম্প্রতি নিষ্প্রয়োজন। তবে রমণীর সম্বন্ধে গাম্ভীর্য্যভাব হিতকরী। কেননা, রমণীর জীবনে বিধাতা পার্থিব সুখ লিখেন নাই। অধিকন্তু তাহার কথায় আজ হেমলতা অভিমান করিয়াছিল, ইহা রমণী এখনও পর্য্যন্ত ভুলিতে পারে নাই। হেমলতা কিন্তু সমুদয় ঘটনা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে। জাহ্নবীতীরবর্ত্তী প্রকৃতির সৌন্দর-সম্ভার দর্শনে হেমলতার মনে কত ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা কে বর্ণনা করিতে সমর্থ? রাধাপদ স্বীয় হৃদয়ের নূতন সুখময় তরঙ্গে কখনও ভাসিতেছে,—কখনও ডুবিতেছে। সহসা হেমলতা জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! প্রকৃতির এই মনোমোহন সৌন্দর্য্য কি ভাবে আমাদের আস্বাদন করিতে হইবে এবং প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যের সহিত আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ কি?

কি। রমণী এই প্রশ্নের উত্তর দিবে।

র। আমি হেমলতার প্রশ্নের কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কি। কোন স্থানে বুঝ নাই?

র। শব্দগুলি বুঝিয়াছি, হেমলতা কি ভাবে প্রশ্ন করিল, বুঝিলাম না।

কি। তুমি আছ এবং স্বভাবের এই মনোমুগ্ধকারী-সৌন্দর্য্য আছে, তোমার সহিত স্বভাব-সৌন্দর্য্যের কিরূপ সম্বন্ধ? স্বভাব-সৌন্দর্য্য-দর্শন কেন তোমার চিত্তোল্লাসের কারণ হয়?

র। সহসা এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

কি। রাধাপদ! তুমি হেমলতার প্রশ্নের উত্তর দাও।

রা। দাদা পারিলেন না, আমিও পারিব না।

কি। স্বভাবের এই মনোরম সৌন্দর্য্য শ্রীভগবানের শক্তি-বিভূতি। আমরা তাঁহার নিত্যদাস। প্রভুর শক্তি বিভূতি দর্শনে দাসের আনন্দ স্বাভাবিক। পরন্তু শ্রীভগবদ্দাস্য ভুলিয়া যদি স্বতন্ত্রভাবে আমরা এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের ভোক্তাভিমান আসিল। শ্রীভগবান শক্তিমান এবং আমরা তাঁহার শক্তি, তিনি প্রভু আমরা দাস, এই নিত্য সম্বন্ধ ভুলিয়া স্বতন্ত্ররূপে ভোগ করিবার অভিপ্রায়ের নাম কাম। এই কামই জীবের প্রধান রিপু, যাবতীয় কষ্ট যন্ত্রণার মূল হেতু। এই কাম আমাদের সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়, এবং ভগবদ্দাস্য স্মৃতিই অনুশীলনীয়। এই সৌন্দর্য্য দর্শনে দাসের যদি প্রভুর স্মৃতি না হইল, তবে এই দর্শন কেবলমাত্র অনর্থের কারণ হইবে।

র। কামের স্বরূপ বুঝিলাম, প্রেম কাহাকে বলে?

কি। শ্রীভগবানের সম্বন্ধে যে মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ-ভাব, তাহার নাম প্রেম। যদি কেহ কহেন, শ্রীভগবান আমা হইতে কত দূরে তাঁহাকে আমি কখনও দেখি নাই, তাঁহার প্রতি আমার আকর্ষণ কিরূপে হইবে?

সেই ব্যক্তিই নিতান্ত অনুভব-বিহীন। কেননা, শ্রীভগবান আমাদের যত নিকট আছেন, এরূপ কেহ নহেন, তাঁহাকে আমরা যত দেখিতেছি এরূপ আর কাহাকেও দেখিতেছি না। এই ক্ষণেই শান্ত হইয়া বস, সমস্ত পার্থিব চিন্তা মন হইতে অপসৃত হইয়া যাউক, দেখিবে তিনি আমাদের হৃদয় সিংহাসনে বসিয়া আছেন। এই সৌন্দর্য্য দেখিতেছ, এই সৌন্দর্য্য কাহার? এই সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহারই সৌন্দর্য্য দেখা হইতেছে। আমরা এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখিতেছি, তৎসমুদয়ই তাঁহার শক্তির প্রকাশ। আর তাঁহাকে দেখিতে বাকি রহিল কি? আমরা নিরন্তর তাঁহাকেই দেখিতেছি। তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলে তাঁহাকে দেখা যাইবে কিরূপে? তাঁহাকে মনে হইলেই তাঁহাকে দেখা যায়। যখন এক মাত্র তিনিই আমাদের প্রাণের, স্মরণের, প্রীতির বিষয় হইবেন, তখন সর্ব্বদা আমরা তাঁহাকে দেখিব, ভাবিব, সেবা করিবার জন্য লোলুপ হইব। যে মুহূর্ত্তে আমরা তাঁহার স্মরণ হারা হইব, সেই মুহূর্ত্তে আমরা স্বতন্ত্র ভোগাভিলাষী। আরও তাঁহার প্রতি আমাদের আকর্ষণ-ভাব নিত্য আছেই। তবে স্বতন্ত্র হইবামাত্র আমরা সেই ভাব বিস্মৃত হই।

র। সেদিন পাঠের সময় কাম ও প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছিল। আজ তাহা আরও পরিস্ফুট হইল।

কি। হেমলতা! তোমার মনের ভাব কি বল?

হে। আমি বুঝিতে চাহিয়াছিলাম, প্রশ্নের পরিষ্কার মীমাংসা হইয়াছে।

কিন্তু স্বভাব-সৌন্দর্য্য-দর্শনে হেমলতার মনে যে ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে তাহার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হওয়া একান্ত অসম্ভব। তবে সিদ্ধান্ত-পক্ষে কিশোরী বাবু হেমলতার প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা করিয়াছেন।

কিশোরী বাবু ঘড়ি দেখিলেন, রাত্রি ৮টা। আর কালবিলম্ব না করিয়া কিশোরী বাবু, রমণী, রাধাপদ ও হেমলতা গাড়ীতে উপবিষ্ট হইলেন। অনতিকালমধ্যে অশ্বযান রাধারমণ-কুঞ্জের ফটক অতিক্রম পূর্ব্বক গাড়িবারাণ্ডার ভিতর প্রবেশ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পিসীমার লীলাভিনিবেশ।

নিষ্ঠাবতী হরিনাম-পরায়ণা পিসীমাকে পাণিহাটী গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ভক্তি করেন। যদিও পিসীমা কাহারও সহিত অধিক আলাপ বা ব্যবহার করেন না, তথাপি তাঁহার পবিত্র উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শনে সকলেরই চিত্ত ভক্তিরসে বিগলিত হয়। পিসীমার হৃদয় প্রেমরসে উচ্ছ্বলিত হইলেও তিনি হৃদয়ভাব সংগোপন করিতে ভালবাসেন। অভিজ্ঞ মহাজন উপদেশ করিয়াছেন, "রাখ প্রেম হৃদয় ভরিয়া"। বস্তুতঃ শ্রীভগবান সম্বন্ধীয় মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা বিশিষ্ট-সাধকগণেও দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ, সংসারে ইতর সম্বন্ধের আধিপত্যহেতু তাহার নিকট ভগবৎ সম্বন্ধ গোপনীয়। ভগবৎ সম্বন্ধীয় স্বজাতীয় আশয়-সম্পন্ন মনের মানুষ সংসারে কাহার ভাগ্যে কয়টী মিলে? মনের ভাব মনের মানুষ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত করায় কোন ফল নাই, বরং তদ্বিপরীতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। যে কোন কারণেই হউক পিসীমা অদ্যাবধি কাহারও সহিত মন খুলিয়া আলাপ করেন নাই বা করিবার সুযোগ পান নাই। তিনি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ মধ্যে নিরন্তর হরিনামরসে নিমজ্জিত থাকেন। কিন্তু সেই নামরস-সমুদ্রে ক্রমশঃ ভাবের তরঙ্গ দৃষ্ট হইল, অনন্ত লহরী পিসীমাকে নাচাইতে লাগিল—ডুবাইতে লাগিল। এই অবস্থায় আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়া পিসীমার আর ভাব-সঙ্গোপনের ক্ষমতা থাকিল না।

একদিন পিসীমার প্রাতঃস্নান করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সুশীলা একবার অন্তরাল হইতে তাঁহাকে দেখিয়া গেলেন, পিসীমা মালা হাতে করিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন। সুশীলা পিসীমার অবস্থা সন্দর্শনে আর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিৎ মনে করিলেন না। বেলা ৬ দণ্ড অতিবাহিত হইয়া গেল। গৌরপ্রিয়া গৌরাঙ্গ-গলায় মালা পরাইতেছে। সুশীলা এমন সময়ে ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, 'মা! রসুই ত হইয়া এল'।

গৌ। হাঁ মা! ঠাকুর-মা আজ ঘর হইতে এখনও পর্য্যন্ত বাহির হন নাই কেন?

সু। আমি তাঁহার দরজার ছিদ্র দিয়া দেখিলাম, তিনি নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন।

গৌ। মা! তবে আমি একবার ঠাকুর-মাকে দেখিয়া আসি।

এই বলিয়া গৌরপ্রিয়া নিতাই-গৌরাঙ্গ-গলায় কুসুম মালা পরাইয়া দিয়াই, ঠাকুর-মার ঘরের জানালায় মুখ রাখিয়া দেখিল, ঠাকুর-মা আসনোপরি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, দু-নয়নে অশ্রু বহিতেছে। গৌরপ্রিয়া ডাকিল,—ঠাকুর-মা! তুমি আজ বুঝি ঘরের দরজা আর খুলিবে না।

পি। কেন, ঘরের দরজা কি খোলা নাই, আমি ত স্নান করিয়া আসিলাম।

গৌ। (দরজায় আঘাত করিয়া) কই দরজা ত খোলা নাই; তুমি কখন স্নান করিয়া আসিলে?

দরজা মুক্ত নাই অবগত হইয়া ঠাকুর-মা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। গৌরপ্রিয়া দেখিল, ঠাকুর-মার চক্ষু দুইটী লালবর্ণ, সমুদয় শরীর এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে ঢলিয়া পড়িতেছে। গৌরপ্রিয়ার দর্শনে পিসীমার ভাব-সমুদ্রে আরও তরঙ্গ উঠিল। ঠাকুর-মা নাতিনীর প্রফুল্ল গণ্ডে স্নেহ-চুম্বন

করিয়া বলিলেন, "তুই নিতাই-গৌরাঙ্গ-গলায় মালা পরাইতেছিলি, আমি দেখিতে দেখিতে সব ভুলিয়া গিয়াছি।"

গৌ। আমি নিতাই-গৌরাঙ্গ-গলায় মালা পরাইয়াছি, তুমি ঘরের মধ্যে বসিয়া কি করিয়া দেখিলে?

পি। আমি তোর নিতাই-গৌর সেবা রোজ দেখি, তুই ত সবদিন মালা পরাইয়া থাকিস্।

গৌ। দুই একদিন নূতন নূতন তুমি আমার সেবা দেখিয়াছ, রোজ রোজ তুমি ত দেখ না।

পি। আমি ত রোজ তোমার সেবা দেখি বলিয়া মনে হয়। আমার মনের কিছু ঠিক নাই, বুড়ো হইয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস করিতে গেলে আর চলে না।

গৌরপ্রিয়া ঠাকুর-মার মনের অবস্থা বুঝিল। বুঝিবে না কেন? গৌরপ্রিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিত্য পাঠিকা।

গৌ। না ঠাকুর-মা! তুমি মনের কথা গোপন করিতেছ। আমায় বল, ভোর হইতে তুমি কি ভাবিতেছ।

পি। আমার কি কিছু ভাবিবার ক্ষমতা আছে? ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলে মালা লইয়া বসি। হরিনাম করিতে করিতে কত যে তরঙ্গ আপনা আপনি মনে আসিয়া খেলিতে থাকে, আমি কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া তাহাতে ভাসিয়া যাই।

গৌ। আজ কি ভাব আসিয়াছিল ঠাকুর-মা?

পি। আমার সকল ঘটনা বলিবার ক্ষমতা নাই।

গৌ। আচ্ছা ঠাকুর-মা! তুমি ত স্নান কর নাই, তবে বলিলে কেন, 'আমি ত স্নান করিয়া আসিলাম'?

পি। হরিনাম করিতে করিতে দেখিতেছি, নিতাই-গৌর সপার্ষদে

নদীয়ার ঘাটে স্নান করিতেছেন, আমিও স্নান করিতে গিয়াছি ; তাই ভুলিয়া তোমার কাছে বলিয়াছি, 'আমি স্নান করিয়া আসিয়াছি'। আমি বুড়ো মানুষ, কখন কি বলি তার ঠিক নাই।

গৌরপ্রিয়া ঠাকুর-মাকে আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কহিল, চল ঠাকুর-মা ! তোমায় স্নান করাইয়া লইয়া আসি।

পি। তোমার আর যাইতে হইবে না, এই আমি স্নান করিয়া আসিতেছি।

গাত্র মার্জ্জনী এবং একটি জল পাত্র লইয়া পিসীমা স্নান করিবার নিমিত্ত চলিলেন। গৌরপ্রিয়া, স্নানান্তে ঠাকুরমার পরিধানের জন্য একখানি পট্টবস্ত্র লইয়া পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। যাইবার সময় সুধাকে (পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা সদ্গোপবালা) পিসীমার ঘর পরিষ্কার করিতে বলিয়া গেল।

গঙ্গার ঘাটটী নির্জ্জন ; ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর সম্মুখস্থ ঘাট বাঁধান নহে। তবে তদীয় ছাত্রগণ বৃক্ষের মোটা মোটা শাখা প্রশাখা দ্বারা এরূপ ভাবে সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন যে, গঙ্গায় অবতরণ করিতে কাহারও কোনরূপ ক্লেশ বা বিপদ হইবার আশঙ্কা নাই। পিসীমা স্নান করিবার পূর্ব্বে জাহ্নবী দেবীকে সভক্তি প্রণাম করিয়া পুণ্য-সলিল স্পর্শ পূর্ব্বক জলে অবগাহন করিলেন।

গৌ। আচ্ছা ঠাকুর-মা ! নিতাই-গৌর তোমার কে হয় ?

পি। আমি পতিত, নিতাই-গৌর পতিতপাবন।

গৌ। তার পর।

পি। তার পর আমি আর জানি না ভাই।

গৌ। তুমি জান ঠাকুর-মা ! বলিতেছ না। আমাকে তুমি ভাল বাসিলে বলিতে।

পি। আমি কি ভালবাসা জানি ভাই! নিতাই-গৌর ভালবাসা জানে। তুইত নিতাই গৌরকে ভালবাসিস্, তুইও জানিস্। আমি জানি না।

গৌ। না ঠাকুর-মা! তুমি গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিও না। তুমি নিতাই-গৌরকে বড় ভালবাস।

পি। আমি ভালবাসিনে—বলিতে বলিতে ঠাকুর-মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভাই! আমাকে আর ওকথা জিজ্ঞাসা করিস্ না তাঁহারা আমায় কৃপা করিয়া ভালবাসেন কিন্তু আমার তাঁহাদের চরণে একবিন্দু ভক্তি নাই।

গৌ। দেখ ঠাকুর-মা! তুমি কাঁদিও না, তাহা হইলে আমার নিতাই গৌর কাঁদিবে, আর তাহাদের খাওয়া হইবে না।

পি। কই, আমিত কাঁদি নাই। আমি কাঁদিব কেন? নিতাই গৌরকে তুমি খাওয়াইতে যাও। তুমি আমার সহিত গল্প করিতেছ কেন?

গৌ। তোমার স্নান না হইলে নিতাই-গৌর খাইবে না।

পি। দুর পাগলি! তাকি হয়। তুই বড় দুষ্টু।

বলিতে বলিতে ভাব-বিহ্বলা কৃষ্ণভাবিনী অবগাহন করিয়া তীরে উঠিলেন। গৌরপ্রিয়া পট্টবস্ত্রখানি ঠাকুরমাকে পরিধান করিতে দিল। পিসীমা তিলক প্রণামাদি করিয়া গৌরপ্রিয়ার সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

সেদিন, অপরাহ্নে পিসীমা গৌরপ্রিয়ার দ্বারায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং সুশীলাকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমার মাথা আজকাল ক্রমশঃ বিকৃত হইতেছে, তোমরা সতর্ক থাকিও, আমি কোন্ দিন্ কি পাগলামি করিয়া ফেলিব।

সু। আমাদের আপনার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, বলিয়া দিন।

পি। আমার কোনরূপ অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে না পারিলে, বাহিরের কোন লোক ডাকিয়া আমার অবস্থা সম্বন্ধে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না; আমাকেও বাহিরে যাইতে দিও না। আর আমি যাহাদের দেখিতে চাহিব, তাহাদের সংবাদ দিয়া আনাইও। আর তোমরা কোনরূপ ভয় পাইও না। আমার কাছে যখন কেহ থাকিবে, তাহাকে আমায় নাম শুনাইতে বলিও।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও সুশীলা পিসীমার আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। তাঁহারা উভয়ে চলিয়া যাইলে গৌরপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর-মা! তোমার কি অবস্থা হইবে, আমরা বুঝিতে পারিব না।

পি। দেখ ভাই! জীবন বহিয়া গেল, নিতাই গৌর নামে রুচি হইল না। তাঁহারা এমন দয়াময়, পতিত উদ্ধার করিবার জন্য কাঙ্গাল বেশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রেম যাচিলেন, আমি গ্রহণ করিলাম না। আমার তাঁহাদের চরণে কৃতজ্ঞতা আসিল না। আমার কি গতি হইবে।

গৌরপ্রিয়া ঠাকুরমার আর্ত্তিশ্রবণে আর আত্মসংবরণ করিতে সমর্থ হইল না, কাঁদিয়া ফেলিল। গৌরপ্রিয়ার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর-মা নিরন্তর নামরসে বিভোর, তথাপি তাঁহার এই উৎকণ্ঠা—

এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন।

কিয়ৎকাল এইরূপ আলাপনে ঠাকুরমা ও নাতিনী মগ্ন থাকিলেন। স্বজাতীয় আশয়-সম্পন্ন লীলারস-লোলুপ দুইজনের মিলন কি মধুর দৃশ্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিমলার বাৎসল্য।

বিমলা কিশোরীবাবুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। কিশোরীবাবু হইতে বিমলা তিন বৎসরের বড়। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিমলার স্বামিবিয়োগ হয়। বিবাহের পর বিমলা একবারমাত্র শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন, সুতরাং বিমলার ভাগ্যে দাম্পত্য-প্রীতি উপভোগ ঘটে নাই। জামাতার মৃত্যুর পর বিমলার মাতাঠাকুরাণী আর কন্যাকে শ্বশুরালয়ে যাইতে দেন নাই। তিনি বিমলাকে শ্রীশ্রীরাধারমণসেবায় নিযুক্ত করিলেন এবং ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতে দিলেন। বিমলার শোকসন্তপ্ত-চিত্ত মাতৃস্নেহরসে অভিসিঞ্চিত হইয়া প্রশমিত হইল। বিমলার চিত্ত প্রশান্ত হইল বটে, কিন্তু আর প্রীতি-প্রবণ হইল না। বিমলার হৃদয় শুষ্ক-বৈরাগ্যময় হইয়া থাকিল। মাতাঠাকুরাণীর আজ্ঞাক্রমে বিমলা শ্রীশ্রীরাধারমণের ভোগের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জন, মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিতেন। বিমলা চিরদিন পাককুশলা বলিয়া প্রসিদ্ধা। শ্রীশ্রীরাধারমণ অভাগিনী বিমলার প্রতি করুণ-নয়নে চাহিলেন। শ্বশুর-কুলগুরু হইতে বিমলা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের কৃপায় সেই মন্ত্র বিমলার হৃদয়ে স্বরূপে আবির্ভূত হইলেন। বিমলার শুষ্ক বৈরাগ্যময় প্রাণে নবোজ্জ্বল অনুভবের স্রোত বহিল।

বিমলার এই হৃদয়ের পরিবর্ত্তনহেতু তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ব্যতীত আর কেহ অনুধাবন করিতে পারিলেন না। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইবার পর মহাপুরুষ বালক সঙ্গে কিশোরীবাবুর আলয়ে আগমন করিলেন। বালকের প্রতি বিমলার স্বাভাবিক স্নেহ-সঞ্চার, মহাপুরুষের

প্রতি সমগ্র পরিবারের অকৃত্রিম ভক্তি সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে ইতিপূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি।

দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বালক রমণী মহাপুরুষের সহিত কিশোরী বাবুর আলয়ে আসিয়া বিমলার স্নেহ এবং রাধাপদ ও হেমলতার সঙ্গলাভ করে। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে কিশোরী বাবুর গৃহে মহাপুরুষের আজ্ঞানুক্রমে রমণীর উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হয়। রাধাপদর উপনয়ন সংস্কার বিধিমতে যথাসময়ে সম্পন্ন হইয়াছিল। মহাপুরুষ বালককে বিমলার হস্তে সমর্পণ করিবার কালে কহিয়া দিলেন, "তুমি নির্লিপ্ত ভাবে এই বালকটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিও; ইহার দ্বারা শ্রীভগবান বহু লোকহিতকর কার্য্য করিবেন। বিমলা মহাপুরুষের আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক তাহা যথাবিহিত প্রতিপালন করিতে তৎপর হইলেন।

রমণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইলে পর, রমণীর পিতা মনে করিলেন, পুত্র পরিচিত কোন আত্মীয় ব্যক্তির বাটীতে গিয়াছে। কুমতি-গ্রস্ত স্ত্রৈন জনক স্বপ্নেও মনে করেন নাই, দ্বাদশ বৎসরের বালক গৃহ হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু আর্ত্ত অনাথ বালকের সহায় শ্রীভগবান বলিয়া কেহ আছেন, এ কথা তাঁহার মনে হয় নাই! দুই চারি দিন নির্দ্দয় পিতা পুত্রের কোন সন্ধান করিলেন না। পঞ্চম দিবসে আর থাকিতে না পারিয়া নিকটস্থ এবং দূরস্থ আত্মীয়স্বজনের গৃহে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু সকল অনুসন্ধান ব্যর্থ হইল। রমণীর পিতৃগৃহ হইতে রামকৃষ্ণপুর বহুদূর। যাহা হউক শ্রীভগবানের ইচ্ছায় পুত্রানুসন্ধান নিষ্ফল হইলে, রমণীর পিতার আত্মগ্লানি আসিয়া দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি বিরাগ জন্মিল। রমণীর গৃহত্যাগে রমণীর পিতৃপরিবার আর কোনকালে শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারিল না।

মহাপুরুষকে দর্শন করিবামাত্র রমণী যাবতীয় পূর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হইল

এবং এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অভিভূত হইয়া তাঁহার চরণে প্রাণ মন উপহার দিল। অল্প সময়ের মধ্যে বালক রমণী মহাপুরুষের প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল, যে তাহাকে কিশোরীবাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া যখন মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময়ে রমণীর মনে হইয়াছিল, এইমাত্র দেহে যে অভিনব প্রাণ আসিয়া সঞ্চারিত হইল, তাহা আবার আমাকে চিরদুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া ছাড়িয়া যাইতেছে। মহাপুরুষ গমন করিলে পর রমণী বহুদিন ম্রিয়মাণ রহিল।

বালক রমণী বিমলার স্নেহে এবং রাধাপদ ও হেমলতার ভালবাসায় ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইতে লাগিল। বিমলা মুখে মুখে রমণী, রাধাপদ এবং হেমলতাকে, "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" এবং "প্রার্থনা"র পদ [শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কৃত] শিক্ষা দিতেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনজনেই বিমলার নিকট হইতে অনেকগুলি পদ এবং শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। সন্ধ্যার পর তিনজনে ঠাকুর-মাকে সুন্দর সুন্দর পদ আবৃত্তি করিয়া শুনাইত। ঠাকুর-মা নাতি, নাতিনীর সুকোমলকণ্ঠে সুমধুর পদ শুনিয়া নয়নজলে ভাসিতেন।

বাল্যকাল হইতেই রাধাপদ এবং হেমলতার অনিবেদিত কোন বস্তু খাওয়ার অভ্যাস নাই। কেহ কোন বস্তু তাহাদিগকে ভোজন করিতে দিলে তাহারা 'ঠাকুরের ভোগ হইয়াছে কি না' জিজ্ঞাসা করে। রমণীকে বিমলা অনিবেদিত বস্তু আহার করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন ; তথাপি বালক অনভ্যাসবশতঃ মধ্যে মধ্যে বিমলার উপদেশ ভুলিয়া যায়। একদিন অপরাহ্ণ সময়ে রমণী বাগানে গিয়া দেখিল, গাছে অতি সুন্দর পিয়ারা পাকিয়া রহিয়াছে। কলমের গাছ, পিয়ারা সংগ্রহ করিতে কোনই আয়াস নাই। রমণী বিমলার উপদেশ ভুলিয়া যাইল। অবিচারিত-চিত্তে বালক একটী ফল বৃন্ত হইতে সন্তর্পণে উন্মোচন পূর্ব্বক বৃক্ষান্তরালে যাইয়া ভোজন

করিতে তৎপর হইল। বিমলা দ্বিতল প্রকোষ্ঠ হইতে বালকের আচরণ দর্শনে মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, তাহাকে শাসন করিতে হইবে। কিয়ৎকাল পরে রমণী নিকটে আসিলে পর বিমলা গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বালকের সহিত কোন কথা বলিলেন না। মায়ের এবম্বিধ ভাব দর্শনে রমণী ভীত হইল এবং স্বীয় অন্যায় আচরণ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদিতেছ কেন?" বালক বিমলার কথায় আর কি উত্তর দিবে, কেবল পাণিতল দ্বারা নয়নদ্বয় মার্জ্জন করিতে থাকিল।

বি। তোমায় কেহ কিছু বলিয়াছে?

র। না।

বি। তবে শুধু শুধু কাঁদ কেন?

র। আমি অন্যায় করিয়াছি।

বি। কি অন্যায় করিয়াছ?

র। বাগানে গিয়া একটী পিয়ারা খাইয়াছি।

বি। তাহাতে অন্যায় কি হইল?

র। তুমি অনিবেদিত খাইতে নিষেধ করিয়াছ।

বি। পিয়ারা খাইলে কেন?

র। পিয়ারা দেখিয়া আমার ঐ কথা মনে ছিল না।

বি। আমার কথা তোমার মনে থাকে না; তোমার সহিত আর আমি কথা কহিব না। তুমি আমার নিকটে আসিও না।

বিমলার ভাব দর্শনে রমণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বালক সাশ্রুনয়নে বিমলার চরণে পতিত হইয়া কহিল, 'আর আমি এরূপ অন্যায় করিব না'। বিমলা রমণীকে কহিলেন, এখন যাহা বলিব, শুনিবে'? রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'শুনিব'।

বি। ঠাকুরসেবার দ্রব্য তুমি ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া খাওয়াতে যে বৃক্ষের ফল খাইয়াছ, সেই বৃক্ষের নিকট তোমার অপরাধ হইয়াছে। অপরাধ স্বীকার করিয়া সেই বৃক্ষকে দণ্ডবৎ করিয়া আইস, আর যখনই সেই বৃক্ষের নিকট যাইবে, তখনই মনে মনে অপরাধ স্বীকার করিবে।

বালক তৎক্ষণাৎ মাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। বিমলা রমণীকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিলেন।

স্নেহ বা ভালবাসা শ্রীভগবানকে ভুলিয়া সিদ্ধ হয় না। সন্তানসন্ততি-গণকে শ্রীভগবদুন্মুখ করা পিতা মাতার কর্ত্তব্য। তাহাতে উভয় পক্ষই কৃতার্থ হইতে পারিবেন, এতদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। শ্রীভগবদ্ভাব-হীন স্নেহ বা ভালবাসা কিছুই নহে। সেইরূপ স্নেহ বা ভালবাসা প্রদর্শন বৃথা অভিনয়মাত্র। সেই বৃথা অভিনয়ের পরিণামে উভয়পক্ষই ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া পুনঃ পুনঃ ত্রিবিধ দুঃখে মুহ্যমান হইবেন। রমণীর প্রতি বিমলার বাৎসল্যোৎকর্ষ আর একটী ঘটনা দ্বারা পরিস্ফুট হইবে।

একদিবস প্রাতঃকালে রমণী স্নান করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যহই রাধাপদ ও হেমলতা স্নান করিয়া আসিয়া, শ্রীরাধারমণের অগ্রে দণ্ডবৎ পূর্ব্বক তুলসী ও চরণামৃত গ্রহণ করে। রমণী সম্বন্ধে বিমলা ঐ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। এই দিবস রমণী, ঠাকুর অগ্রে দণ্ডবৎ করিতে ভুলিয়া গিয়া মায়ের নিকট খাইতে চাহিয়াছে।

বি। তুমি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসিয়াছ?

রমণী ভীত হইয়া আর কোন উত্তর করিতে পারিতেছে না।

বি। কথা বল না যে?

র। ভুলিয়া গিয়াছি।

বি। যাও, আজ আর খাইবার কথা মনে করিও না।

রমণী তৎক্ষণাৎ মায়ের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া অভিমানপূর্ণ

হৃদয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তুলসী ও চরণামৃত লইল। কিন্তু ফিরিয়া আর মায়ের নিকট গমন করিল না। রমণী উদ্যান মধ্যে একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। রমণী একাকী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া অনেকবার কাঁদিয়াছে। সেই ক্রন্দন বৈরাগ্যময়, আর আজিকার ক্রন্দন অভিমানময়। অল্পক্ষণের মধ্যে বালক রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে একখানি কাষ্ঠাসনোপরি ঘুমাইয়া পড়িল।

এদিকে বিমলা কার্য্যান্তর হইতে আসিয়া রমণীকে আর দেখিতে পাইলেন না। বিমলা হেমলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমণী কোথায় ?"

হে। পিসীমা! আমি ত দাদাকে দেখি নাই।

বি। দেখ ত মা! তোমার দাদা কোথা গেল।

হেমলতা দাদার অন্বেষণ করিয়া কোনই অনুসন্ধান পাইল না। বিমলা চিন্তিত অন্তঃকরণে রমণীর অনুসন্ধানে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কতকক্ষণ খুঁজিতে খুঁজিতে বিমলা দেখিলেন, বালক কাষ্ঠাসনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমন্ত বালককে দেখিয়া বিমলার বোধ হইল, এইমাত্র সে কাঁদিতেছিল এবং এখনও পর্য্যন্ত মুখখানি অভিমানরঞ্জিত রহিয়াছে। বিমলা বালকের শিরোদেশ স্বীয় ক্রোড়োপরি লইয়া, কাষ্ঠাসনে উপবেশন পূর্ব্বক হস্তদ্বারা তাহার গাত্র মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিমলার হস্তস্পর্শে বালক জাগিয়া উঠিল। বিমলার স্নেহাচরণে বালক বিগলিত হৃদয়ে আবার কাঁদিতে লাগিল। সে অনেকবার অভিমান সহকারে নির্জ্জন স্থানে আসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু কখনও এরূপ সস্নেহ ব্যবহারে হৃদয়ের দুঃখ প্রশমিত হইতে অনুভব করে নাই। বিমলা তখন রমণীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, "বাবা! আমি তোমায় কত কি বকি, তাহাতে তোমার কি রাগ করা উচিত হয়; খাইবে চল, আর আমি তোমায় বকিব না"।

র। মা! আমার অন্যায় হইয়াছিল, আমি তোমার কথা শুনি নাই। আমি বাড়ীতে বিমাতার উপর এরূপ রাগ করিতাম। তুমি বকিলে আমার বিমাতার কথা মনে হয়, আর রাগ আইসে। আমি অনেকবার একা একা বসিয়া কাঁদিয়াছি, কিন্তু কেহ কখনও এরূপভাবে আমায় ডাকিতে আইসে নাই। আজ হইতে সহস্র বকিলেও আমি আর তোমার উপর রাগ করিব না। তুমি ত আমার ভালর জন্য বক।

মায়ে ছেলেয় বিবাদ মিটিয়া যাইল। বিমলা রমণীর গণ্ডে স্নেহচুম্বন পূর্ব্বক তাহাকে লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ক্রমশঃ বিমলা-মায়ের প্রতি রমণীর প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল। বিমলার প্রত্যেক উপদেশ রমণী অতি যত্ন এবং আগ্রহের সহিত পালন করিতে তৎপর হইল। রমণীর হৃদয়ের কঠোরভাব সমুদয় এক একটী করিয়া দূরীভূত হইলে পর তাহার অন্তঃকরণ কিরূপ সরস হইতে লাগিল, তাহা পাঠকবর্গ কিছু কিছু অবগত হইয়াছেন।

একদিন বিমলা নির্ব্বিঘ্ন চিত্তে স্বীয় প্রকোষ্ঠমধ্যে বসিয়া আছেন, বেলা ১টা বাজিয়া গিয়াছে, বাটীর সকলের ভোজন সমাপ্ত হইয়াছে। বিমলা এখনও পর্য্যন্ত জলগ্রহণমাত্র করেন নাই। এমন সময়ে রমণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মা! খাইয়াছ?' বিমলা অন্যমনস্কচিত্ত, কোন কথার উত্তর করিতে পারিলেন না। রমণী মায়ের সন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক মুখের দিক লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'মা! খাইয়াছ?' রমণী বুঝিতে পারিয়াছে, মায়ের এখনও খাওয়া হয় নাই।

বি। হাঁ, খেয়েছি।

র। না, তুমি কখনও খাও নাই। ঐ প্রসাদ কাহার জন্য ঢাকা রহিয়াছে?

বি। না বাবা! আমি খেয়েছি, এতবেলা কেউ কি না খেয়ে থাকে। প্রসাদ রহিয়াছে বলিয়া আমি খাই নাই, তা' কি হয়?

র। হাঁ মা! তুমি কি ভাবছ?

বি। কি আর ভাবিব? তুমি যাও পড়গে।

র। মা! তুমি কখনও খাও নাই। তোমার মুখ শুক্‌না, চোক্ ছল্ ছল্ করিতেছে, তুমি মিছা কথা বলিতেছ।

বিমলা বালকের কথায় আর উত্তর করিতে না পারিয়া, তাহার গণ্ডে চুম্বন করিলেন। পুত্র মায়ের এই স্নেহাচরণে সুখী হইতে পারিল না।

র। তুমি এতবেলা কিছু খাও নাই, আমায় কখন খাওয়াইয়াছ। আমি খাইতে বিলম্ব করিলে তুমি কত বক।

বি। আমি ক্ষুধা পাইলেই খাই, তুমি ক্ষুধা পাইলেও খাইতে চাও না, তাই তুমি না খাইলে আমি বকি।

র। হাঁ মা! তোমার এখনও ক্ষুধা পায় নাই।

বি। না।

র। কেন তোমার ক্ষুধা পায় নাই?

বিমলা বড় সঙ্কটে পড়িলেন। একবার মিথ্যা কথা বলিয়া বালককে ভুলাইবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে যত্ন বৃথা হইয়াছে। এইবার কি বলিয়া ভুলাইবেন, সহসা নিরূপণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "আমি একটু পরেই খাইব, তুমি রাধাপদর সহিত পড়গে"।

র। আমি পড়িব না।

বি। কেন?

র। তুমি খাইবে না কেন?

বি। আমি এখনই খাইব, তুমি পড়গে।

র। তুমি আমার সাম্‌নে খাও, তবে আমি পড়িতে যাইব।

বি। লক্ষ্মী বাবা! আমি খাইতেছি, তুমি পড়িতে যাও। মাষ্টার মহাশয় বসিয়া আছেন।

র। তুমি খাও, আমি দেখিয়া যাইব।

অগত্যা বিমলা পুত্রের কথায় সম্মত হইলেন। মাকে আহার করিতে দেখিয়া, রমণী পড়িতে যাইল। সেই দিবস হইতে রমণী প্রত্যহ মায়ের আহার বিষয়ে তত্ত্বাবধান লইতে আরম্ভ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দরিদ্র গৃহস্থালয়—শান্তি নিকেতন।

সন্ধ্যাকাল। পাণিহাটী গ্রামস্থ দেবমন্দির হইতে শঙ্খ, ঘণ্টাধ্বনি পল্লীবাসিগণকে ঠাকুরারাত্রিক সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক কিয়ৎকালের জন্য সকলের চিত্ত শ্রীভগবচ্চরণে উৎসর্গীকৃত করিল; অনন্তর সেই পবিত্র-ধ্বনি জাহ্নবীসলিলে অভিস্নাত হইয়া পুনরায় স্ব স্ব প্রভুর মন্দিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কর্ম্মোন্মুখ দশায় অবস্থান করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরাত্রিক কার্য্য সমাধা করণান্তর সময়োপযোগী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গৌরপ্রিয়া সুন্দর গান করিতে জানে। সে প্রায়ই সন্ধ্যাকালে পিতার সহিত কীর্ত্তনে যোগদান করে। পিতা ও কন্যার প্রেমপূরিত কীর্ত্তনস্বর শ্রোতৃবর্গের প্রভূত আনন্দের হেতু হয়।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে পিতা ও কন্যায় নিতাই-গৌরাঙ্গ লীলা-বিষয়ক কত আলাপন হয়। এই দিবস গৌরপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইয়া আত্মীয়-স্বজনকে দুঃখ-সমুদ্রে ভাসাইলেন কেন? সন্ন্যাসী না হইলে কি প্রেম প্রচার হইত না?"

পি। কলির সাধারণ জীবের মানসিক অবস্থা বিচার করিলে বুঝা যায়, শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসগ্রহণ ব্যতীত প্রেম প্রচার অসম্ভব।

ক। কিরূপ বিচার করিলে বুঝা যায়?

পি। কলির জীব নিতান্ত আত্মসুখপরতন্ত্র। আত্মসুখসম্ভোগের উপাদান সমন্বিত হইয়া, প্রেম-প্রচার চেষ্টা সাধারণ লোকের গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই আশঙ্কায় শ্রীগৌরাঙ্গ মাতৃস্নেহ, দাম্পত্যপ্রীতি, আত্মীয়-

স্বজনানুরাগ, বর্ণ ও বিদ্যা-মর্য্যাদা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, দীনহীন বেশ ধারণ পূর্ব্বক পরার্থে আত্মোৎসর্গের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। ইহাতে হইল কি? আপামর সাধারণজনের চিত্ত তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। একটী তরুণ সুন্দর বিদ্যালঙ্কারভূষিত ব্রাহ্মণ যুবক আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে! কাহার না এই নিদারুণ দৃশ্য দর্শনে হৃদয় বিগলিত হয়? যে অতি নির্ম্মম, অতি পাষাণ, সেও আজি শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসবেশ দর্শনে কাঁদিল; ভাবিল, আমার জন্যই কি এমন সুন্দর, এমন তরুণ যুবক কাঁদিতেছে। অথবা কেহ ভাবিল, ইহাঁর কাঁদিবার হেতু কি, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। আমি ইহাঁর সমুদয় অভাব মোচন করিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া প্রাণ, মন ক্ষণেকের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের পায়ে জনমের মত বিক্রীত হইল। অথবা জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইল, একবার আমার মুখে 'কৃষ্ণনাম' শুনিবার নিমিত্ত এই নবীন সন্ন্যাসী প্রার্থী। যেমন 'কৃষ্ণনাম' উচ্চারণ করিল, প্রেমে হৃদয় মাতিয়া গেল, জন্মের মত আত্মসুখলালসা মিটিয়া গিয়া কৃষ্ণসুখে ভোর হইল।

ক। শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়ার সম্বন্ধ তাঁহার আত্মসুখভোগের উপাদান বলিয়া কিরূপে কল্পিত হইবে?

পি। লোকের মনে এই কল্পনা হওয়াই ত স্বাভাবিক। লোকে নিজের মত করিয়া অন্যকে কল্পনা করিয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেইরূপ সর্ব্ববিধ লোকের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের ভাবানুযায়ী প্রেম-প্রচারানুকূল বেশ ধারণ করিলেন। গোলোকপতি পথের কাঙ্গাল সাজিলেন! কেন? জীব উদ্ধারের জন্য। যাঁহার ভক্তের এক কৃপাকটাক্ষপাতে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হইতে পারে, তিনি স্বয়ং জীবের কল্যাণের জন্য আজ অশ্রুবিগলিত নেত্রে আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে উপনীত! ইহা অপেক্ষা কারুণ্যরসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি আছে? শ্রীমন্মহাপ্রভু কারুণ্যরসের অপার সমুদ্র।

তাঁহার কারুণ্যরসময়ী লীলাপাঠে কোন্ পাষাণের হৃদয় না হয়?

ক। নিতাই-গৌরাঙ্গ লীলায় যাহার চিত্ত বিগলিত না হইবে, তাহার উপায় কি?

পি। নিতাই-গৌরাঙ্গ লীলায় সকলেরই চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে, সকলেই তাঁহাদের নামে প্রেমে ভাসিবে।

গৌরপ্রিয়ার আর প্রশ্ন করিতে হইল না। সহসা গৌরপ্রিয়া দেখিল, শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ নামের প্রবল বন্যায় সংসার ভাসিয়া যাইতেছে। স্থাবর, জঙ্গম, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ,—আর কেহ বাকি নাই, সকলেই প্রেমবন্যায় সন্তরণ করিতেছে, সকলেরই মুখে শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ নামের পীযূষ-পূরিত ধ্বনি। তখন গৌরপ্রিয়া কহিল, ইহা পরম সত্য কথা। প্রভুর নামের কলঙ্ক হইবে কেন? প্রভু অপার করুণাময়, নাম বুঝি ততোধিক করুণাধার! নামের অতি অদ্ভুত মাদকতা-শক্তি! ক্ষণেকের মধ্যে সকল ভুলাইয়া এক অপরূপ ধামে লইয়া যায়—তথায় সকলই কি এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থাপন্ন তাহা মুখে বলা যায় না!

কন্যার অমিয়-সদৃশ বচনাবলিশ্রবণে ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রেম-পুলকিত হইয়া, গান করিতে আরম্ভ করিলেন।

"নিতাই গৌরাঙ্গ নামে ভরিল ভুবন রে!
ভরিল ভুবন, প্রেমে ভাসিল সকল রে!"

গৌরপ্রিয়া পিতার সহিত কীর্ত্তনে যোগ দিলে পর, যে অভূতপূর্ব্ব ভাবের হিল্লোল উত্থিত হইল, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী অশক্ত। দেবতাগণও তাহার সংস্পর্শ অভিলাষ করেন।

নাম-রস-বিভোর পিসীমা কীর্ত্তনের আকর্ষণে বাহিরে আসিয়া পিতা এবং কন্যার ভাবোচ্ছ্বাসময় গীত শ্রবণে পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

সুশীলার পাককার্য্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তিনিও আকৃষ্ট হইয়া কীর্ত্তনগান শ্রবণাভিলাষে সেই স্থানে আগমন করিলেন। সুধাও কীর্ত্তনস্থলে না আসিয়া থাকিতে পারিল না। প্রকৃতই শ্রীহরি-কীর্ত্তনের ন্যায় চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান আর বুঝি সংসারে নাই। তাঁহার নাম-কীর্ত্তনস্থলে তিনি যে আনন্দস্বরূপে আগমন করেন, ইহা নিশ্চয়। ভাগ্যবান জন কীর্ত্তনানন্দে শ্রীভগবানের শুদ্ধ সত্ত্ব-সাগরে ডুবিয়া যান, ইহারও দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় করতাল এবং সুরেন নামক ছাত্র মৃদঙ্গ বাজাইতে-ছেন। তিনজনই ভাবপূরিত স্বরে গান করিতেছেন। সঙ্গীত পঞ্চমস্বরের ঊর্দ্ধে উঠে নাই। পরন্তু শ্রোত্রীবর্গ কীর্ত্তনোত্থ ভাবের সীমা পাইতেছেন না। সকলে একতানে গাহিতেছেন,—

"নামে ভরিল ভুবন, প্রেমে ভাসিল ভুবন রে!"

সকলেই যেন দেখিতেছেন, শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ নামের অপূর্ব্ব বন্যায় সংসার প্লাবিত; স্থাবর, জঙ্গম শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ নামে উন্মত্ত হইয়া সেই প্রেম-তরঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন!

পিতা ও কন্যার কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে পিসীমা কহিলেন, বেশ কীর্ত্তন শুনাইলে; শেষের দিনে গৌরপ্রিয়া এইরূপ কীর্ত্তন শুনাইলে, আমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

গৌ। ঠাকুর-মা তোমার শেষের দিন কবে! শ্রীগৌরাঙ্গগণ নিত্য।

ঠা-মা। শেষের দিনে তোমরা কীর্ত্তন শুনাইয়া যদি আমায় শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট পাঠাইতে পার, নতুবা আমার আর উপায় নাই।

গৌ। ঠাকুর-মার এই কথা আমি শুনিব না। যাঁহার দর্শনে শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দভরা স্মৃতি চিত্ত অধিকার করিয়া ফেলে, তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গগণে গণনা করিতে আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় না।

ঠা-মা। তবে তুমি আমায় কীর্ত্তন শুনাইবে না।

গৌ। তোমাকে ঠাকুর-মা! সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মৃতি করিয়া দিতেছে এবং চিরদিন দিবে।

ভ। পিসীমা হারিয়া গেলেন দেখিতেছি।

পি। তুমিও গৌরপ্রিয়ার কথায় সায় দিতেছ; তা' বেশ, আমার যেমন কপাল, আমায় কেহই শেষের দিনে কীর্ত্তন শুনাইবে না। তবে আর আমার কি হ'বে? আমি কোথায় যাইব?

এই বলিয়া কৃষ্ণভাবিনী দুঃখিত মনে ভাবভরে বসিয়া পড়িলেন। তখন গৌরপ্রিয়া আর কোন আপত্তি না উঠাইয়া কহিল, "ঠাকুর-মা! তোমায় নিশ্চয়ই কীর্ত্তন শুনাইব, কিন্তু তুমি ছাড়িয়া যাইবার কথা বলিলে কি কাহারও দুঃখ হয় না?"

ঠা-মা। আহা! সেদিন আমারও সুখের—তোমাদেরও সুখের। আর আমি যাইলে দুঃখ কি? আমি কোনই কর্ম্মের নয়।

সু। পিসীমার আর কোন দুঃখ নাই, কেবল সংসারে কোন কায করেন না, এই দুঃখ। চিরদিন লোকে কি সাংসারিক কায করে?

ঠা-মা। তোরা বল্, আমি শীঘ্র শীঘ্র যাই। গৌরপ্রিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইলে, সেইদিন যদি দেখা না হয়।

সু। আচ্ছা পিসী-মা! তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনই হউক।

পিসী-মা, সুশীলার আশ্বাস-বচন শ্রবণে সকলকে কতই না আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর কহিলেন, গৌরপ্রিয়ার একটী সুন্দর শ্রীকৃষ্ণভক্ত বর হউক।

কথোপকথন সমাপ্ত হইলে, সুশীলা ভোগদ্রব্য সমুদয় ঠাকুর মন্দিরে আনয়ন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রীতি-সহকারে ভোগাদি ঠাকুরকে নিবেদন পূর্ব্বক বাহিরে আসিলেন। যথাসময়ে ভোগ সরিলে আরাত্রিক

সম্পাদিত হইল। পিসীমা, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং গৌরপ্রিয়ার জন্য তিনটী আসন প্রস্তুত হইয়াছে। তিনখানি পাত্রে প্রসাদ পরিবেষন করিয়া, সুশীলা কন্যাকে উভয়েরে ডাকিতে কহিলেন। তিনজনে আসনে উপবেশন করণান্তর ভোজন করিতে করিতে প্রসাদ-সেবন-জনিত আনন্দে আবিষ্টচিত্ত হইয়া যে আলাপন করিলেন, তাহা পাঠকগণ শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে একটী প্রসঙ্গের আলোচনা হওয়া উচিত।

জীবের সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণ, প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হইলে স্বাতন্ত্র্য-স্বভাব-পরতন্ত্র মানব কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে স্বীয় বহির্ম্মুখ স্বভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন? সহসা কি আমরা প্রকৃতির আবরণ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দ্বন্দ্ব-ভাব, অহঙ্কার—উন্মোচন করিয়া শ্রীভগবদ্রাজ্য দর্শন করিতে সমর্থ হই? সেইরূপ সামর্থ্যবিহীনজন আমার পক্ষে কর্ত্তব্য কি? আমার যে সমস্ত ইন্দ্রিয় আত্মসুখের নিমিত্ত পরিচালিত করিতেছি, সেই সমুদয় ইন্দ্রিয়গণকে যেরূপ ভাবে ব্যবহার করিলে আমার কল্যাণ হইবে, তৎসম্বন্ধে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সুহৃদ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া, সংসারবাসী জীববৃন্দকে উপদেশ করিতেছেন,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যৎ জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

অদ্বয় শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপ কর—তাহা আমাকে অর্পণ কর।"

শ্রীভগবান কি আমাদের পরমাত্মীয়, বড় আদরের বস্তু নহে? আর তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কেহ কি কখনও সংসারে সুখী হইতে পারিয়াছেন? পুরাণে, ইতিহাসে কাহার কীর্ত্তি উদ্ঘোষিত? হিতাহিত জ্ঞানালঙ্কৃত মানব-জীবনে যিনি শ্রীভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি না করিলেন, তাঁহার

মাধুর্য্যে না ডুবিলেন, তাঁহার জীবনধারণ কি সম্পূর্ণ বৃথা হইল না? কিন্তু এই সমুদয় কথা উপলব্ধি করিয়া কবে আমাদের বহির্ম্মুখতা ঘুচিবে? ভগবন্! আর কতদিনে তোমার অমৃতময়ী—আনন্দময়ী স্মৃতি আমাদের প্রাণ মন অধিকার করিবে? সেইদিন আমরা কৃতার্থ,—ধন্য হইব।

আজ এই দরিদ্র গৃহস্থালয় পরমা শান্তির নিকেতন। কেন? সকলেরই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ বোধ হইয়াছে। শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গকে সকলেই একপ্রাণে অতি আপনার জন ভাবিয়া সেবা করিতে তৎপর। যাঁহাদের সহিত আমাদের নিত্য প্রকৃত-সম্বন্ধ, তাঁহাদের ভুলিয়া সম্বন্ধ, ভালবাসা—সে ত ছাই, মাটী। এই সত্য আমি বিশ্বাসপথে আনিতে না পারিলে, আমিই কষ্ট পাইব, আর কেহ তাহার জন্য দায়ী নহেন। এই সংসারে যত সম্বন্ধ, যত ভালবাসা দেখিতেছি, কল্পনাতে মাত্র আমরা তাহাদিগকে সুখপ্রদ মনে করি, আর ত কিছু নয়। প্রকৃত নিত্য-সম্বন্ধ-জনিত ভালবাসা কাহার সহিত? যেমন কোন গোলাকার বস্তুর কেন্দ্রস্থানীয় অণু বা পরমাণুর সহিত পরিধিগত সকল অণু বা পরমাণুর সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধহেতু সকলে পরস্পর সম্বন্ধান্বিত, সেইরূপ সর্ব্বকারণকারণ পরম পুরুষ অনন্ত মাধুর্য্যখনি শ্রীভগবান সমস্ত সম্বন্ধ, যাবতীয় ভালবাসার একমাত্র কেন্দ্রস্থানীয়। হইতে পারে, আমরা তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু সেইজন্য কি আর আমাদের তাঁহার সান্মুখ্য-লাভ করিতে হইবে না? যদি আমরা তাঁহার সম্মুখে যাইতে বড় ভীত হই, অথবা যদি আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতে একেবারে অসমর্থ হই, সেই নিমিত্ত অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন গোলোকাধীশ আজ দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে অবতীর্ণ হইলেন। ঐশ্বর্য্যচিহ্ন-বিহীন, দীনবেশে পথের কাঙ্গাল হইয়া অবিচারে সকলের দ্বারে দণ্ডায়মান। যিনি প্রেমের অদ্বয় বিষয় তিনি আশ্রয় (আদর্শভক্ত)-ভাব অঙ্গীকার করিলেন। আশ্রয়ের সার শ্রীরাধিকার

ভাব-কান্তি ধারণ পূর্ব্বক অদ্বয় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়া অবতীর্ণ হইলেন; পতিতপাবন হইয়া প্রেমবিতরণ করিলেন। তবে আর কেন আমরা তাঁহা হইতে দূরে থাকি? আমরা হই না কেন মহাপাপী, আজ শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা করিতে সকলেই অধিকারী। আমরা পতিত বলিয়া তিনি পতিতপাবন নাম ধারণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই নাম লইব, তাঁহারই গুণগান করিব, তাঁহারই পূজা করিব,—যাহা কিছু করিব, তৎসমুদয় তাঁহারই নামে অর্পণ করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধ বোধ না হইলে কলির জীবের আর কোন উপায় নাই। ইহা কোন কাল্পনিক কথা নহে। একদিন এই সত্য, আমরা প্রত্যেকেই অবধারণ করিতে পারিব। কেননা, শ্রীমন্মহাপ্রভু পতিতের দেবতা, কাঙ্গালের ঠাকুর। তিনি কোন সীমাবদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষের অধিনায়ক নহেন। ম্লেচ্ছ-যবনের উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বেশ্বর।

আসুন পাঠকগণ! আমরা পিসীমা, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং গৌরপ্রিয়ার কথোপকথন শ্রবণ করি।

গৌ। বাবা! আজ গৌর কেমন খাইয়াছেন?

ভ। তোমার কিরূপ মনে হইতেছে?

গৌ। ঠাকুর-মা! আজ গৌর কিরূপ আস্বাদন করিয়াছেন?

ঠাকুর-মা নাতিনীর প্রশ্নের উত্তর দিবে কি, তিনি বিভোর; কখনও ছুটী খাইতেছেন, আর কেবল নয়নজলে ভাসিতেছেন। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "ভাই! তুমি বল"। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিলেন,—

"ত্বয়োপভুক্ত স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারভূষিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥"

অর্থাৎ,—তোমার প্রসাদী মাল্য, চন্দন, বস্ত্র, অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত

হইয়া তোমার অধরামৃতসেবী দাসসকল তোমার দুর্জ্জয় মায়াকে জয় করিয়া থাকেন।

পি। এমন প্রসাদে আমার বিশ্বাস হইল না।

ভ। পিসীমা! ঠিক বলিয়াছেন। কেননা,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপূণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসোনৈবজায়তে॥"

কিন্তু আপনার এই দৈন্য-কথা আমাদের জন্যই মনে করিতে হইবে। কেননা, আমাদের দৈন্যলেশও নাই।

গৌ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন রসুই হইয়াছে, বাবা কেবল শ্লোক আবৃত্তি করিতে থাকিলেন।

ভ। তুমিই বল, ঠাকুর কিরূপ আস্বাদন করিয়াছেন।

গৌ। আপনাদের মুখে শুনিতে ইচ্ছা করিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভ। দুর্ল্লভ এ ত্রিজগতে—বিষ্ণু নিবেদিতে।
বিশেষ অধরামৃত—বেদে অবিদিত॥

গৌ। আমি ভালই উত্তর পাইলাম।

ভ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"অধরের এই রীত, আর শুনহ কু-নীত,
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য, পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণ-ফেলা'॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতাসব,
এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায়।

বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সেই জন তার লব পায় ॥

এইবার তোমার কথার উত্তর হইয়াছে ?

গৌ। না।

ভ। তবে আমি তোমার কথার উত্তর দিতে পারিলাম না।

পি। সুশীলা ধন্য ! সুশীলার সেবা ঠাকুর অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুশীলার কল্যাণে আমি এই দুর্লভ অধরামৃত পাইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি।

ভ। এই কথা বোধহয় গৌরপ্রিয়ার মনোমত হইয়াছে।

সু। গৌরপ্রিয়ার মনোমত কথা জানিতে পারিলে আপনি আগেই উত্তর দিতেন।

ভ। বলনা গৌরপ্রিয়া ! এই তোমার মনোমত উত্তর কি-না ?

গৌ। হাঁ।

ভ। আমি ত তাহা স্বীকার করিয়াছি। ঠাকুরের প্রধান সেবা সুশীলাই করিয়া থাকে।

সু। আপনিও সকলের কথায় যোগ দিলেন ! কাল হইতে আমি আর রাঁধিব না। আপনি আর গৌরপ্রিয়া রাঁধিবেন।

গৌ। কেন, বাবা ত ভাল রাঁধিতে জানেন।

সু। আমিও সেইজন্যই বলিতেছি।

ভ। আমার হাতে ঠাকুর এরূপ সুন্দর কখনও খাইবেন না।

সু। আমি আর কোন কথা শুনিব না।

ভ। তুমি কষ্ট পাইবে, আর আমি একটা কায করিব !

সু। কষ্টের কথা কি ! প্রধান সেবা আপনি করিলে আমি বরং সুখী হইব।

ভ। আচ্ছা, দেখা যাবে।

গৌ। না না, বাবা! আপনাকে একদিন রাঁধিতে হইবে।

ভ। একদিন রাঁধিতে স্বীকার হইতে পারি।

পি। সেদিন আমি খুব অনেক করিয়া প্রসাদ পাইব। আহা! তোরা আমার মনুষ্য জন্ম সার্থক করিলি।

আহার সমাপ্ত হইলে কথোপকথন করিতে করিতে সকলে আচমন করণান্তর তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। গৌরপ্রিয়া মাকে পরিবেষন করিয়া দিলে সুশীলা প্রসাদ পাইতে বসিলেন। গৌরপ্রিয়া নিকটে বসিয়া রহিল। সুশীলা প্রসাদ পাইতেছেন, গৌরপ্রিয়া কহিল, মা! আজ ঠাকুর চমৎকার খাইয়াছেন।

সু। তুমি কিরূপে তাহা বুঝিলে?

গৌ। প্রতি দ্রব্য ঠাকুর যেরূপ সুন্দর আস্বাদন করিয়াছেন, খাইতে খাইতে আমারও সেইরূপ অনুভব হইতে লাগিল। আচ্ছা মা! তোমার কিছু বোধ হইতেছে না?

সু। কি জানি বাছা! আমি অত বুঝি সুঝি না, ক্ষুধা লাগিলে খাই।

গৌ। না মা! তুমি মিথ্যা বলিতেছ। আমি আর তোমার সঙ্গে কথা বলিব না।

সু। না মা! আমি সত্য বলিতেছি।

কিন্তু গৌরপ্রিয়ার কথায় সুশীলার হৃদয়ে কি এক অব্যক্তভাব সঞ্চারিত হইতেছে, তাহা সুশীলা ভালরূপে আস্বাদন করিবেন কি, যেন তাহাতে মুগ্ধ হইতেছেন। সুশীলা আহার সমাপন করিয়া উঠিলেন। সুধার উপর গৃহ কর্ম্মের ভার দিয়া ব্রাহ্মণী কি মনে করিয়া তাড়াতাড়ি স্বামী সন্নিধানে আসিলেন। গৌরপ্রিয়া কহিয়া গেল, সে ঠাকুর-মার কাছে শয়ন করিবে।

সু। গৌরপ্রিয়া এত অল্প বয়সে যেরূপ কথা বলে, তাহা কি স্বাভাবিক?

ভ। তোমার কি মনে হয়?

সু। আমি ত কিছু বুঝিতে পারি না।

ভ। জীবের স্বভাব ঈশ্বর-বহির্ম্মুখতা বটে, তাহা হইলেও প্রেম এবং জ্ঞান এই উভয়শক্তিই তাহাতে নিত্য-সিদ্ধ। ভগবদ্ কৃপায় যাহার বহির্ম্মুখতা ঘুচিয়াছে, তিনি সর্ব্বদা ভগবদ্ জ্ঞান এবং প্রেম বিষয়ে অনুকূল কথোপকথন এবং আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। বহির্ম্মুখজন তাঁহার কথোপকথন বা ব্যবহার অস্বাভাবিক মনে করিতে পারেন, কিন্তু উন্মুখ ব্যক্তি কখনও এরূপ কল্পনা করিতে পারিবেন না। কলির ধর্ম্মে বহির্ম্মুখজীব অল্প বয়সেই কুবুদ্ধি এবং কু-আচার-পরায়ণ হইতে পারিলে, অল্প বয়সে উন্মুখজন জ্ঞান এবং বিবেক-সম্পন্ন হইবেন বা ভগবদ্বিষয়ে তাঁহার অতি সুন্দর অনুভব হইবে, আশ্চর্য্য কি? কালের কথা না ধরিলেও, কৈশোর বয়সই ধর্ম্মাচরণ করিবার উপযুক্ত সময়। যখন হৃদয় দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, সেই সময়ে ধর্ম্মাচরণ করিবার চেষ্টা বৃথা।

সু। গৌরপ্রিয়া আবার আমায় কহিতেছিল, যে ঠাকুর অতি চমৎকার খাইয়াছেন।

ভ। ঠাকুরের আস্বাদন অনুভবে গৌরপ্রিয়ার ঐ উক্তি, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু গৌরপ্রিয়ার অনুভব বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না।

কথোপকথন করিতে করিতে ব্রাহ্মণ-দম্পতি নিদ্রিত হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বজাতীয় মিলন—সৎ প্রসঙ্গ।

অগ্রহায়ণ মাস। ঊষা কাল। পূর্ব্ব গগন ঈষৎ রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে। কিশোরী বাবুর বাটীর সকলেই জাগরিত হইয়াছেন। এই সময় মহাপুরুষ জাহ্নবীর পূতঃ সলিলে স্নান করিয়া কিশোরী বাবুর আলয়াভিমুখে গমন করিতেছেন। মুখে 'শ্রীহরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র উচ্চারিত। তদীয় শ্রীমুখ নির্গলিত নাম সুধাপানে স্থাবর জঙ্গম উৎফুল্ল। স্নানযাত্রিগণ মহাপুরুষের অপরূপ মূর্ত্তি এবং অদ্ভুত প্রেম দর্শনে সকলেই আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে নির্ণিমেষ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। সকলেরই মনে হইল, 'আমি এই মহাজনের অনুসরণ করি'। সকলের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া মহাপুরুষ দ্রুত পদবিক্ষেপে 'রাধারমণ সুখদা' কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। 'হরে কৃষ্ণ' নাম শ্রবণ মাত্র কিশোরী বাবুর হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি সাশ্রুনয়নে বাহিরে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় হৃদয়দেবের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রভু শিষ্যকে আলিঙ্গন করিলে যে প্রেমের দৃশ্য প্রকটিত হইল, তাহা এই সংসারে বড় দুর্লভ। বাটীর সকলেই আসিয়া মহাপুরুষকে দণ্ডবৎ করিলে পর, কিশোরী বাবু শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় প্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া গেলেন। তিনি আসনে উপবেশন করিলে কিশোরী বাবু একখানি কোমল শীতবস্ত্র দ্বারা তদীয় শ্রীঅঙ্গ আবরিত করিলেন।

গু। তোমাদের সমুদয় কুশল।

শি। প্রভুর কৃপায়।

গু। শ্রীশ্রীরাধারমণ তোমাদের সর্ব্বদা কুশল রাখুন।

শি। প্রভুকে এখন আর কোথায়ও যাইতে দিব না।

গু। সকলই শ্রীশ্রীরাধারমণের ইচ্ছা। আজ তোমাদের সকলকে দেখিবার জন্য বড়ই প্রাণ ব্যাকুল হইল। যদি পাণিহাটীর ব্রাহ্মণটী আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে আমি তোমাদের একত্র দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব।

শি। প্রভু, আপনার স্নেহ অতুলনীয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আজ কি আসিবেন ?

গু। লীলাশক্তির ইচ্ছা।

ব্রজসুন্দরী শয়নভোগ লইয়া আসিলেন।

গু। আহা ! মা'টী আমার ছিলেন, তাঁহাকে এবার আসিয়া আর দেখিতে পাইলাম না।

শি। প্রভু ! তাঁহার প্রাপ্তি অতি অদ্ভুত। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি হরিনাম করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গে তাঁহার অনুপম প্রীতি দেখিয়াছিলাম।

গু। মা আমার বড়ই ভাগ্যবতী ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পরমা কৃপাপাত্রী।

শি। প্রভু, শ্রীরাধারমণের শয়ন ভোগের এই অবশেষ।

গু। দাও, আমি কিছু পাই।

মহাপুরুষ প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় রমণী, রাধাপদ ও হেমলতা আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল।

হে। বা ! আপনি চুপি চুপি আসিয়া প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, আমাদের একটু ডাকেনও নাই।

ম। বেশ, আমি তোমাদের বাড়ী আসিলাম, তোমরা একবার খবরও করিলে না।

হে। রাধারমণ ত আপনাদেরই, এ কুঞ্জও আপনাদের, এ আমাদের বাড়ী কিরূপে হইবে ?

ম। তবে হেমলতা! আমার অন্যায় হইয়াছে, এখন এস, একটু প্রসাদ পাও।

হে। না আমি আপনার সঙ্গে প্রসাদ পাইব না।

ম। হেম, তুমি আমার দিদি হও, তুমি না খাইলে আমি কিরূপে খাইব।

হে। তা হবে না, আপনি অন্যায় করিয়াছেন, সেই জন্য আজ আমাকে অধরামৃত দিতে হইবে।

মহাপুরুষ হেমলতার প্রত্যেক কথার মাধুর্য্য অনুভবে আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না। একটী সন্দেশ অর্দ্ধভুক্ত করিয়া হেমলতার হস্তে দিলেন। হেমলতা তাহা হইতে সকলকে দিয়া আপনি অবশেষ ভোজন করিল।

হে। আজ আপনাকে আমি ভারি বিরক্ত করিব।

ম। কেন ? এখন অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ?

হে। না। আজ এখানে আরও কুটুম্ব আসিবেন।

ম। কিরূপে জানিলে ?

হে। আজ হাত হইতে সকালেই একখান থালা পড়িয়া গিয়াছে।

ম। তোমার কথা সত্য হউক।

আধখানি সন্দেশ মাত্র খাইয়াই মহাপুরুষ কিঞ্চিৎ জল পান করিলেন। কিশোরী বাবু আর প্রভুকে অধিক আহার করিতে অনুনয় করিলেন না। ব্রজসুন্দরী মহাপুরুষকে তাম্বুল আনিয়া দিলেন। কথোপকথন করিতে করিতে বেলা ৭॥০ দণ্ড হইল। ভৃত্য আসিয়া কিশোরী বাবুকে সংবাদ দিল, পানিহাটী হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার কন্যা

আছেন। হেমলতা বলিয়া উঠিল, আমার সই আসিয়াছে, লইয়া আসি। কিশোরী বাবু রাধাপদকে কহিলেন, তুমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এই ঘরে লইয়া আইস। হেমলতা আগেই ছুটিয়াছে। রাধাপদ পিতার আদেশমত বাহিরে আসিয়া দেখিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীরাধারমণ দর্শন করিতেছেন। হেমলতা এবং গৌরপ্রিয়া পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ। রাধাপদর হৃদয় সেই দৃশ্য দর্শনে বিগলিত হইয়া অবশ হইল। পূজারী ঠাকুর আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রসাদী মাল্য এবং চরণতুলসী দিলেন, আর সেই আলিঙ্গিত দুইটী গলায় একছড়া মালা দিয়া হৃদয়ে বড়ই দুর্লভ আনন্দের সঞ্চার অনুভব করিলেন। অতঃপর রাধাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বাটীর মধ্যে লইয়া আসিল। হেমলতা সইকে লইয়া চলিল।

হে। সই! তুমি একদিন আসিবে বলিয়াছিলে, আমি রোজই মনে করি, আজ সই আসিবে, সই! আমাকে তোমার কি মনে ছিল?

গৌ। দেখ সই! আমারও রোজ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু এতদিন কেন আসি নাই, তাহা পরে বলিব।

হে। আজ যে তোমার দেখা পাইলাম, ইহাতে আমার যে আহ্লাদ হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব।

গৌ। আমারও নৌকায় আসিতে আসিতে 'তোমায় আজ দেখিব' ভাবিয়া কত আহ্লাদ হইতেছিল।

হে। চল, আজ তোমায় আরও সুখী করিতে পারিব।

গৌ। কিরূপে!

হে। একজনকে দেখাইয়া।

গৌ। কাহাকে?

হে। চলত।

গৌ। বলনা সই!

হে। আজ এখানে একজন তোমার বড় আত্মীয় আসিয়াছেন।

গৌ। কে ভাই!

হে। সংসারে কে বড় আত্মীয়?

গৌ। যিনি কৃষ্ণোন্মুখ করেন।

হে। তিনি আসিয়াছেন।

গৌ। প্রভু আসিয়াছেন, সেই জন্যই আজ বাবা যেন পাগলের মত হইয়া চলিয়া আসিলেন। আমারও প্রাণ আজ কেমন কেমন হইয়াছিল।

গৌ। চল তাঁহাকে দর্শন করিগে।

হে। আমি ভাই! তোমার পাণ্ডা, আমায় কি দিবে বল, তবে দর্শন করাইব।

গৌ। তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব।

হে। স্বীকার করিলে।

গৌ। হাঁ।

হে। এখন দর্শন করিবে চল, পরে আমার মনোমত সামগ্রী চাহিব।

হেমলতা গৌরপ্রিয়াকে লইয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল। গৌরপ্রিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন, মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'সুন্দর বর হউক'।

ম। কি গৌরপ্রিয়া! তোমরা আজ কি মনে করে?

গৌ। বাবা আমায় লইয়া আসিলেন।

ম। তোমার আর বুঝি আসিবার ইচ্ছা ছিল না?

গৌ। ছিল।

ম। কই, সে কথা ত বলিলে না।

গৌ। বাবা না আসিলে আমি কি আসিতে পারিতাম।

গৌরপ্রিয়ার কথাগুলি সলজ্জভাবপূর্ণ। মহাপুরুষ আর গৌরপ্রিয়াকে অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। ইতঃমধ্যে শিঙ্গার ভোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। একখানি আসন পাতিয়া হেমলতা মহাপুরুষকে প্রসাদ দর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন।

হে। এইবার আমি আপনাকে যত্ন করিতেছি, আসুন।

ম। দেখ, আমি ত একবার খাইয়াছি, এইবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আর তোমার সইকে দিয়া তোমরা খাও।

হে। আমি আপনার দিদি হই, আমার কথা শুনুন। তখন আপনি আধখানি সন্দেশ খাইয়াছেন। এই বলিয়া হেমলতা মহাপুরুষের হাত ধরিয়া আসনে বসাইল এবং আপনি একটীর পর আর একটী দ্রব্য মহাপুরুষের হাতে তুলিয়া দিতে থাকিলে মহাপুরুষ আহার করিতে থাকিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত কেবলমাত্র প্রেমের বশ। হেমলতা দাদাকে আর অধিক খাওয়াইল না। কেননা আবার দুই ঘণ্টা পর শ্রীরাধারমণের মধ্যাহ্ন ভোগ সরিবে।

মহাপুরুষের আহার সমাপ্ত হইল, কিশোরী বাবু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অবশেষ প্রাপ্ত হইবার জন্য অনুনয় করিলেন।

ভ। আপনি এই অবশেষের সর্ব্বাগ্রে অধিকারী।

ম। তোমরা সকলে একত্রে খাইতে বস, আমি দেখি।

ব্রজসুন্দরী মহাপুরুষের কথামত সকলের জন্য আসন পাতিয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে অবশেষ বণ্টন করিয়া দিলেন। একদিকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং কিশোরী বাবু, অপর দিকে রমণী, রাধাপদ, হেমলতা আর গৌরপ্রিয়া। সকলে মহা আনন্দের সহিত অধরামৃত পাইলেন।

এদিকে বিমলা মহাপুরুষের আগমন সংবাদ শ্রুত হইয়া নানাবিধ

ব্যঞ্জন, শাক, সুপাদি, নানাবিধ পিষ্টক, মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন। রমণী মধ্যে মধ্যে যাইয়া মাকে কহিতেছে, 'আজ ভাল করিয়া রাঁধিতে হইবে'। আবার কখনও গিয়া দেখিতেছে, মায়ের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, মুখ রক্তবর্ণ, তদ্দর্শনে রমণী কহিতেছে, 'মা! তোমার বড় কষ্ট হইতেছে' বিমলা বলিতেছেন, 'না বাবা! কষ্ট কিসের, শ্রীরাধারমণের জন্য এইসব হইতেছে'। মধ্যে মধ্যে ব্রজসুন্দরী আসিয়া বলিতেছেন, ঠাকুর ঝি! আজ আমায় তোমার সাহায্য করিতে আসা উচিৎ ছিল।

বি। না ভাই! তুমি এদিকে আসিলে সেদিকত চলিবে না, আর এই, সমস্ত হইয়া এল।

ব্র। ঠাকুর ঝি! তুমিই শ্রীরাধারমণের সেবা করিতেছ।

বি। সেত ভাই! তোমাদেরই কল্যাণে।

ব্রজসুন্দরী মনে মনে ভাবিলেন, জন্মে জন্মে আমি যেন তোমার মত ঠাকুরঝি পাই।

ভোগ প্রস্তুত হইলে তৎসমুদয় শ্রীমন্দিরে আনীত হইল। বেলা ১০॥০ টার সময় সেবক অতি প্রীতি সহকারে ভোগ নিবেদন করিলেন।

এদিকে কিশোরী বাবুর প্রকোষ্ঠে স্বজাতীয় মিলনে প্রেমের হাট বসিয়াছে। এই হাটে কেবলই আনন্দ সঞ্চার। এই হাটের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া যেদিন কাঁদিয়া বেড়াইব, সেইদিন মনুষ্যজন্ম সফল। সকলেই মহাপুরুষের প্রীতিপ্রমোদিত মুখ সন্দর্শনে উৎফুল্ল-হৃদয়। সহসা মহাপুরুষ হেমলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই, হেমলতা! তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ না?

হে। আর একটু পরে।

ম। না, তুমি আর বিলম্ব করিও না।

হে। কেন, আপনি কি বিরক্ত হইতে ভালবাসেন?

ম। বাসি।

হে। তবে বলি।

ম। বল।

হে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যে সমস্ত বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার বিভাগ এবং এক একটী বিভাগ কিরূপ ভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা আজ আমাদের শুনাইতে হইবে।

ম। তোমরা সকলেই নিত্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া থাক, আর দেখ আমি লেখা পড়া জানি না, আমায় কি তোমার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইল?

হে। তবে আপনি বিরক্ত হইতে ভালবাসেন কিরূপে?

ম। আচ্ছা! তোমরা সকলে মিলিয়া এই প্রশ্নের ক্রমশঃ আলোচনা কর, আমি তোমাদের কথা শুনিয়া কিছু বলিতে পারিব।

হে। আপনি যেরূপে পারেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন।

ম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি এই প্রশ্নের মীমাংসা আরম্ভ করুন।

ভ। প্রভু! এইক্ষেত্রে আপনারই বলিবার কথা, তবে আমাকে আজ্ঞা করিতেছেন,—

"কাষ্ঠের পুত্তলী যৈছে কুহকে নাচায়।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রধানতঃ দুইটী বিভাগ, লীলাংশে শ্রীগৌর লীলা, সিদ্ধান্তাংশে নানাবিধ তত্ত্ব নির্ণয়। এই তত্ত্ব-নির্ণয়-কাণ্ড আবার তিন ভাগে বিভক্ত, অপ্রপঞ্চ তত্ত্ব যথা,—উজ্জ্বল রসতত্ত্ব, বিষয়-আশ্রয় তত্ত্ব, বিগ্রহ তত্ত্ব, লীলা তত্ত্ব, ধাম তত্ত্ব ইত্যাদি; প্রপঞ্চ তত্ত্ব যথা,—সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, পুরুষতত্ত্ব ইত্যাদি; এবং উপাসনাতত্ত্ব—তাহাতে জীবের সম্বন্ধ, প্রয়োজন এবং অভিধেয় নিরূপিত হইয়াছেন।

ম। এই ত হেমলতার প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর হইল।

কি। প্রভু! এখন এই পর্য্যন্ত থাক, ভোগ সরিবার সময় হইয়াছে, স্নান করিতে আজ্ঞা হউক। যাও রমণী, তোমরাও স্নান করিয়া আইস।

ম। চল আমরা সকলে একসঙ্গে স্নান করিতে যাই।

কি। প্রভুর যেরূপ ইচ্ছা।

সকলে মহাপুরুষকে লইয়া মহানন্দে উদ্যানমধ্যস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইলেন। রমণী, রাধাপদ, হেমলতা, গৌরপ্রিয়া চারিজনে মহাপুরুষকে স্নান করাইয়া দিল। তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া চারিজনে যে আনন্দ অনুভব করিল, তাহা জীবনে তাহারা কখনও ভুলিতে পারিবে না। মহাপুরুষের স্নান সমাপ্ত হইল, সকলে স্নান-কার্য্য সমাধা করিতে তৎপর হইলেন। মহাপুরুষ একখানি হরিদ্বর্ণের পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া চত্বরোপরি উপবেশন করিলেন। স্নান সমাপন হইলে সকলে মহাপুরুষের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিতেছেন। প্রেমিকের আচরণে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা চিত্তাকর্ষণ ব্যাপারে পরিলক্ষিত হয়। প্রেমিক-জনের প্রত্যেক আচরণ এরূপ মাধুর্য্যময় যে স্বতঃই চিত্ত তাঁহার প্রতি আসক্ত হইতে চায়। ইহাতে কোন উপদেশ বা বিধির অপেক্ষা নাই।

মহাপুরুষ কিশোরী বাবুর প্রকোষ্ঠে আসিয়া তিলক ধারণ করিতে উপবেশন করিলেন। রমণী, রাধাপদ, হেমলতা এবং গৌরপ্রিয়াকে তদীয় সম্মুখে উপবেশন করিতে কহিলেন। তাঁহার তিলক চিহ্ন ধারণ সমাপ্ত হইলে মহাপুরুষ একে একে সকলকে তিলকাঙ্কিত করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেকের হাতে দর্পণ দিয়া কহিলেন, দেখ দেখি, কেমন হইয়াছে? সকলে আপন আপন মুখ দেখিয়া হাসিল। সুন্দর কচিমুখে সৌভাগ্য চিহ্ন, সুন্দর দেখাইবে না কেন? অনন্তর শ্রীরাধারমণের মধ্যাহ্ন ভোগের প্রসাদ আসিয়া পৌঁছছিল। মহাপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে সকলে

দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রজসুন্দরী আর বিলম্ব না করিয়া মহাপুরুষের জন্য আসন করিয়া দিলেন।

ম। মা! আজ আমরা সকলে একসঙ্গে প্রসাদ পাইব। সকল আসন একেবারে কর। আজ আর আমার কথা কেহ অবহেলা করিও না।

কেহই মহাপুরুষের প্রেমাজ্ঞার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

ব্র। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, সেইরূপই করিব।

সকলের নিমিত্ত আসন প্রস্তুত হইল। বিমলা আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন।

ব্র। ঠাকুরঝি রসুই ঘরে ছিলেন।

ম। মা! আজ দেখিতেছি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। তা'হইলে কি হবে, আমাদের পরিবেশন করিতে হইবে।

বি। দিদি—এস।

বিমলা মহাপুরুষের আজ্ঞায় কক্ষাভ্যন্তরে আসিয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। প্রসাদ দর্শনে সকলেরই চিত্তে আনন্দের সঞ্চার হইল। মহাপুরুষের অনুমতি ক্রমে সকলে আসনে উপবেশনানন্তর আচমন করিলেন। মহাপুরুষ ভোজন করিলে পর ব্রজসুন্দরী স্বামীর ইঙ্গিতে মহাপুরুষের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অধরামৃত পাইয়া সকলকে দিলেন। অধরামৃত প্রাপ্ত হইয়া সকলে প্রসাদ সেবন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিক্ত শাকভাজা তিন প্রকার, দুই প্রকার সুকুতার ঝোল, উৎকৃষ্ট মুগের দাইল, বুটের দাইল, কলাইয়ের দাইল, নানাবিধ ভর্জ্জ্য, বহুবিধ ঘণ্ট, লাফড়া, সূপ ক্রমান্বয়ে বিমলা প্রসাদ বণ্টন করিতেছেন মহাপুরুষ এক একটী ব্যঞ্জন আস্বাদন করিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন।

ম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! শ্রীরাধারমণ অতি সুন্দর খাইয়াছেন। প্রীতি ব্যতীত এরূপ সেবা হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

ভ। তার আর সন্দেহ নাই। সেবক ব্যতীত সেব্য-বস্তুর সেবা কিরূপে হইবে?

ম। আপনারা সকলেই শ্রীভগবানের সেবা করিয়া সুখী হউন, ইহাই প্রার্থনা। আমি কিন্তু কেবল প্রসাদ পাইবার বেলায় আছি।

ব্যঞ্জনাদি পরিবেশিত হইলে বিমলা দুই তিন প্রকারের অন্ন বণ্টন করিলেন। অতঃপর লুচি, কচুরি, দধি, ক্ষীর, মিষ্টান্নাদি ক্রমান্বয়ে পরিবেশন করিলেন। মহাপুরুষ বিমলার পাক-কুশলতার প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন, কিশোরী বাবু! তোমার শ্রীরাধারমণ সেবা সম্বন্ধে বিমলাকেই প্রধানা সেবিকা বলিয়া জানিবে। প্রিয়জনকে খাওয়াইবার জন্য যে মনের আগ্রহ তাহা প্রেমিক-হৃদয়ের একটী উৎকৃষ্ট বৃত্তি।

কি। দিদি না থাকিলে শ্রীরাধারমণের খাওয়াই হইত না।

বি। কেন, শ্রীরাধারমণ মনে করিলে কত রাঁধিবার লোক যোগাড় করিতে পারেন।

ম। তা ঠিক, কিন্তু শ্রীরাধারমণের যিনি রসুই করেন তিনি ত তাঁহার মনের মত লোক।

কি। শ্রীরাধারাণীই শ্রীরাধারমণের জন্য রসুই করেন, আমরা তাঁহারই অনুগত।

ম। ইহাই মনের কথা, তুমি বুঝিয়াছ, আমায় সুখী করিলে।

হে। যিনি শ্রীপ্রিয়াজীর অনুগত তিনি শ্রীরাধারমণের মনের মত, একই কথা।

ম। তুমি কার অনুগত হেমলতা?

হে। আপনি কার অনুগত, আগে বলুন।

ম। আমি শ্রীরাধারমণের অনুগত।

হে। শ্রীরাধারমণের অনুগত হইতে ত কোন কষ্ট নাই।

ম। কেন?

হে। তিনি মানভঞ্জন করিতে পটু, পায়ে ধরিতে জানেন।

ম। দেখ হেমলতা! একজন যদি দশবার পায়ে ধরে, তাহার একবার পায়ে ধরিলে কি মর্য্যাদার হানি হয়? রাধারমণের পায়ে ধরা, তাঁহার উদারতার পরিচয়।

হে। হাঁ, তা আমি স্বীকার করি, তিনি একজন উদার দুষ্ট।

ম। আর তোমার প্রিয়াজি বড় ভালমানুষ।

হে। সকলেই তাহা জানে।

ম। সকলেই জানে, তিনি অসতী।

হে। গোপকুলধুরন্ধর বৃন্দাবনে গোচারণ না করিলে আর এ কলঙ্ক উঠিত না। রাধারাণীর মিথ্যা কলঙ্ক তাঁহারই জন্য।

ম। মিথ্যা কিসে?

হে। সত্য কিসে?

ম। দেখ হেমলতা, তুমি তোমার রাধারাণীকে যতই সতী বলিয়া প্রকাশ কর, কিন্তু তোমার কথা কেহ মানিবে না।

হে। জগৎ স্ত্রীলোকেরই কলঙ্ক দেখে, পুরুষের দেখে না। যদি আমার কথা কেহ না মানে, তবে তাহার কারণ এই।

ভ। প্রভু! হেমলতা আপনাকে হারাইয়া দিল।

ম। আপনারা আমার দলে হউন।

হে। তাতে আপনার সুবিধা হইবে?

ম। আচ্ছা হেমলতা! কার প্রসাদ পাইতেছ?

হে। শ্রীপ্রিয়াজির।

ম। তুমি একজনের খাও, আর একজনের গুণ গাও।

হে। একথা আপনার সম্বন্ধে এখন খাটে।

ম। গৌরপ্রিয়া তুমি কার পক্ষে ?

গৌ। কৃষ্ণনাম গানে ভাই! রাধিকা চরণ পাই
রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।

শ্রীরাধামাধব একপ্রাণ দুটী তনু, যেমন একবৃন্তে দু'টী কমল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি ভক্তের আস্বাদনীয়। আমরা দুইজনকে ভজনা করি, দুইজনকে একত্র দেখিতে ভালবাসি, সেবা করিতে ভালবাসি।

গৌরপ্রিয়ার কথায় সকলের হৃদয়ে সহসা কি এক অব্যক্ত মধুর রসের প্রবাহ বহিল। সকলের প্রাণ সেই অনুপম রসের তরঙ্গে নাচিতে লাগিল।

কি। প্রভু! গৌরপ্রিয়ার কথাই ঠিক।

হে। সই বিবাদভঞ্জন করিয়া দিল, সইকে আমি একটী সন্দেশ খাওয়াইয়া দেই।

এই বলিয়া হেমলতা গৌরপ্রিয়াকে একটী সন্দেশ খাওয়াইয়া দিল। গৌরপ্রিয়া তখন প্রেমে টলমল করিতেছে।

ম। আমিও গৌরপ্রিয়াকে একটী সন্দেশ দিলাম।

এই বলিয়া মহাপুরুষ একটী সন্দেশ গৌরপ্রিয়ার পাতে দিলেন। হেমলতা সেটীও সইকে খাওয়াইয়া দিল।

আহার সমাপ্ত হইলে সকলে উঠিয়া আচমন পূর্ব্বক তাম্বুল লইলেন। ব্রজসুন্দরী শীঘ্র সমস্ত উঠাইয়া লইয়া স্থান উপস্কার করিয়া দিলেন। মেজে শুষ্ক হইলে তথায় একটী বিছানা করিলে সকলে উপবেশন করিলেন।

ম। এইবার হেমলতার প্রশ্নের উত্তর হউক।

কি। প্রভু! একটু বিশ্রাম করুন।

ম। কথোপকথনে বিশ্রাম হইবে। আজ যদি বিশ্রামে সময় অতিবাহিত করা যায়, তাহা হইলে পরস্পর সাক্ষাতের ফল কি? ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলুন।

ভ। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাই কলির জীবের একমাত্র গতি। কলি কলুষিত মানবচিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গলীলানুভব ব্যতীত নির্ম্মলতা লাভ করিতে পারে না। কলির জীবের দুর্ব্বলতা কি, কলুষতা কি? আত্মেন্দ্রিয় সুখপরতা। এই দুর্ব্বলতার ঔষধ কি? অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণসুখপরতা। এই ঔষধের আবিষ্কারক, প্রস্তুত কর্ত্তা এবং একমাত্র দাতা শ্রীশচীনন্দন। আমাদের রোগ নির্ণয় করিয়া তিনি অবিচারে এই চিরানর্পিত মহৌষধি দান করিলেন। তিনি ব্যতীত কলির জীবের আর উপায় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অনন্ত সুখ-খনি, অসীম আনন্দ-খনি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার কহিতেছেন—

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাহ তাহাতে।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় কি কি আছে? আদর্শ পিতৃ মাতৃভক্তি, আদর্শ জ্ঞানানুশীলন, আদর্শ স্বজনানুরাগ, আদর্শ গৃহস্থ জীবন, আদর্শ ভক্তজীবন, আদর্শ নামনিষ্ঠাময় জীবন, আদর্শ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা-রসরসিক, আদর্শ ত্যাগ, আদর্শ আজ্ঞাপালন, আদর্শ প্রীতির ব্যবহার, আদর্শ বিরক্ত জীবন, আদর্শ সহিষ্ণুতা, আদর্শ প্রেমদান ও প্রচার, আদর্শ প্রেম সংকীর্ত্তন, আদর্শ প্রেমোন্মত্ততা। একমুখে কত বলিব, শ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যেক ঘটনাই আদর্শ। শ্রীগৌরাঙ্গলীলানুশীলনই, আমাদের একমাত্র সম্বল, আমাদের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত একমাত্র ঔষধি।

ম। লীলা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আলোচনা যথেষ্ট, সম্প্রতি সিদ্ধান্তাংশ আলোচনা করুন। কিশোরী বাবু বল।

কি। বাবুরা এই সকল কথার কি জানে।

ম। না, আর তোমায় বাবু বলিব না।

ভ। আমিই কেবল আপনার কৃপার পাত্র হইতে পারিলাম না।

ম। কেন? আপনাকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্বোধন করি বলিয়া?

ভ। সে যাহাই হউক, অভিমান প্রভু রাখিবেন কেন।

ম। না না, আপনি কল্পনায়ও মনে করিবেন না, আমি আপনাকে অভিমানী মনে করি। যথোচিত মর্য্যাদা ব্যতীত ব্যবহার বিশৃঙ্খলা ঘটে। মর্য্যাদা লঙ্ঘনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

ভ। আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট সেইজন্য আমার কথাতে এইরূপ কথা উঠিল।

ম। দুঃখিত হইলে আপনি যেরূপ কহিবেন, সেইরূপ সম্বোধন করিতে আমি যত্ন করিব।

ভ। আমি কিছু বলিতে পারি না, আপনার কৃপার মুখ চাহিয়া থাকিব।

ম। আচ্ছা! এখন উজ্জ্বল রসতত্ত্ব সম্বন্ধে কিশোরীচরণ বল; তুমি কিশোরীচরণ, তুমি এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে সক্ষম হইবে।

কি। সকলই প্রভুর কৃপায়।—শ্রীরাধামাধব, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে মধুর প্রীতি তাহাই উজ্জ্বল রসের অবধি। শ্রীকৃষ্ণে ব্রজজনের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর সম্বন্ধানুযায়ী যেই স্বাভাবিক প্রীতি তাহাই উজ্জ্বল রস। শ্রীকৃষ্ণই সকলের একমাত্র সম্বন্ধ, তাঁহাতে সম্বন্ধানুযায়ী প্রীতিই একমাত্র নিত্য এবং সত্য বস্তু এবং অনন্ত অপূর্ব্ব আনন্দের আকর স্বরূপ। এই প্রীতি চিন্ময় সুতরাং উজ্জ্বল। জীবের এই রসে লোভোৎপত্তি

হইলে স্বতন্ত্র ভোক্তাভিমান মন হইতে চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিয়া অন্তরে এই রসের বিষয় ভাবনা করিতে করিতে অগণন সুখ তরঙ্গে ভাসিতে থাকে। অবশেষে ভাবনা উপযোগী দেহে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সেবা লাভ করিয়া অনন্ত কালের জন্য সুখী হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি মূর্ত্তিমান, শ্রীরাধিকা রস মূর্ত্তিমতী।

ম। কেমন হেমলতা! তোমার প্রশ্নের উত্তর ক্রমশঃ হইতেছে।

হে। হাঁ।

ম। আচ্ছা, এখন বিষয় আশ্রয় তত্ত্ব নিরূপিত হউক। রাধাপদ বল।

রা। যিনি অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব, সর্ব্ব কারণ কারণ, পরম পুরুষ একমাত্র তিনি এই উজ্জ্বল রসের বিষয়; তিনি শ্রীযশোদানন্দন, তিনি শ্রীগোবিন্দ, সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। শাস্ত্র কহিতেছেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥

তিনি ব্যতীত আর কেহ এই রসের বিষয় হইতে পারেন না। কেননা কারণ যেরূপ অদ্বয় তত্ত্ব, বিষয় সেইরূপ অদ্বয় পরম পুরুষ, তিনি ঐশ্বর্য্য-খনি, মাধুর্য্য পারাবার, সর্ব্বগুণধাম, প্রেম বিগ্রহ। তিনি, 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন' এবং তাঁহার 'শতকোটী গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ'। একমাত্র বিশুদ্ধ নিরুপাধি গোপী প্রেমের তিনি বশীভূত। তাঁহার বেণুমাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য এবং লীলামাধুর্য্যে ব্রজসুন্দরীগণ নিরন্তর সন্তরণ করিতেছেন। ব্রজজন এই প্রেমের আশ্রয়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত কহিতেছেন,—

যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হৈয়া বিচারিলে আছে তারতম॥

রসের বিচারে মধুর ভাবেরই উৎকর্ষতা প্রতিপাদিত হয়। ব্রজগোপীগণ এইরসে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বোত্তমা,—

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর মদীয় ভাব ; ইহা আর মধুর রসের অন্য কোন পাত্রে দৃষ্ট হয় না।

ম। রমণী! বিগ্রহ তত্ত্ব বল।

র। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। সৎ বুঝিতে যাঁহার দৈশিক, কালিক বা বাস্তবিক পরিচ্ছেদ নাই। অর্থাৎ যিনি দেশ, কাল বা বস্তু কর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ, সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী যুগপৎ শক্তিত্রয় প্রধান। কান্তাগণ হ্লাদিনী প্রধান, নর্ম্ম সখাগণ সন্ধিনী এবং হ্লাদিনী প্রধান। মাতা, পিতা, দাস, দাসী সকলেই সন্ধিনী প্রধান।

ম। যাঁহারা বিগ্রহ মানেন না, তাঁহাদের কি বলিয়া বুঝাইতে হইবে।

র। শব্দ মাত্রেরই স্বরূপ বা বিগ্রহ আছে। রাগ, রাগিণীগণের বিগ্রহ আছে বলিয়া আমরা শাস্ত্র প্রমাণে জানিতে পারি। আমি বা আর কেহ দেখে নাই বলিয়া, তাঁহাদের স্বরূপ অস্বীকার করা স্থূল দর্শিতার পরিচয়। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময় যে স্থূল মূর্ত্তি তাহাই আমরা স্থূল দৃষ্টি সহায়ে দর্শন করিতে সমর্থ হই। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময় সূক্ষ্ম বা কারণ শরীর পর্য্যন্ত দর্শন করিতে আমরা অনেকে অশক্ত, তাহার কারণ আমাদের স্থূলাভিনিবেশ এবং স্থূলে আসক্তি। আত্মেন্দ্রিয় সুখাভিলাষ হৃদয়ে যে পরিমাণ আধিপত্য লাভ করিয়াছে আমাদের স্থূলে অভিনিবেশ এবং

আসক্তিও সেই পরিমান। এই অভিনিবেশ এবং আসক্তি বশতঃ আমরা স্থুলের সূক্ষ্ম কিম্বা কারণ বিগ্রহ অনুভব করিতে অসমর্থ, শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ স্বীকার করিব কিরূপে? স্থূলে অভিনিবেশ এবং আসক্তি ত্যাগ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে কারণে অতঃপর তুরীয়ে দৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। চিত্ত আত্মসুখাভিলাষ বিবর্জ্জিত না হইলে ভগবৎ বিগ্রহ তত্ত্ব ধারণা অসম্ভব।

কথোপকথম করিতে করিতে অপরাহ্ন হইয়া আসিল। সকলেরই চিত্ত সৎপ্রসঙ্গালোচনায় আবিষ্ট। এরূপ নির্ম্মল আনন্দোপভোগ বোধ হয় আর কেহ কখনও করেন নাই। স্বজাতীয় মিলনে কি সুখ, কি আনন্দের উৎসব হয়, বর্ণনার অতীত। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধের মিলন এইরূপ সুখের, আনন্দের, ইহা বুঝিয়া আমরা যদি পরস্পর মিলিত হই, তাহা হইলে সংসারও সুখের, অরণ্যও সুখের। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া মিলিত হইলে সেই মিলন কেবলমাত্র বিষানল উদ্গীরণ করে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়,—

শুনিলে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয়।

কি। প্রভু! অপরাহ্ন হইয়া আসিল, উদ্যানে একটু বেড়াইলে ভাল হয়।

ম। চল, উদ্যানে ভ্রমন করিয়া আসি।

ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধারমণের সরবত এবং নানাবিধ ফল প্রসাদ লইয়া আসিলেন।

ম। দেখ কিশোরীচরণ! রাধারমণ ত ছাড়িতেছে না, আমিও আর পারিতেছি না।

কি। একটু সরবত খান, ইহা পরিপাক-শক্তি-বৃদ্ধি-কারী।

ন। তবে আর আমার কোন আপত্তি নাই, কেননা আরও প্রসাদ দর্শনের আশা আছে।

মহাপুরুষ সরবত পান করিলে পর সকলেই কিছু কিছু সরবত পান করিয়া তাঁহার সহিত উদ্যান ভ্রমনে বহির্গত হইলেন। সকলেরই চিত্ত আনন্দোৎফুল্ল, সকলেরই বদন উল্লসিত, সকলেই এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অভিনব রসে উচ্ছলিত হৃদয়।

ম। উদ্যানটী বড় মনোরম। কিশোরীচরণ! রাধারমণকে উদ্যানে বেড়াইতে লইয়া আসিবে।

কি। আমিত তাঁহার সেবা কিছু জানি না, প্রভু! যেরূপ আজ্ঞা করিবেন।

ম। এই উদ্যানে রাধারমণ নিশ্চয়ই বেড়াইতে আসেন, তবে তোমরাও লইয়া আসিবে।

হে। এই উদ্যানে রাধারমণের সহিত আপনার নিশ্চয়ই দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

ম। কেবল রাধারমণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবে কেন, শ্রীরাধা, রাধারমণ, দুইজনের সহিতই দেখা হইতে পারে।

হে। একা রাধারমণের সহিত দেখা হইলেই বা আপনার ভয় বা অপমান কি?

ম। না, আমাদের ভয় কি, আমরা প্রিয়াজির অনুগত।

হে। আপনাকে রাধারমণের অনুগত জানিয়াই আমি ঐরূপ কহিয়াছিলাম।

গৌরপ্রিয়া হাসিয়া উঠিল।

হে। সই! হাসিও না, একটী সন্দেশ খাইয়াছ।

ম। দেখ হেমলতা! প্রিয়াজি রাধারমণের অনুগত হইলে কাজেই আমাদেরও প্রিয়াজির আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়।

হে। রাধারমণ প্রিয়াজির একান্ত অনুগত হইলেও আমরা রাধারমণের অনুগত হই না।

ম। তোমরা কপট, মুখে এককথা,—মনে এককথা।

হে। আপনারা সরল লোক, রাধারমণের আনুগত্যই তাহার পরিচয়।

ম। তুমি রাধারমণকে কি মনে কর।

হে। তিনি বড় ভাললোক, তবে বাল্যকালে মাখন চুরি করিতেন, লোকের বাড়ী উৎপাত করিতেন, স্ত্রীলোকের কাপড় চুরি করিতেন, আর কৈশোরে পরস্ত্রীগণকে লাঞ্ছনা করেন।

ম। যাঁর বংশীধ্বনি শ্রবণে, যাঁর রূপ দর্শনে ব্রজগোপীগণ উন্মাদিনী, তিনি আমার শ্রীরাধারমণ।

হে। রূপ দর্শনে পাগল হইয়া রাধারমণ বংশীধ্বনি দ্বারা কাতরতা সহকারে যাঁহাকে আহ্বান করেন, যাঁহাকে না পাইয়া বিরহে শ্যাম স্বর্ণলতাকে আলিঙ্গন করিয়া সুখী হন, এই পথে আসিবেন কল্পনা করিয়া যাঁহার কোমল চরণে কণ্টক বিন্ধিবে ভাবিয়া কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে রাধারমণ পথের কণ্টক সকল দূরে নিক্ষেপ করেন, তিনি আমার শ্রীপ্রিয়াজি মহারাণী।

ভ। প্রভু! আপনি রাধারমণের অনুগত হইয়া হেমলতার সহিত পারিবেন না।

ম। হেমলতা ভারি কুঁদুলে।

র। আপনি হেমলতার সহিত কথা বলিবেন না।

হে। দাদার পক্ষপাতী লোক আজ মিলিল।

ম। সকলেই রাধারমণের পক্ষপাতী, তুমিও মনে মনে পক্ষপাতী, মুখে স্বীকার করিতেছ না।

হে। অনুমানে জয়লাভ করিয়া সুখী হইতে চাহিলে আর আমার বাধা দেওয়া উচিৎ নহে।

ম। তবে স্বীকার কর, তুমি রাধারমণের অনুগত।

হে। আমি প্রিয়াজির অনুগত।

ম। তুমি রাধারমণের অনুগত।

গৌ। আচ্ছা সই! তুমি বল আমি রাধারমণ প্রিয়াজির অনুগত। 'রাধারমণ-প্রিয়াজি' নাম উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রাণে অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ উঠিল। গৌরপ্রিয়া অবশ দেহে হেমলতার অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল। হেমলতা সইয়ের গণ্ডে মুখদিয়া নিঃশব্দে একটি চুম্বন করিল। গৌরপ্রিয়ার তদবস্থা সন্দর্শনে সকলে বিস্মিত। অর্দ্ধ বাহ্য দশা লাভ করিয়া গৌরপ্রিয়া অনেক প্রলাপ কহিল। পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার কিয়দংশ এইস্থানে বর্ণনা করা যাউক। গৌরপ্রিয়া কহিল, সই! রাধারমণ-প্রিয়াজির মিলনই আমাদের প্রাণ, সেই মিলন-সুখই আমাদের হৃদয়, তাঁহাদের মিলন-পটুতাই আমাদের মনোবৃত্তি। তাঁহাদের বিরহই আমাদের শতসহস্র মৃত্যু বিরহদুঃখই আমাদের শতধা হৃদয়-বিদারণ, মিলন-কৌশল-অজ্ঞতাই আমাদের অসীম মনোদুঃখ। আমরাত সত্যই শ্রীরাধারমণ-প্রিয়াজির অনুগত। আমরা দুইজনকে একত্র দেখিলে সুখী হই, দুইজনকে ভিন্ন দেখিলে দুঃখী হই। সেই সুখেরও সীমা নাই, সেই দুঃখেরও সীমা নাই। সকলেই আমরা শ্রীরাধারমণ-প্রিয়াজির অনুগত, তাঁহাদের প্রেমের ক্রীত চির কিঙ্করী। আমাদের মধ্যে অশান্তি নাই, বিবাদ নাই কেবল তাঁহাদের মিলন সুখে আমরা দিবানিশি ভোর। গৌরপ্রিয়া আরও অনেক কথা বলিল, সকলে তৃষিত প্রাণে গৌরপ্রিয়ার

অমৃতময়ী বচনাবলী পান করিতে সম্পূর্ণ তন্ময়। কিয়ৎকাল পরে গৌরপ্রিয়া বাহ্য চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কহিল, সই! আমি কি তোমাদের কিছু বলিয়াছি। হেমলতা কহিল, না সই! তুমি কিছু বল নাই।

কি। আর বাহিরে থাকা ভাল নয়, প্রভু! চলুন, ভিতরে যাই।

ম। কিন্তু দেখ, কেমন জ্যোৎস্না উঠিতেছে।

হে। আপনি জোছনা ভালবাসেন।

ম। জ্যোৎস্না সকলেই ভালবাসে।

হে। আপনার অমাবস্যার অন্ধকার ভালবাসা উচিৎ।

গৌ। দেখ সই! এই কথা তোমার অন্যায়।

ম। বল দেখি গৌরপ্রিয়া! এই কথায় হেমলতাকে কি বলিতে ইচ্ছা করে।

হে। আমি কি অন্যায় বলিলাম।

গৌ। ইন্দ্র-নীলমণি-দ্যুতিময় শ্রীকৃষ্ণকে অমাবস্যার অন্ধকার বলা অন্যায়।

হে। সই! তুমি আমি যাই বলি, শ্রীপ্রিয়াজির তপ্তহেমকান্তির তুলনায় তোমাদের কালমাণিকের রং কাল।

গৌ। আচ্ছা সই! সেই দুই খানি মুখ একত্র পাশাপাশি দেখ দেখি; দুইখানি মুখই কমনীয়, ললিত। দুইখানি মুখই প্রেমে গড়া, প্রেমে ভরা। দুইখানি মুখই, পরস্পরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে, দুই খানি মুখই আমাদের নেত্র পুতলী।

ম। এইবার ঠিক হইয়াছে, আপনার সইয়ের কাছে আপনি পরাস্ত।

হে। আপনার কাছেত পরাস্ত হইনি, আমার সই, তাহার কাছে জয়ই বা কি পরাজয়ই বা কি।

কি। গৌরপ্রিয়া বিবাদভঞ্জনে বড় পটু। প্রভুর কৃপাপুষ্ট বস্তুর আশ্চর্য্য ক্ষমতা আজ প্রত্যক্ষীভূত। এখন চলুন প্রভু।

ম। চল আমরা যাই।

সকলে গমনোদ্যোগী হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ইষ্টগোষ্ঠী সমাপ্তি।

সন্ধ্যাকাল। জীবনে অনেক কাল অতিবাহিত করিয়া থাকি, কিন্তু কোন্ কালের কোন্ ক্ষণে আমি প্রকৃত বিমল আনন্দ ভোগ করি, এই কথাটা যদি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তাহা হইলে অবশ্যই কোন না কোন উত্তর পাইব। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারের এত অধীন হইয়াছি যে, তদনুযায়ী চলিতে নানাবিধ কষ্ট যন্ত্রণা পাইলেও তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রয়াসী হইব না। সংসারের ভালবাসায় প্রকৃত সুখ নাই, এ কথাটা জানি কিন্তু বুঝিতে চাই না। সাধুর নিকট পরামর্শ করিব, এই বুদ্ধি না হইলেও অবসর মত নিজ হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিতেও অভিপ্রায় করি না। যে সকল দুষ্ট সংস্কার আমার উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের দাসত্ব করিতেই আমার দিন যাইবে। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গালোচনায় সুখ, শ্রীভগবানের প্রেম পীযূষময় নামে সুখ আর সেবায় সুখ, এতদ্ব্যতীত সংসারে আর কোন সুখের সংবাদ কেহই দিবে না।

আজ কিশোরী বাবু যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাহা মধ্যে মধ্যে তাঁহারই মুখে ব্যক্ত হইয়াছে, পাঠকগণ! অবশ্যই অবধান করিয়াছেন। এরূপ সুখ তিনি জীবনে আস্বাদন করেন নাই, কিশোরী বাবুর এই ধারণা কি মিথ্যা? কখনই না। রক্তমাংসের আব্‌দার রক্ষায় সুখ থাকিলে কিশোরী বাবুর আজিকার অনুভব মিথ্যা হয়। রসিকশেখর শ্রীভগবদ্ বিস্মৃতির হেতু যে ইন্দ্রিয় সুখ, তাহাকে কে প্রকৃত সুখ বলিবে? সাধুসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির নিদানভূত, তদীয় নামকীর্ত্তন তাঁহাতে আসক্তির

হেতু, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তসেবা প্রকৃত আনন্দের কারণ। অতএব সংসারে যাহাতে আমরা অন্তরায়-শূন্য হইয়া সাধুসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনসেবা করিয়া প্রকৃতসুখে থাকিতে পারি, তাহারই উপায় বিধান করা আমাদের কর্ত্তব্য।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কিশোরী বাবু—সকলে হৃদয় ভরা আনন্দে মহাপুরুষের অনুগমন করিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অগুই বাটী প্রত্যাগমন করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ভুল হইয়া গিয়াছে, স্মরণ করিয়া গৌরপ্রিয়াকে কহিলেন, দেখ গৌরপ্রিয়া! আমাদের ত আজ বাড়ী যাওয়া হইল না'।

কি। আজ আর বাড়ী যাওয়া কেমন করিয়া হইবে।

ম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! একদিন সকলে মিলিয়া একত্রে রহিব, মনে বড় সাধ হইয়াছিল, তাহা প্রভু পূর্ণ করিলেন। আপনি আজ আর যাইতে পারিবেন না, আগামী কল্য গৃহে গমন করিবেন।

ভ। প্রভু! চিরদিনই এমনই যাক্, ইহাই সকলের সাধ।

কি। ঠিক বলিয়াছেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়!

ম। চিরদিনই এমনই যাইবে।

কি। আপনার কৃপার অপেক্ষা।

ম। প্রভু অনর্পিত বস্তু জীবে অর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে না।

কি। আমরা বিশ্বাস কোথায় পাইব প্রভু!

ম। বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য প্রভু অনেক দেখাইয়াছেন এবং দেখাইতেছেন, কিন্তু আমরা শুনিয়াও শুনিব না, দেখিয়াও দেখিব না।

কি। প্রকৃতই আমাদের অনুভব নাই, অনুভব করিতে চাই না, সেই জন্যই আমাদের বিশ্বাস জন্মিতেছে না।

ম। অনুভব, অনুতাপ, ব্যাকুলতা, লালসা, অনুশীলন, কৃপাবলম্বন, উৎকণ্ঠা অনন্তর প্রাপ্তি। একটী কোন ক্রম ব্যতীত লীলা বিশৃঙ্খলা হয়, তাহাতে ইষ্ট এবং সাধকের মিলনে সুখ হয় না।

ভ। ইহা অতি রহস্য কথা।

ম। বুঝিয়াছেন কি?

ভ। প্রভুর কৃপায়।

ম। এস আমরা বিশ্রাম করি। হেমলতাকে আর আমরা দলে লইব না।

গৌ। কেন?

ম। হেমলতা বড় ঝগড়া করে।

গৌ। আপনিও ত সইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেন। তা'হলে আপনারা দুইজন এক দলে।

ম। তুমি হেমলতার সই কিনা?

গৌ। আমরা সকলেই সই!

ম। কেমন করিয়া?

গৌ। সকলেই শ্রীরাধারমণ-প্রিয়াজির কিঙ্করী।

ম। তুমি নিতাই গৌর পূজা কর।

গৌ। একই লীলা।

ম। কেমন?

গৌ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলায় যেমন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, শ্রীরাধা পরমা আশ্রয়; শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ লীলায় সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়, শ্রীমন্নিত্যানন্দ পরম আশ্রয়।

ম। একই লীলা কিরূপে হইল?

গৌ। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীনিত্যানন্দ

মহাভাবঘন মূর্ত্তি। শ্রীগৌরসুন্দর যখন যে ভাবে আবিষ্ট, শ্রীনিতাইচাঁদ তদনুকুলভাবে তাঁহাকে সুখী করিতে তৎপর।

ম। কিরূপে?

গৌ। শ্রীগৌরাঙ্গের যখন রাধাবেশ, শ্রীনিত্যানন্দের তখন কৃষ্ণাবেশ, তাঁহার যখন শ্রীকৃষ্ণাবেশ, প্রভু তখন রাধাবেশে তাঁহাকে সুখী করেন।

গৌরপ্রিয়ার কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মহাপুরুষ আবেশভরে 'আবার বল, আবার বল' বলিয়া মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন তদীয় শ্রীঅঙ্গ রক্তিমাভা ধারণ করিয়া পুলকাবৃত। নয়নে অশ্রু প্রবাহ। গৌরপ্রিয়াও আবিষ্ট চিত্তে একটী পদ গান করিতে আরম্ভ করিল, সকলে ভাবপ্রবণ অন্তরে গৌরপ্রিয়ার সংগীতে যোগদান করিলে যে অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রস্রবণ উৎকীর্ণ হইল, পাঠকবর্গ! আসুন, আমরাও তাহাতে অভিসিঞ্চিত হইয়া পবিত্র হই।

অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়।
নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই কথা সে কয়॥
সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়ন তারা।
দশদিকময় নিতাই সুন্দর, নিতাই ভুবন ভরা॥
রাধার মাধুরী অনঙ্গমুঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে।
কোটী শশধর, বদনসুন্দর, সখাসখী বলদেবে॥
রাধার ভগিনী, শ্যাম সোহাগিনী, সবসখীগণ প্রাণ।
যাহার লাবণি, মণ্ডপ সাজনি, শ্রীমণিমন্দির নাম॥
নিতাই সুন্দরে, যোগপীঠে ধরে, রত্নসিংহাসন শেষে।
বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলাসে সখীর মাঝে॥
কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি মুখ সর্ব্ব অঙ্গ।
নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন রঙ্গ॥

নিতাই বলিয়া, দুবাহু তুলিয়া, চলিব ব্রজের পুরে।
দাস বৃন্দাবন, করে নিবেদন, নিতাই না ছেড়ো মোরে॥

সঙ্গীত সমাপ্ত হইল। সকলের মুখ প্রেমোজ্জ্বল, আনন্দোদ্ভাষিত, গৃহটী সুষমামণ্ডিত, সকলে নীরব। ক্ষণকাল পরে মহাপুরুষ কহিলেন, 'আজ তোমরা আমায় বড় সুখী করিলে, আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীকৃষ্ণে তোমাদের গাঢ় অনুরাগ হউক'।

কি। আপনার শুভাগমনে আজ আমাদের স্মরণীয় দিবস।

ম। আমি একবার বহির্দ্দেশে যাইব।

মহাপুরুষ গৃহ হইতে গমন করিলে পর, হেমলতা গৌরপ্রিয়াকে কহিল, সই! চল, আমরাও একবার বাহিরে যাই। দুই সহচরী নিভৃত একটী প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপবেশন করিলে যে কথোপকথন হইল, তাহা পাঠকবর্গকে শ্রবণ করাইতেছি।

হে। সই! এইবার তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর।

গৌ। আমি ত তোমারই, তুমি যা' বলিবে তা'ই করিব।

হে। স্বীকার করিলে।

গৌ। একদিন সেই গঙ্গাতীরে 'আমি তোমার' হইয়াছি, আর নূতন কি স্বীকার করিব!

হে। তবে আরও বিলম্ব করিয়া কহিব।

গৌ। তোমার যেমন অভিপ্রায়।

হে। আচ্ছা সই! কেন তুমি আমায় এত আত্মদান করিতেছ?

গৌ। জানি না।

হে। বলনা সই!

গৌরপ্রিয়া সইয়ের কথার উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভালবাসা বলিতে পারে না, 'কেন ভালবাসি'। হেমলতা গৌরপ্রিয়ার

মুখকমল স্বীয় বক্ষঃদেশে লইয়া অনেক সোহাগ করিলে গৌরপ্রিয়া সুস্থ হইল।

হে। আমি নিষ্ঠুর, তোমায় কাঁদাইলাম। আমি জীবনে কাহাকেও সুখ দিই নাই—দিতে পারিব না। আমি অভাগিনী।

হেমলতার বেদনা আরও গুরুতর। কিন্তু নীরবে সে আপন দুঃখরাশি ভোগ করিতেছে। কি দুঃখ, সময়ান্তরে পাঠকগণকে নিবেদন করিব।

গৌ। একথা মিথ্যা সই! তুমি আমাদের হৃদয়ের মণি।

হে। তোমরা নিজগুণে এই নির্দ্দয়কে ভালবাস।

গৌ। ছিঃ সই! বারবার ঐ কথা মুখে আনিও না।

হে। সই! তুমি কাল যাবে?

গৌ। হাঁ, কাল যাওয়া হবেই।

হে। আমার কাছে দুই চারিদিন থাক না সই!

গৌ। সেবা না করিয়া?

হে। আমি তোমায় সেবা দিব।

গৌ। আমার নিতাই গৌর কোথায় পাইব?

হে। এখানে আনিব।

গৌ। না ভাই!

হে। কেন?

গৌ। তুমি কি বলিতেছ?

হে। তবে থাকিবে না?

গৌ। কি করিয়া থাকি?

হে। তবে আমায় তোমাদের বাটী লইয়া চল।

গৌ। গরীবদের বাটীতে তোমায় লইয়া যাইতে সাহস হয় না।

হে। আমি বড়লোক হইলাম।

গৌ। তুমি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর দাসী। আমি গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ী ঝাড়ু করিয়া জীবনধারণ করি।

হে। আমরা ত ভাই! গোয়ালিনী আর তোমার ব্রাহ্মণটীও গোয়ালা ছিলেন।

গৌ। তুমি যদি যাও তবে আহ্লাদের সীমা নাই।

হে। আমি বাবাকে বলিব।

গৌ। আমিও বলিব।

হে। চল ভাই যাই, প্রভু আসিয়াছেন।

গৌ। তোমার প্রসঙ্গ বাকি আছে।

হে। এইবার হ'বে।

দুই সই কিশোরী বাবুর প্রকোষ্ঠে আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিল।

ম। তোমরা কোথায় ছিলে?

হে। তা আপনার অনুসন্ধানে কাজ কি?

ম। গোপনে গোপনে তোমাদের পরামর্শ, এর মূলে কিছু আছে।

হে। দেখেছ সই! কে কুঁদুলে!

ম। তা বল্লে কি হবে, কি পরামর্শ হচ্ছিল বল।

হে। আমি বল্‌ব না।

ম। দেখ গৌরপ্রিয়া! কে কুঁদুলে!

গৌ। আচ্ছা আমি আপনাকে বলিব, এখন সইয়ের প্রসঙ্গ হউক।

ম। গৌরপ্রিয়ার মনে কুটীনাটী নাই।

হে। আর আপনার মনেও নাই।

ম। নিশ্চয়।

গৌ। আজ প্রসঙ্গ সমাপ্ত হওয়া চাই।

ম। গৌরপ্রিয়া লীলাতত্ত্ব বল।

হে। সই! তুমি বলিও না।

ম। গৌরপ্রিয়া! বলিবে না?

গৌ। আপনি বলুন।

ম। দেখ, তোমার সই প্রশ্নকারিণী, আমি শ্রোতা, আর তোমরা সকলে বক্তা।

গৌ। সই যে নিষেধ করিতেছে।

হে। না সই, তোমার ইচ্ছা হয়, বল।

গৌ। আজ আমাদের ইচ্ছায় কিছু হইতেছে না।

ম। তুমি বল গৌরপ্রিয়া!

গৌ। লীলার প্রয়োজন প্রেম, প্রেম শ্রীভগবানের স্বভাব। ইহাই তদীয় সচ্চিদানন্দময়ী বৃত্তি। অতএব শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী বৃত্তির বিকাশই লীলা। লীলাপরিপাটী বুঝিতে হইলে দুইটী স্বতঃসিদ্ধ বাক্য স্বীকার করিতে হয়। প্রথম, ভাববৈপরীত্য ব্যতীত লীলা-পরিপাটী হয় না। দ্বিতীয়, ভাববৈরুদ্ধ্য ব্যতীত লীলা-পরিপাটী হয় না। প্রেম-স্বভাব প্রয়োজনে, পরিপাটী, ভাববৈপরীত্য, যথা—বিপ্রলম্ভ, সম্ভোগ। প্রেমসাধন প্রয়োজনে, পরিপাটী, ভাববৈরুদ্ধ্য, যথা—সম্বন্ধ- (শ্রীকৃষ্ণ) স্মৃতি এবং সম্বন্ধ-বিস্মৃতি। শ্রীভগবান অতি রসিকজন। তাঁহাতে এত সৌন্দর্য্য, এত মাধুর্য্য যে তাঁহার সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহারই অভিলাষ হয়। তিনি আপনার মাধুর্য্য আস্বাদনে আপনি বিভোর। আবার কখনও তিনি আপনাকে হারাইয়া আপনি কাঁদিতেছেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনাকেই অন্বেষণ করিতেছেন। শ্রীভগবান কিরূপ রসিক, কেন তিনি এই সকল খেলা খেলিতেছেন, যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন,

তাঁহারা কিছু কিছু অবগত আছেন। এইরূপে শ্রীভগবান অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশে অনন্ত শক্তি বিস্তার পূর্ব্বক বিবিধ রসময়ী লীলা-পরায়ণ। শক্তি, শক্তিমান তত্ত্বে অভেদ হইয়াও লীলায় ভেদ প্রকাশ হেতু অচিন্ত্যভেদাভেদ রহস্তের অবতারণা।

ম। সৃষ্টি তত্ত্ব, পুরুষ তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব একই প্রশ্নের অন্তর্গত। হেমলতা তুমি কিছু শুনাইবে না ?

হে। যার প্রশ্ন, তার মুখেই উত্তর হওয়া সঙ্গত। আর যাঁহার প্রতি প্রশ্ন, তাঁহার শুনাই কর্ত্তব্য।

ম। আমি জানি, তুমি আবার আমার কথা শুনিবে ?

হে। দেখুন, আপনার একটী ভাল অভিযোগ।

ম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলুন।

ভ। আজ আমাদের মুখে প্রভু বক্তা।

শ্রীভগবানের অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃজনের প্রয়োজন প্রেমসাধন। তাঁহার ইচ্ছায় তদীয় দ্বিতীয় প্রকাশ শ্রীবলরাম পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া কারণার্ণবে শয়ন করিলেন। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পুরুষের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধান-গুণ-ভাগিব।
তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥

যিনি পরমেশের অংশরূপ, প্রধানগুণ-সম্বন্ধের ন্যায় প্রতীত পরন্তু শুদ্ধ, নির্লিপ্ত, প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা, নানাবতারাবিষ্কারকারী, তিনি পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। পরব্যোমের বহির্দ্দেশে এক জ্যোতির্ম্ময় ধাম আছে। এই ধাম পরিবেষ্টন করিয়া যে অপার জলনিধি বিরাজিত, তাহার নাম কারণ সমুদ্র। এই কারণ সমুদ্রের জল চিন্ময়, তাহারই এককণা পতিতপাবনী সুরধুনী। মায়াশক্তি এই কারণ সমুদ্র স্পর্শ করিতে পারেন

না, তিনি কারণাব্ধির বাহিরে অবস্থান করেন। মায়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবনিচয়কে নানাবিধ দুঃখ দান করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করেন। এই মায়া শ্রীভগবচ্ছক্তি। শ্রীভগবানের প্রকাশ শক্তিতে যাহার প্রকাশ, পরন্তু যথায় তাঁহার প্রকাশ তথায় আর যাহার প্রকাশ থাকে না, এমন যে দ্রষ্টৃ এবং দৃশ্যানুসন্ধানকারিণী শক্তি তাহার নাম মায়া।

মায়া দুই প্রকারে অবস্থান করেন, উপাদানরূপে প্রধান বা প্রকৃতি, নিমিত্তরূপে মায়া। এই মায়া শ্রীভগবান কর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে সক্ষম হন। কারনার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ দূর হইতে ঈক্ষণপাতে মায়াতে জীবরূপ বীর্য্য আধান করেন। তাহাতে মায়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ প্রসব করেন। তদনন্তর পুনরপি ঐ পুরুষ এক এক অণ্ডে এক এক মূর্ত্তিতে দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজাঙ্গ স্বেদ জলে অণ্ডার্দ্ধ পূর্ণ করিয়া শেষ-শয্যায় শয়ন করেন। অপরার্দ্ধে চৌদ্দভুবন প্রকাশ করেন। গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষের নাভিদেশ হইতে এক আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় পদ্ম উৎপন্ন হয়, সেই পদ্মে ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া অসংহত তত্ত্ব সমুদয় সংযোজনদ্বারা সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। ঐ দ্বিতীয় পুরুষই বিষ্ণুরূপে তৃতীয় পুরুষ এবং সত্ত্বগুণাবতার রূপে পালন কার্য্য করেন এবং রুদ্র তমোগুণাবতার রূপে সংহার কার্য্য করেন।

প্রথম পুরুষ মায়াতে বীর্য্যাধান করিলে পর প্রথম, অহঙ্কার; দ্বিতীয়, চিত্ত, বুদ্ধি, মন, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ (পঞ্চতন্মাত্র), পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট। এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণের উপাদান।

বলা হইয়াছে, জীব শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি। জীবের স্বরূপ 'নিত্য কৃষ্ণ দাস'।—

জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস।

প্রাকৃত তত্ত্ব কর্তৃক আবরিত হইয়া জীবের যেরূপই স্বভাব হউক না কেন, এবং সেই স্বভাবানুযায়ী যেরূপ গঠনই লাভ করুক না কেন, সে গঠন, সে আকৃতি, সকলই নশ্বর। পরন্তু স্বরূপ, "নিত্য কৃষ্ণ দাস"—নিত্য, অবিনশ্বর। প্রেম জীবের স্বরূপসিদ্ধ বস্তু, শ্রবণ কীর্ত্তনে হৃদয় শুদ্ধ হইলে নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় তাহা সমুদিত হইয়া চিত্ত আলোকিত এবং প্রফুল্লিত করে।

জীব শক্তি, শ্রীভগবান শক্তিমান। শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ কি? শক্তিমানের শক্তি এবং শক্তির শক্তিমান, পরস্পর নিত্য অবিচ্ছিন্ন একটী মধুর সম্বন্ধ। যেমন পিতার পুত্র এবং পুত্রের পিতা; স্বামীর স্ত্রী এবং স্ত্রীর স্বামী, দুই কথাই যথার্থ; সেইরূপ শক্তি এবং শক্তিমানে তদীয় মদীয়-ভাবাত্মক সম্বন্ধ বর্ত্তমান। উভয়ে তত্ত্বে অভেদ হইয়াও প্রেম প্রয়োজনে লীলা বিস্তার হেতু প্রকাশে ভেদ স্বরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিরূপে পরস্পর অভেদ ও ভেদ এবং অভেদ হইয়াও ভেদ আবার ভেদ হইয়াও অভেদ, এসমুদয়ই অচিন্ত্য অর্থাৎ মনুষ্য চিন্তার অতীত বিষয়।

ম। বেশ; এইবার কিশোরীচরণ, উপাসনাতত্ত্ব বল।

কি। সাংসারিক সম্বন্ধ-সুখ উপভোগ করিতে গিয়া মানব যখন নানাবিধ যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়, সেই সময় হিতাহিত বিবেক সম্পন্ন জন সাংসারিক সম্বন্ধ-সুখের ইতরতা নির্দ্ধারণ করিয়া প্রকৃত সম্বন্ধ-তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাকুল হয়। অকপট ব্যাকুলতার গাঢ়তায় জীবের সাধুসঙ্গ ঘটে। সাধু সহবাস প্রভাবে জীবের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। এই তত্ত্বজ্ঞান জীবকে শ্রীভগবতোন্মুখ

করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত করে। উপাসনা অর্থাৎ পূজা বা পরিচর্য্যা। জীব শ্রীভগবৎসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাঁহাকেই মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, ভাল বাসে। ভালবাসাধীন জনের চেষ্টা পরিচর্য্যা। পরিচর্য্যাই ভালবাসার প্রাণ। পরিচর্য্যা ব্যতীত প্রীতি বাঁচে না। শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের ভালবাসা এবং পরিচর্য্যা মনে মনে; এই মনন বড় আনন্দদায়ী ও বড় মধুর। যেরূপ প্রাকৃত জগতে অবিবাহিতা কিশোরীর স্বামীবিষয়ক মনন বড় মিষ্ট লাগে, তদ্রূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধাভাবাপন্ন সাধকের প্রীতিযোগে শ্রীভগবদ্‌চিন্তা বড় আনন্দদায়ী। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীভগবান কে? আমাদের অন্তঃকরণের বৃত্তি সহায়ে যদি শ্রীভগবানকে ভাবিতে যাই, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রেমময়, জ্ঞানময় এবং কর্ম্মময় ভাবা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আর কি ভাবনা হইতে পারে? জীব শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি। জীবের প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত উভয়বিধ তত্ত্বে প্রবেশ আছে। শ্রীভগবত্তত্ত্বানুশীলন করিতে জীবই উপযোগী এবং এই উপযোগিতা শ্রীভগবদ্দত্ত। প্রেমময়তা, জ্ঞানময়তা এবং কর্ম্মময়তার সাক্ষাৎ আদর্শ যদি অন্বেষণ করি, ইতিহাস কাহাকে দেখাইয়া দেয়? যিনি ব্রজে পিতা মাতা, দাস দাসী, সখামণ্ডলী এবং অনন্ত ব্রজসুন্দরীগণকে এককালে ভালবাসিয়া তাঁহাদিগকে উজ্জ্বল রসের তরঙ্গে ভাসাইয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনে তিনি প্রেমময়তার আদর্শ। যিনি মথুরা এবং দ্বারকায় অসীম সাহসী যুদ্ধবীর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন, রাজনীতি বিশারদ, কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়চিত্ত; যিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অভ্যাগতজনের পদপ্রক্ষালন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি কর্ম্মময়তার আদর্শ। যিনি কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথে গীতার জনক, দ্বারকায় উদ্ধবের নিকট বিজ্ঞান বক্তা, তিনি জ্ঞানময়তার আদর্শ; তিনি শ্রীভগবান অনাদি, সর্ব্বকারণকারণ, তিনি শ্রীগোবিন্দ।

শ্রীভগবদ্‌সম্বন্ধ, তদীয় সেবানন্দ ভুলিয়া আমরা সাংসারিক ভোগ-বাসনায় জড়িত ও যন্ত্রণাগ্রস্ত। সাধু, শাস্ত্র, গুরুকৃপায় হৃদয়ে ঐ সম্বন্ধ স্মৃতি জাগিলে মন উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় এবং সেবানন্দে ডুবিয়া গিয়া ইতর ভোগ সুখে বীতরাগ হয়। চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধানুযায়ী রস চতুর্ব্বিধ, যথা, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। তদনুক্রমে সেবারও চারিবিধ তারতম্য। দাস্যের দাস্যোচিত, সখ্যের সখ্যোচিত, বাৎসল্যের বাৎসল্যোচিত এবং মধুরের মধুরোচিত সেবায় শ্রীকৃষ্ণ পরিতৃপ্ত। পরন্তু দাস্যের সেবা সখ্যে, দাস্য এবং সখ্যের সেবা বাৎসল্যে, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্যের সেবা মধুরে বর্ত্তমান। সকল রসই সর্ব্বোত্তম। তবে উক্ত তটস্থবিচারে মধুর রসেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

ম। আচ্ছা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিষয়ে তোমরা যে সমুদয় আলোচনা করিলে আমার কিন্তু শ্রীগ্রন্থ সম্বন্ধে একটা কথা মনে হয়, তোমরা যদি কিছু না মনে কর, তবে বলি।

হে। তবু ভাল, আপনার এইবার কিছু বলিতে মন হইতেছে।

ম। দেখ, আগে হইতেই হেমলতা একটা কিছু বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে।

গৌ। না না, আপনি বলুন, সই, আপনার সহিত আর বিবাদ করিবে না। আপনি কিছু বলিতেছেন না বলিয়াই সইয়ের দুঃখ।

ম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই আমাদের বেদস্বরূপ পূজনীয়। ঐ গ্রন্থই আমাদের সার সম্পত্তি। গ্রন্থখানি সমগ্র অনুভব করিলে মনে হয়, ইহা একটা মকর্দ্দমার, নালিশ রুজু হইতে নিষ্পত্তি বিবরণ। এই মকর্দ্দমার, আসামী জীব, ফরিয়াদি পৃথিবী, বিচারক শ্রীমন্মহাপ্রভু। আসামীর পক্ষের উকিল শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, হরিদাস ইত্যাদি; ফরিয়াদির পক্ষে উকিল জ্ঞান, কর্ম্ম এবং বিবিধ ভক্তি অঙ্গের সিদ্ধমাহাজন। পৃথিবী

পাপে ভারাক্রান্ত হইয়া জীবের বিরুদ্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। জীব সেই অভিযোগ-পত্রের উত্তরে বিচারকের নিকট জানাইল, যে আমরা কলিকবলিত দুর্ব্বল জীব, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি অঙ্গ সাধনে অক্ষম, পাপস্বভাব, আমাদের কেহ দয়া করিয়া এই পাপ হইতে মুক্ত না করিলে আমাদের আর উপায় নাই; হুজুর যেরূপ বিচার করিবেন। আমরা সম্পূর্ণ দুর্ব্বল ও অক্ষম। ফরিয়াদির পক্ষের উকিল বিচারককে নিবেদন করিল, যে, জীব কোনরূপ ধর্ম্মানুশীলন করে না, অতএব সর্ব্বদা পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিযোগে জীব অনায়াসে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া আপনার উপাসনায় পৃথিবীকে শান্তিময় করিতে পারে। আসামীর পক্ষের উকিলগণ তদুত্তরে কহিলেন, জীব কলির শাসনে নিতান্ত দুর্ব্বল, তাহাতে কোনরূপ ধর্ম্মানুশীলন করিবার তাহাদের একেবারে ক্ষমতা নাই। জীবের প্রবৃত্তি পাপাচরণ ব্যতীত আর কোন দিকে অগ্রসর হইবে না। অতএব জীবের বিরুদ্ধে পৃথিবীর অভিযোগ যুক্তিমূলক নহে। জীবের কোন শক্তি নাই, কোন সম্পত্তি নাই, জীব হইতে পৃথিবীর দাবীপূরণ হইবার কোন সম্ভব নাই। হুজুর যদি নিজগুণে অবিচারে এই বিপদ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের আর কোন গতি নাই। সকল উকিলগণই একবাক্যে জীবের স্বপক্ষে এই নিবেদন করিলেন। পরম দয়াল পতিত-পাবন বিচারক সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ, উভয় পক্ষের উকিলের সহিত বহুবিধ বিচার করিলেন। ফরিয়াদির পক্ষের সাক্ষীগণ কেহ বলিল, এইরূপ করিলে জীবের পাপপ্রবৃত্তি বিদূরিত হইবে। কেহ বলিল, নবধা ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন করিলে জীব ধর্ম্মপরায়ণ হইবে এবং পৃথিবীর আর জীবের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিবে না। আসামীর পক্ষ হইতে সকলে বলিল, জীবকে কোনরূপ ধর্ম্মাচরণ করিতে বলা বৃথা, যাহার যে

ক্ষমতা নাই তাহাকে সেই কাজ করিতে বলা অনুচিৎ। উভয়পক্ষের উকিলের তর্ক বিতর্ক এবং সাক্ষীগণের জবানবন্দী শ্রবণান্তর বিচারক জীবের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক এই মকর্দ্দমার যে রায় লিখিলেন, তাহা অন্ত্যখণ্ডে বিংশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য —

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥

'হর্ষে' অর্থাৎ পৃথিবীর এই অভিযোগ-বিচার-বিষয়ক ভাবনা চিন্তা অনেক দিবস চলিতেছে ; সহসা বিচারকের মনে একটী সুন্দর নিষ্পত্তির কথা মনে উদয় হওয়াতে তাঁহার হর্ষ হইয়াছে। সেই হর্ষে স্বরূপ রামরায়কে ডাকিয়া কহিতেছেন, ওহে স্বরূপ রামরায়! শুন, শুন, পৃথিবীর অভিযোগ সম্বন্ধে আমার মনে একটা সুন্দর নিষ্পত্তির কথা উদয় হইয়াছে। তাহা কি ?

নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

* * *

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥

* * *

সেই সর্ব্বশুভপ্রদ নাম গ্রহণের কোন বিধি নাই,—

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

নামের সাধন কি ?—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥

ইহাই নামের সাধন। এই সাধনপরায়ণ হইয়া নামকীর্ত্তন করিলে অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করিবেন।

প্রার্থনা কি? (ভক্ত সাধকের বিভিন্ন অবস্থা এবং ভাবানুযায়ী প্রার্থনার কয়েকটী ভেদ দেখাইতেছেন; যথা,—)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেখ কৃপা করি॥

ইহা ভক্তের অভিলাষবোধিকা প্রার্থনা।

শ্রীনাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কিরূপ দৈন্যবোধিকা হইবে, তাহা কহিতেছেন,—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তবপাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলিসম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥

(ভাববোধিকা যথা,—)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

প্রেম ধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দান করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

(রূঢ় ভাববোধিকা যথা,—)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূণ্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণযুগ সম।
বর্ষামেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন॥
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন।
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ॥

(অধিরূঢ় মহাভাববোধিকা,—)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

আমি কৃষ্ণপদ দাসী তিঁহো রস সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিবা না দেন দরশন জারে মোর তনু মন
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥

* * *

না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তার সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তার হয় মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥

* * *

যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ তাঁর রূপে সতৃষ্ণ
তাঁরে না পাইয়া হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায় পড়ি লঞা যাঙ হাতে ধরি
ক্রীড়া করাইঞা করোঁ সুখী॥

* * *

কৃষ্ণ আমার জীবন কৃষ্ণ মোর প্রাণধন
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ সেবা করি সুখী করোঁ
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥

* * *

এই রাধার বচন বিশুদ্ধ প্রেম লক্ষণ
আস্বাদয়ে শ্রীগৌর রায়।
ভাবিতে মন অস্থির সাত্বিকে ব্যাপে শরীর
মন দেহ ধরণ না যায়॥

* * *

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জাম্বু নদ-হেম
আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ।
সে প্রেম জানাইতে লোকে প্রভু কৈল এই শ্লোকে
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ॥

* * *

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় হৃদয়ের অতীব গভীরতম প্রদেশ হইতে এই মহাভাবসুধারাশি উদ্গীরণ করিলেন। এই ভাব এতদিন বড় গোপন ছিল।

আজ বহু কালের পর করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত ভবরোগগ্রস্ত জীব-নিচয়কে চিরানর্পিত অদ্ভুত ভাবামৃত দান করিলেন। আবার জীবগণের লোভ-সাপেক্ষতা ব্যতীত এই ভাবামৃত প্রাপ্তির কোন অন্তরায় রাখিলেন না। "তত্র লৌল্যমেব মূল্যমেকলম্"। কিন্তু এ কি? কোথায় মহাপরাধ প্রমাণিত হইয়া দণ্ডনীয় হইবে, আর কোথায় তাহার মহাভাবরত্ন-লাভ, কল্পনাতীত চিরন্তন আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশাধিকার। রায় শ্রবণে ফরিয়াদী বিস্মিত, তৎপক্ষীয় উকিলগণ স্তম্ভিত, সাক্ষীসমুদয় বাক্‌রুদ্ধ! কেমন হেমলতা! তোমার মনোমত কথা হইল কি?

হে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে ইহা মহা গভীর উপলব্ধি, নিত্য আস্বাদনের বিষয়—

ভ। শুনিতে শুনিতে হৃদয় মন এক অপরূপ রাজ্যে নীত হইয়া নব নব আনন্দময় দৃশ্য অবলোকনে তন্ময় হইয়া যায়।

কি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমরা কোথায়?

ভ। আমাদের ভাগ্যের পরিসীমা নাই, যেমন দয়ার সিন্ধু বিচারক, তেমনি বিচক্ষণ উকিল। কিশোরী বাবু, কি দেখিতেছেন?

কি। বিচারালয়, এ কিসের নির্ম্মিত? করুণা নির্ম্মিত। অট্টালিকা-নির্ম্মাণের উপাদান কৃপা বলিতেছি বলিয়া কেহ সন্দেহ করিও না। নিরুপাধি করুণা ব্যতীত এই বিচার গৃহের আর কোন উপাদান নাই। বিচারকের মুখখানি করুণা-পীযূষস্রাবী হেমকমল অথবা মৃতসঞ্জীবন অমিয়বর্ষী চন্দ্রমা অথবা পাষণ্ড-স্বভাব-বিপর্য্যয়কারী সুতীব্র ভৈষজ্য, কিবা মাতার নেত্র পুতলী, চকোরিণীর সুধারাশি, ভক্তের চিন্তামণি, মুখখানি দেখিলেই ত আসামী খালাস্, ফরিয়াদী শান্তিরস-প্লাবিত, উকিলগণ গদগদচিত্ত, সাক্ষীগণ নির্ভিকহৃদয়। তবুও বিচার এ বড় বিচিত্র!

ম। বিচারক আসামীর পক্ষের উকিলগণকে কহিলেন, জীব ত মোহ-

কারাগারে বন্দী হইয়াই রহিয়াছে, তাহাকে আর কি শাসন করিব। বরং সেই কারাগার হইতে কিরূপে মুক্তি পায়, তাহাই করিতে হইবে। অতএব তোমরা যাও, তাহাদিগকে বল, একবার হরিনাম লউক, আমি তাহাদিগকে চিরমুক্তি দান করিলাম। বিচারকের অপূর্ব্ব করুণাময়ী আজ্ঞা শ্রবণে উকিলগণ প্রেম পুলকিত হইয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে মায়াবন্দী জীবগণের দ্বারে দ্বারে যাইয়া কহিলেন, পরম কারুণিক বিচারক শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাদিগকে চিরমুক্তি দান করিয়াছেন, তোমরা,—

"ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।"

কেহ কহিল, কেহ কহিল না। কেহ এই সুখ সংবাদ শ্রবণে আনন্দ-বিবশ হৃদয়ে মনে প্রাণে কহিল, কেহ কথাটা ভাল বুঝিতে সক্ষম না হইয়া কহিল বটে, কিন্তু মন মজিল না, ভজিতে শিখিল না। যাহারা কহিল না, তাহাদের মধ্যে কেহ বলিল, 'বেশ আছি বাবা! আবার ওসব নাম টাম্, ভজা ভজি কি'? কেহ বলিল, 'হরি বলবার সময় কই, আর এ বেশ আছি, আবার হরি বলে এর চেয়ে কি সুখ হ'বে'। বহুদিনের কারাগারাবদ্ধ অপরাধী তাহার কারাগারকেই সুখাগার বলিয়া মনে করে এবং তথাকার দুঃখরাশিকে সুখ বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মে। সেই সময় উক্ত কয়েদীকে যদি রাজ্যেশ্বর কৃপা করিয়া তদীয় কোন কর্ম্মচারী দ্বারা তাহাকে সংবাদ দেন যে, 'আমি ঐ কয়েদীকে খালাস দিলাম' তখন সেই কয়েদী কারাগারাবস্থিতিতে বিলক্ষণ অভ্যস্ত, উত্তর করিল, আমিত বেশ আছি, খাইতে পরিতে পাই, আবার কোথায় যাইয়া উপার্জ্জন করিব, আবাস নির্ম্মাণ করিব, আহারের সংস্থান করিব? আমার আর খালাসের প্রয়োজন নাই, আমি ভালই আছি।

বহুদিবসের কারাবদ্ধ ব্যক্তির দশা আর আমাদের দশা একরূপই; আমরা সাংসারিক সুখ দুঃখ বোধে বেশ অভ্যস্থ হইয়াছি। অনাদিকাল

হইতে মায়াবদ্ধ, বহুদিনের কয়েদি, ভুল হইবারই কথা। তবে কেহ যদি ভালবাসিয়া বলিয়া দেন, ইহা অর্থাৎ তোমার এই দেহ তোমার স্বরূপ নহে, ইহা তোমার কর্ত্তব্য নহে, এই (নিত্যকৃষ্ণদাস) তোমার স্বরূপ, ইহা (শ্রীকৃষ্ণ সেবা) তোমার কর্ত্তব্য। কথাটা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লওয়া মূঢ়তা অথবা অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় নহে। কেনন্না ভালবাসার অপেক্ষা বিশ্বাসের অতিরিক্ত কোন মূল্য নাই। আর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে প্রাণাধিক প্রিয় শ্রীনিত্যানন্দ হরিদাসাদির দ্বারা জীবের নিকট তাহাদের মুক্তি বিষয়ক সংবাদের সহিত কর্ত্তব্য বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবের প্রতি প্রচুর স্নেহ ব্যতীত আর অন্য কিছু পরিলক্ষিত হয় না। যদি এই স্নেহের আরও গভীরতা উপলব্ধি করিতে যাই, তাহা হইলে অমনি মনে মনে জিজ্ঞাসা উঠিবে,—কাহাদের জন্য কমনীয় কান্তি, কমল-কোমল-শরীর পথের কাঙ্গাল সাজিলেন, কাহাদের জন্য বাৎসল্য-মূর্ত্তিমতী শচী-বক্ষনিধি বৃক্ষতলবাসী হইলেন, কাহাদের জন্য সতীকুলশিরোমণি বিষ্ণুপ্রিয়া-জীবন ধুলায় কাদায় গড়াগড়ি দিলেন, কাহাদের জন্য ভাগ্যবতী নদীয়াভূষণ আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাচিয়া যাচিয়া হরিনাম বিতরণ করিলেন ? ইহা অপেক্ষা আর কি স্নেহের পরিচয় আছে বা হইতে পারে ? স্নেহের পরাক্রম অপেক্ষা যুক্তির বল কি বড় ? তাহাই যদি হইত, তবে সংসারের এত দুর্দ্দশা হইত না। আর স্নেহও অযুক্তির কোন বিষয় নহে, সে যুক্তির কোন ধার ধারে না।

যে জন আমাদের এতটা অবিচারে ভালবাসিলেন, আমরা কিন্তু তাঁহাকে একবারও ভালবাসার বিষয় বলিয়া ভাবিলাম না, একদিনের জন্যও আদর যত্ন করিলাম না, একক্ষণের জন্যও তাঁহার সেই করুণার কথা ভাবিলাম না। আমাদের সেই স্বার্থপূর্ণ নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইয়া থাকিতেই প্রবৃত্তি রহিয়া গেল, সেই 'মায়া পিশাচী'র লাথি খাইতে

খাইতেই জীবন বহিয়া গেল। এত করুণা বিস্তারেও আমাদের চৈতন্য হইল না, চোখ ফুটিল না, দুঃখ ঘুচিল না। তবে আমাদের উপায় কি?

আমাদের উপায় কি?—এই প্রশ্নটী বড় প্রয়োজনীয়, ইহার মীমাংসায় অলস হওয়া হিতাহিত বিবেক সম্পন্ন মানবের পক্ষে অতীব নিন্দনীয়। মানব-জীবন যদি কেবলমাত্র রক্তমাংসের সুখে অতিবাহিত করা যায়, তবে তাহার সহিত পশুজীবনের ভেদ থাকিল কি? তাহার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি পরম শ্রেষ্ঠ পরিকর সহিত পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়া জীবের সম্বন্ধে যে করুণা বিস্তার করিলেন, তাহাতেও যদি আমাদের চৈতন্য সঞ্চার না হয়, তবে তিনি আর এই অভাগাদের জন্য কি করিবেন?

এইবার হেমলতা! তোমার পালা এইবার আমি তোমায় প্রশ্ন করিব।

হে। আপনার প্রশ্নের উত্তর সই করিবে।

ম। তা' হবে না। আমাদের পালা শেষ হইয়াছে, এইবার তোমার পালা।

হে। আপনি বুঝি আমাকে এক পালার মধ্যে ফেলিয়াছেন।

ম। তা' কেন ফেলিব না।

হে। আচ্ছা আপনি প্রশ্ন করুন, আর ঝগড়া করিব না।

ম। অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের উপায় কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা তোমায় করিতে হইবে।

হে। এত বড় প্রশ্ন আপনি আমায় করিতেছেন, এই কথা শুনিলে লোকে হাসিবে।

ম। কেন হেমলতা! তুমি বালিকা বলিয়া; আমি তোমার মুখে

এই 'এত বড়' প্রশ্নের মীমাংসা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। যদি কেহ আমার কথায় হাসে, তাহাতে আমার অণুমাত্র দুঃখ নাই।

গৌ। সই, তুমি বল, আর দেরী করিও না।

হে। উপায়ের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র উপায়। তবে আমরা চির অপরাধী। প্রতি পদক্ষেপে আমাদের বিবিধ অপরাধের সৃষ্টি হইতেছে। প্রচুর অপরাধ হেতু আমাদের নামে প্রেমোদয় হইতেছে না। কেননা,—

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিতে অপরাধীর না হয় বিকার॥" শ্রীচৈঃ চঃ।

কিন্তু নিতাই গৌরাঙ্গ নামে অপরাধের কোন বিচার নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় কত না উৎসাহে, কত না আহ্লাদে, কহিতেছেন,—

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রু গঙ্গা বয়॥

শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপ জীবকে অবিচারে অর্থাৎ জীবের অপরাধ বিচার না করিয়া, প্রেম দান করিয়াছেন; সেইরূপ তদীয় প্রেমসুধা পরিপূরিত নাম অদ্যাবধি জীবকে অবিচারে অতুল প্রেমসম্পদ' দান করিতেছেন। 'যেই' অর্থাৎ যে কেহ হউক না কেন। 'দেখ' শব্দে শ্রীগৌরাঙ্গ নামের যে অদ্ভুত শক্তি, তাহার প্রভাব সাক্ষাৎকারে অবলোকন কর। কেননা সেই শক্তি-বিকাশ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। আমাদের চক্ষের সম্মুখে নামের অতুলনীয় শক্তি-বিকাশ-মূলক অনেক দৃষ্টান্ত ঘটিতেছে।

সুতরাং এতৎসম্বন্ধে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। গ্রন্থকার আরও কহিতেছেন,—

গৌর নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

ইহাতেও যদি কেহ অবিশ্বাস করেন, তাহার সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় ভাবোদ্দীপ্ত হইয়া কহিতেছেন,—

"এত পরিহারে যেই পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মার তার শিরের উপরে"॥

শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ নাম জীবকে অবিচারে প্রেম দান করেন, ইহার এতই নিশ্চয়তা যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রিয়তম বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় সেই অবিশ্বাসী পাপীর শিরে পর্য্যন্ত তদীয় অভয়চরণ অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তবে আর কে বাকি রহিল? যদি শ্রীনিত্যানন্দগৌরাঙ্গ নামের অবিচারে প্রেমদান-ক্ষমতা কেহ স্বীকার বা বিশ্বাস না করেন, তবে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় তাহার শিরে পদাঘাত করিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবেন, শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ নামের প্রভাব দেখাইবেন। এবার কেহ বাকি থাকিবে না, অতি অবিশ্বাসী জনও শ্রীনিত্যানন্দদাসের কৃপা পাইবে, শ্রীগৌরাঙ্গ ভজন করিবে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযুগলকিশোর সেবার অধিকার লাভ করিবে।

ম। তোমার কথার মর্ম্মে ইহাই বুঝা গেল যে, অপরাধী জীব নিতাই গৌরাঙ্গ নামেরই অধিকারী। তাহা হইলে সেই অপরাধী জন কি কৃষ্ণনাম একেবারেই লইবে না?

হে। নিতাই গৌরাঙ্গ নাম গ্রহণ করিবামাত্র অপরাধী জীবও কৃষ্ণনাম লইবার উপযোগী হয়।

ম। তাহা হইলে কিরূপ ভাবে অপরাধী জীব নিতাইগৌরাঙ্গ নাম হরেকৃষ্ণ নামের সহিত লইবে ?

হে। শ্রীনবদ্বীপলীলায় শ্রীনিতাই আশ্রয় ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়। শ্রীনবদ্বীপলীলা শ্রীবৃন্দাবনলীলার রসপরিস্ফুট অভিব্যক্তি—অচিন্ত্য মহিমান্বিতা লীলাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনী। শ্রীরাধাশ্যাম শ্রীবৃন্দাবন-লীলার আশ্রয় এবং বিষয়। শ্রীনবদ্বীপলীলা সহায়ে অপরাধী অযোগ্য জীবের শ্রীবৃন্দাবনলীলায় প্রবেশাধিকার সিদ্ধ। অতএব "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" ইহাঁরা শ্রীনবদ্বীপলীলা এবং ব্রজলীলার আশ্রয় ও বিষয়।

"শ্রীনিতাই গৌর রাধে শ্যাম"—আমাদের ইষ্ট, উপাসনার বিষয়, আমাদের সাধন ভজন, আমাদের সর্ব্বস্ব। প্রেম প্রয়োজন বোধ হইলে তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত জনের প্রথম এবং চরম আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দ, মহাভাবঘনানন্দ মূর্ত্তি। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ দেখাইয়া অবিচারে অপরাধী জীবকে আত্মসাৎ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত কলির জীবের আর দ্বিতীয় গতি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাশ্যাম-মিলন সুখঘন মূরতি, শ্রীব্রজলীলানন্দ বিগ্রহ।

ম। বুঝা গেল, 'শ্রীনিতাই গৌর রাধে শ্যাম' আমাদের ভজনের বিষয়। স্মরণের বিষয় কি ?

হে। শ্রীনিতাই-গৌর লীলা, এই নিতাইগৌর লীলাই শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলায় পর্য্যবসিত। সেই লীলা "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নামে সমাশ্রিত। পূর্ব্বরাগ হইতে মিলনাবধি যাবতীয় লীলা শ্রীযশোদানন্দনের হরি, কৃষ্ণ এবং রামনামে সিদ্ধ হইতেছে। তিনি প্রেমের বিষয়, প্রেমাশ্রয় শ্রীরাধিকার মনোহরণকারী, তাঁহাকে আকর্ষণকারী, তাঁহার সহিত রমণকারী। অতএব হরি, কৃষ্ণ এবং রামনাম শ্রীনদীয়া এবং শ্রীব্রজ, উভয় লীলারই

সমাশ্রয়। "শ্রীনিতাই গৌর রাধে শ্যাম" আমাদের ভজনের বিষয়; "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" আমাদের স্মরণের বা জপের বিষয়।

নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

ইহা নাম এবং মন্ত্র—ভজনের, স্মরণের এবং জপের বিষয়, ইহা মহা মহামন্ত্র। অপরাধী ভবরোগ পীড়িত জীবের ইহাই পরম মহৌষধি।

ম। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং এই মন্ত্র প্রামাণিক, সর্ব্বলোক-মান্য। তোমার এই নাম লোকে লইবে কেন?

হে। যিনি 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশানুসারে গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম লইতে কি আপত্তি হইতে পারে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি ভালবাসাই যদি একজনের 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র গ্রহণাসক্তির কারণ হয়, তবেত যত শ্রীগৌরাঙ্গের স্মৃতি হইবে ততইত নাম গ্রহণাসক্তি বৃদ্ধি পাইবে। শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গে যতই ভালবাসার গাঢ়তা জন্মিবে ততই নামে প্রচুর আসক্তি বাড়িবে, লীলায় অভিনিবেশ হইবে। শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ নামইত আমাদের অধিকতর প্রিয় হওয়া সঙ্গত।

ম। যদি কেহ বলেন, এই নাম আধুনিক এবং মনগড়া।

হে। শ্রীভগন্নাম কেমন করিয়া আধুনিক হইবেন? শ্রীভগবান যেমন অনাদি, নামও সেইরূপ অনাদি। মনগড়া নামইত বটে, প্রাণগড়া নাম বলিলে আরও মিষ্ট শুনায়। শ্রীভগবানের নাম ভক্তের

মন-প্রাণ দিয়াই গঠিত। ইহাতে যদি কাহারও আপত্তি হয়, তবে আর কথা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই।

ম। কিরূপে এইনাম প্রচারিত হইবে?

হে। শ্রীনিত্যানন্দদাস, দাসানুদাস কর্ত্তৃক।

ম। এই নামের মহিমা কি?

হে। এই নামের শক্তি মহাপরাধি-জীবাকর্ষিণী, জীবের জিহ্বায় প্রকাশ হইবামাত্র তাণ্ডব নৃত্য রচনা করিয়া অপূর্ব্ব পবিত্র আনন্দের তরঙ্গ উৎপাদন করে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এই তরঙ্গে ভাসিয়া হাসিবে, কাঁদিবে, নাচিবে, গাহিবে। সম্মুখে যাহাকে দেখিবে এই নাম তাহাকে নিজ শক্তি-প্রভাব দেখাইবেই দেখাইবে। সেই শক্তির বড় অপূর্ব্ব বিধান। নামাক্রান্ত ব্যক্তিকে আর পার্থিব সুখে অভিভূত হইতে দিবে না। এই নাম যাহাকে ধরিবে সেই ব্যক্তি আর সাংসারিক সুখকে সুখ বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে না, তাহা দুঃখ বলিয়াই তাহার মনে হইবে। সুতরাং ক্রমশঃ তাহার প্রাকৃত সুখাভিলাবের বীজ পর্য্যন্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। যদিও এই নামাক্রান্ত জন নশ্বর সুখভোগের জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে নাম তাহাকে দুই চারি দিনের জন্য ভোগ করিবার অনুমতি করিলেও পুনরায় তাহাকে সেই দুঃখময় ইন্দ্রিয়সুখ-কূপ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক আনন্দধামে লইয়া যাইবেই যাইবে। যেমন পিয়াদা বিচারক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবার সময় যদি আসামী কিছু * * * করিবার জন্য উৎপাত করে, তবে তাহাকে সেই পিয়াদা নজরবন্দী রাখিয়া সেই কার্য্য করিতে দিতে স্বীকৃত হয় কিন্তু কখনও আসামী ঐ পিয়াদার হস্ত হইতে এড়াইতে পারে না তদ্রূপ এই নামরূপ পিয়াদা একবার যাহাকে শ্রীনিতাইগৌর বিচারালয়ে

লইবার জন্য ধরিয়াছে, পথিমধ্যে তিনি যে কার্য্যের জন্য উৎপাত করুক না কেন তাহাকে সেই স্থানে না লইয়া আর ছাড়িবে না।

ভ। অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব! প্রভুর করুণার জয় হউক।

শ্রীরাধারমণের ভোগারাত্রিক আরম্ভ সংবাদ শ্রবণে মহাপুরুষ কহিলেন, চল, আমরা শ্রীরাধারমণ দর্শন করিয়া আসি। এই বলিয়াই মহাপুরুষ অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন আর সকলে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছেন। আজ সকলের হৃদয় আনন্দভরা, প্রাণ কি অনির্ব্বচনীয় বস্তুর আস্বাদনে পরম পরিতৃপ্ত। আনন্দে আনন্দে সকলে জগমোহনে উপনীত হইয়া যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-নিকেতন মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলেন তাহাতে কাহারও ধৈর্য্য ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকিল না। "গোপবেশ বেণুকর, নব কৈশোর নটবর" সেই নবজলধর-রুচি-বিনিন্দনকারী শ্রীশ্যামসুন্দর বামে বৈদূর্য্য-কান্তি-বিজয়ী মন্মথ-মনোমোহিনী নিরুপমা সুন্দরী কিশোরী শ্রীরাধা প্যারী—আহা! মধুরোজ্জ্বল রসের দুইটী মূরতী, দর্শন করিবামাত্র মন প্রাণ অপহরণ করিয়া লয়। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ কহিয়াছেন,—

স্মেরাং ভঙ্গিত্রয়-পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেন।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥

ঈষৎ মধুর স্মিত, ভঙ্গিত্রয় পরিচিত,
আকর্ণ বিস্তীর্ণ কিবা আঁখি মাতোয়ারা।
সুবদন কিশলয়ে, মুরলিকা বিরাজয়ে,
ময়ূর পুচ্ছমণ্ডল করে উজিয়ারা॥
এই বৃন্দাবনধামে, স্থান, কেশিতীর্থ নামে,
গোবিন্দাখ্য-হরিতনু যথায় শোভয়ে।

হেরো না হেরো না তারে, সখে তুমি একেবারে,
বন্ধু সঙ্গে রঙ্গসাধ যদি হে থাকয়ে ॥

আরাত্রিক শেষ হইলে সেবক সকলকে তুলসী, মাল্য এবং চন্দন দিলেন। মহাপুরুষ কহিলেন, এস এইখানে আমরা একটু বসি। কিশোরীবাবু, ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভুর অনুমতি লইয়া কার্য্য বশতঃ উভয়ে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন।

ম। আচ্ছা, গৌরপ্রিয়া বলত, তোমার গৌরের রূপ মনভুলান না আমার শ্যামসুন্দরের রূপ মনভুলান ?

গৌ। সই আমার হইয়া উত্তর দিবে।

ম। অর্থাৎ তোমার হইয়া সইকে আমার সহিত ঝগড়া করিতে বলিতেছ।

গৌ। সইয়ের নাম শুনিলেই যে আপনি ভয় পান।

ম। ভয় পাব কেন ? আচ্ছা তোমার সইই বলুক।

হে। না সই ! তোমার হইয়া আমি কেন উত্তর করিব। তোমার ঠাকুরের রূপ তুমিই বল।

গৌ। শ্রীরাধামাধব মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ। অবশ্য শ্রীনবদ্বীপ লীলায় রসাধিক্য আছে, শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সেই রসসুখাধিক্য বিগুমান, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ম। আমি তোমার মনের কথাটা শুনিতে চাই, এই শ্রীরাধারমণ মূরতি তোমার মনোহরণ করিতেছেন কি না ?

গৌ। এই কথাটা আপনার সভায় জিজ্ঞাসা করা—

হে। বুঝলে না সই—শ্রীরাধারমণের আনুগত্য বজায় করিতেছেন।

ম। ইহা কি মন্দ কথা, শ্রীরাধারমণের নিকট আত্মনিবেদন একটী ভক্তি অঙ্গ।

হে। চল সই! আমরা যাই।

ম। আচ্ছা হেমলতা! তোমার লজ্জা কেন?

হে। লজ্জা কাহাকে, তবে আপনার কথায় লজ্জা না আসা নির্লজ্জতার পরিচয়।

ম। আচ্ছা, আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি।

গৌ। কি বুঝিলেন?

ম। তোমাদের মনের ভাব।

গৌ। সইয়ের কি মনের ভাব বুঝিয়াছেন।

ম। তোমার সইত শ্রীরাধারমণের পায়ে জন্মের মত প্রাণ সঁপিয়াছে, আর তোমারও সেই দশা।

হে। পোড়া কপাল আর কি, আমরা শ্রীপ্রিয়াজীর কিঙ্করী, স্বপনেও তাঁহার কাছছাড়া হই না। আমরা আমাদের স্বামিনীর ভালবাসায় লালিত, পুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত। তিনি মরিতে বলিলে আমরা মরি, বাঁচিতে বলিলে আমরা বাঁচি।

গৌ। সই, চুপ কর, এইখানে আর ঐসব কথার প্রয়োজন নাই।

হে। তোমার আগেই আমি বলিয়াছিলাম, চল, আমরা যাই।

ম। আচ্ছা চল, তোমরা এইবার দুইজনেই একপক্ষ হইলে দেখিতেছি।

এদিকে ব্রজসুন্দরী সকলের নিমিত্ত আসন করিয়া পরিবেশন আরম্ভ করিয়াছেন, মহাপুরুষ সকলের সহিত আসিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ভোজন করিতে করিতে আবার পরস্পরে কত আনন্দ আলাপন হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। পাঠকগণ! অনুভবে অবগত হউন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদায়।

রাত্রিতে হেমলতা এবং গৌরপ্রিয়া, দুই সই একত্রে শয়ন করিয়াছে। উভয়ের মনে হইতেছে, 'সইকে হৃদয়ের মধ্যে লইয়া লুকাইয়া রাখি, 'প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া দিই'। আবার হেমলতা যখন মনে করিতেছে, সই কাল চলিয়া যাইবে, তখন হৃদয় দুঃখে আকুল হইয়া উঠিতেছে, সখ্যরস উছলিয়া উঠিতেছে। আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ না হইয়া কহিল, সই, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?

গৌ। সই, তোমায় কি ছাড়িতে পারি? তোমায় ছাড়িলে আমার থাকিবে কি?

হে। কেন সই, আমার ন্যায় নগণ্য জনকে তুমি সর্ব্বস্ব মানিতেছ?

গৌ। এই কথা আর তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করিও না, এই কথার কোন উত্তরও নাই, কেননা ভাবিতে যাইলে আমার বুদ্ধিশক্তির লোপ হয়।

হে। সই, আবার তোমার সহিত কিরূপে দেখা হইবে?

গৌ। তোমাকেত আমি লইয়া যাইব।

হে। আমার খুব যাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু প্রভুর কি ইচ্ছা জানিনা।

গৌ। চলনা সই আমাদের বাটীতে।

হে। তোমার ব্রাহ্মণটী আমায় দেখিলে আবার কি মনে করিবে?

গৌ। ব্রাহ্মণটী তোমায় দেখিলে ভালই বাসিবে। তোমায় কেনা ভালবাসে ?

হে। আমার যাওয়া হইবে না, মনে হইতেছে। তোমার ব্রাহ্মণটীকে আমার প্রণাম জানাইও।

গৌ। তবে বুঝি আর তোমার সহিত দেখা হইবে না ?

হে। সেকি কথা সই !

গৌ। যাহা হউক সই, এই সময় আর একবার আমাদের নিতাই তোমায় আকর্ষণ করিবেনই করিবেন।

হে। আমি তাহাতে সুখী হইব।

গৌ। তুমি তখন যাইতে কোনরূপ সঙ্কোচ মনে করিও না।

কথোপকথন করিতে করিতে দুই সহচরী ঘুমাইয়া পড়িল। গভীর নিশীথে সকলেই নিদ্রাদেবীর অঙ্কে শায়িত। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থাতেও আমাদের আজিকার গোষ্ঠী কি এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন। দিনমানের সেই প্রীতি-সম্মিলনী, সেই প্রীতি আলাপন, সেই সিদ্ধান্তানুশীলন, সকল ঘটনা আবার নূতন করিয়া আস্বাদন করিতে সকলেই তৎপর। যেমন সুখে সুখে দিবসকাল অতিবাহিত হইয়াছে সেইরূপ সুখে সুখে নিদ্রাবস্থাও যাপিত হইতেছে। নিদ্রাভঙ্গে সকলেই ইহা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইলেন।

কিশোরীবাবুর প্রকোষ্ঠে মহাপুরুষ পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়াছেন। মেজেয় কিশোরীবাবু এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুইয়াছেন। বাম পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে বিমলা, ব্রজসুন্দরী, রমণী এবং রাধাপদ, দক্ষিণ পার্শ্বের গৃহে হেমলতা ও গৌরপ্রিয়া শয়ন করিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গ হইলে বিমলা ব্রজসুন্দরীকে জাগাইয়া দিলেন।

বি। হাঁ ভাই, প্রভু কি আজ যাইবেন ?

ব্র। কেমন করিয়া বলিব ভাই, তিনি ইচ্ছাময়।

বি। কিন্তু তোমার মনে কি হয়?

ব্র। এরূপ মিষ্ট সঙ্গ সংসারে কে ছাড়িতে চায়? তবে আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, মঙ্গলময় ভগবান নিরন্তর তাহার বিধান করিতেছেন।

বি। সত্য বলিয়াছ, কিন্তু মনের কথা স্বতন্ত্র।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, বিমলা শ্রীরাধারমণের সেবাকার্য্যে সর্ব্বদা আহ্লাদের সহিত ব্যাপৃতা। অপিচ সেবাকার্য্যে বিমলার মতি স্বাভাবিকী। তথাপি গতকল্য মহাপুরুষের সেবনে বিমলার হৃদয় যেন কোন নূতন সুখতরঙ্গে তরঙ্গায়িত। সেই নিমিত্ত বিমলার মনে হইতেছে, মহাপুরুষ যদি আজিকার জন্য অবস্থান করেন, তাহা হইলে আবার আজ তাঁহাকে মনের মত করিয়া শ্রীরাধারমণের বিবিধ প্রসাদ ভোজন করাইবেন। বিমলার ব্রজসুন্দরীর সহিত উপরোক্ত আলাপনের উদ্দেশ্য পাঠকগণ, বুঝিয়াছেন কি? কিন্তু ব্রজসুন্দরী আর কিছু ভাবিতে-ছিলেন, সেই জন্য বিমলার কথার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিলেন না।

অতঃপর মহাপুরুষ শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি এখন আসি, তোমরা সকলে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া আমাকে সুখী কর'।

কি। প্রভু, এখনই না যাইলে চলিবে না?

ম। দেখ, আমায় এখনই যাইতে হইবে; আমিত তোমাদেরই আছি, মনে করিলেই আবার আসিব।

আর কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। কিন্তু মহাপুরুষের এতই চিত্তাকর্ষণী শক্তি যে, সকলের মনে হইল, যেন তিনি সকলের মন লইয়া

বিদায় চাহিতেছেন। বিদায় দিবে কে? মনই যাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, তিনি কিরূপেই বা বিদায় চাহিতেছেন, আর যাঁহার মন অপহৃত হইয়াছে, তিনিই বা কিরূপে বিদায় দিবেন? তাই মহাপুরুষের কথায় আর কাহারও মুখে কথা সরিতেছে না। সকলের ভাব দর্শনে মহাপুরুষের হৃদয় স্নেহার্দ্র হইল।

ম। দেখ, তোমরা দুঃখিত হইও না, আবার সত্বরই তোমাদের দেখিতে আসিব।

কাহারও মুখে কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া আবার কহিতেছেন,

'আমি তোমাদের প্রেমে চিরকাল বাঁধা, তোমাদের কি আমি একক্ষণের জন্য ছাড়িতে পারি?'

সকলে নীরব।

'তোমরাও আমাকে একক্ষণের জন্য ছাড়িতে পারিবে না। আমরা সকলে একজনেরই হই।'

তথাপি কেহ কোন কথা বলিতে সক্ষম হইতেছেন না।

"তোমরাত আমাকে কত ভালবাস, কাল সকাল হইতে কত উৎপাত করিলাম, তোমরা আহ্লাদের সহিত সকলই সহ্য করিলে।"

হে। আবার ঝগড়া করিবার মন আছে নাকি?

ম। কেন?

হে। কোথায় উৎপাত করিলেন?

ম। তোমার সহিত ঝগড়া করিয়াছি।

হে। আমার সহিত আপনার চিরদিনের ঝগড়া।

ম। হাঁ হেমলতা, তোমার ঝগড়া বড় মিষ্ট।

হে। তবে আবার শীঘ্র করিয়া একদিন আসিবেন।

ম। গৌরপ্রিয়া, তোমরাও কি আজ যাইবে?

গৌ। আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

ম। তোমাদের বাটী যাইবার সময় শীঘ্রই হইতে পারে। আমি আর বিলম্ব করিব না।

মহাপুরুষের চরণে প্রণাম করিতে করিতে সকলের নয়ন হইতে অশ্রু প্রবাহ বহিল। সকলকে আশ্বাস বচনে সান্ত্বনা করিয়া মহাপুরুষ কিশোরীবাবুর আলয় হইতে বহির্গত হইলেন। বেলা ৪ দণ্ড অতীত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিশোরীবাবুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

হে। বাবা! আমি সইকে যাইতে দিব না।

গৌ। বাবা! আমি সইকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।

কি। বা! তোমাদের প্রত্যেকের কথাই তুল্যস্নেহা।

গৌ। আপনি বলিলেই সই আমার সহিত যাইতে স্বীকার

হে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেই আমার সহিত সইয়ের কয়দিন থাকিবার ইচ্ছা আছে।

ভ। যেখানে হউক তোমাদের একত্র দেখিলে আমরা সুখী হইব। তবে গৌরপ্রিয়ার সেবা আছে।

হে। গৌরপ্রিয়ার গৌরকে আমি শ্রীরাধারমণের নিকট লইয়া আসিব।

গৌ। কেন সই, গৌর কেন রাধারমণের নিকট আসিবে, রাধারমণকে গৌরের নিকট যাইতে হইবে।

হে। তা হবে না, সই, রাধারমণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথায়ও যায় না।

গৌ। গৌরও নবদ্বীপ ছাড়িয়া কোথায় যায় না। রাধারমণ যদি

আমার গৌরের নিকট যান, গৌরও একদিন রাধারমণের নিকট আসিলে আসিতে পারেন।

হে। তুমি আগে রাধারমণকে লইবে? আচ্ছা, ইহাতেই আমি রাজি হইলাম। কিন্তু সই, যিনি শেষে আসিবেন, তিনি যেখানে আসিবেন, চিরদিনের জন্য সেইখানেই থাকিবেন।

গৌ। তাহা গৌর জানেন।

হে। সেই কথাই ভাল।

ভ। তবে হেমলতা, এখন আমরা আসি।

কি। কল্যকার দিন স্মরণীয়, আমরা কে কি বলিয়াছি, তাহা কি কাহারও স্মরণ আছে?

রা। স্মরণ আছে, কিন্তু আমি কোন কথা বলিয়াছি, বলিয়া মনে হয় না।

ভ। ঠিক বলিয়াছ রাধাপদ, যন্ত্র যেরূপ যন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়, সেইরূপ আমরাও গতকাল যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, সেই সকল যেন আর কোন বক্তা আমাদের মুখে বলিয়াছিলেন।

গৌ। 'বৃক্ষ দ্বারে কর কাজ ঐছে তোমার চিত্র।'

কথোপকথন সমাপ্ত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিশোরীবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীরাধারমণ অগ্রে দণ্ডবৎ করিয়া পাণিহাটী অভিমুখে রহনা হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ প্রসঙ্গ।

সকলে চলিয়া যাইলে কিশোরীবাবু উদাস প্রাণে নিজ শয়নগৃহে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। গতকল্যকার ঘটনায় কিশোরীবাবুর কেন, বাটীস্থ সকলের মনে একটা চমক লাগিয়া রহিয়াছে। সময় কত ভাবে কাটান যায়। কত ভাব অসার, মূল্যহীন, কত ভাব সারাৎসার অমূল্য। কিন্তু বিগত কল্য যে ভাবে সময় অতিবাহিত হইয়াছে, কিশোরীবাবুর পরিবারস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যেন তাহাতে এখনও পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত সকলে মনে করিতেছেন, সেই প্রশান্ত সৌম্য মহাপুরুষ বিগ্রহ আমাদের গৃহে আনন্দ বিস্তার পূর্ব্বক বিরাজমান। আবার যখন বিদায় কালীন তদীয় শ্রীমুখনির্গলিত অমিয় বচনাবলী মনে হইতেছে তখন হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। এবম্বিধ নানা প্রকার ভাবতরঙ্গে সকলেরই চিত্ত দোলায়মান। কিশোরীবাবু সেই ভাবতরঙ্গ সামলাইতে না পারিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু পত্নী ব্রজসুন্দরী স্বামীর মনোভাব অবগত হইয়া ভাবান্তর করিবার জন্য কহিলেন,

"এখন যে আবার শুইয়া পড়িলে ?"

কি। আমি শুইয়া থাকি, তুমি এখন যাও।

ব্র। আমার কথার উত্তর না শুনিয়াই যাইব।

কি। তোমায় বিনয় করি, আমায় খানিকক্ষণ একলা থাকিতে দাও।

ব্র। বিনয়ের দরকার কি, আমি যাইতেছি।

কি। তোমার কিছু আবশ্যক আছে?

ব্র। না।

কি। আমার কথায় দুঃখ পাইলে?

ব্র। আপনার যাহাতে সুখ হয়, আমার তাহাতে দুঃখ হওয়া অনুচিত।

কি। তবে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ব্র। কি কথা?

কি। কালিকার কোন্ ঘটনা তোমার মনে লাগিয়া রহিয়াছে।

ব্র। প্রত্যেক ঘটনা।

কি। তা'ত বটেই, তবু কোন্ কথায় কে তোমার অধিক চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে?

ব্র। বলব না।

কি। কেন?

ব্র। আপনি কি আবার মনে করিবেন।

কি। এই বুঝি আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা!

ব্র। বলব?

কি। বল।

ব্র। গৌরপ্রিয়া আমার বড়ই মন আকর্ষণ করিয়াছে। আমার এখন কেবল তাহাকেই মনে পড়িতেছে।

কিশোরীবাবু ব্রজসুন্দরীর কথায় হাসিয়া উঠিলেন।

ব্র। এই জন্য আমি বলিতে চাই না।

কি। গৌরপ্রিয়া বাস্তবিকই ভালবাসার জিনিষ।

ব্র। এরূপ অল্পবয়স্ক বালিকার এরূপ সুমিষ্ট কথা, ব্যবহার আমি কখনও শুনিও নাই, দেখিও নাই।

কি। তোমার কথা সত্য।

ব্র। একটা কথা বলব?

কি। বল, তার আর জিজ্ঞাসা কি?

ব্র। আমার বড় ইচ্ছা, মেয়েটীকে ঘরে আনি।

কি। কালিকার এত ঘটনায় তোমার এই সিদ্ধান্ত হইল।

ব্র। আপনার ইচ্ছা হয় না?

কি। প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।

ব্র। বল না, তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথাটা কি অন্যায়?

কি। আমি কি তোমার কথা অন্যায় বলিতেছি। তবে আমাদের কোন ইচ্ছা করিতে নাই, কেননা, ইচ্ছার পূরণ না হইলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

ব্র। না না, এই ইচ্ছা আমার নয়, ইহা প্রভুর ইচ্ছা।

কি। তা' হলে ভালই।

ব্র। কিন্তু আমার ইচ্ছায় কি তোমার ইচ্ছা হয় না?

কি। আমি এই কথার কি উত্তর করিব, বল দেখি?

ব্র। আর তোমায় বিরক্ত করিব না। আমি যাই।

কি। রাগ হইল না ত?

ব্র। তোমার উপর রাগ না হওয়াই ভাল।

কি। তুমি 'যাই' বলিলেই আমার ভয় হয়।

ব্র। আর মিছা কথায় কাজ কি?

কি। আমি মনে করিয়াছিলাম, একলা চুপটী করিয়া শুইয়া যা' মনে আসে ভাবিব; তুমি কিন্তু একেবারে তাহার বিপরীত করিলে।

ব্র। তবেত আমার উপর তোমারই রাগ হওয়া উচিৎ।

কি। স্ত্রীলোকের মন নূতন বাসনা করিতে বড়ই পটু।

ব্র। আমরা বড়ই অধম, তুমি আমার কথা মনে স্থান দিও না। আমার অনেক কাজ আছে, চল্লাম্।

এই বলিয়া ব্রজসুন্দরী যেন অতি ব্যস্ত হইয়া গৃহদরজা অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রুত চলিয়া আসিলেন। কিশোরীবাবু আর পত্নীকে ফিরাইবার জন্য ডাকিতে অবসর পাইলেন না; নিরুপায় হইয়া তখন নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গৌরপ্রিয়া সম্বন্ধে কিশোরীবাবুর পুত্র রাধাপদর মনোভাব পাঠকগণ কিছু কিছু অবগত আছেন। কিন্তু রাধাপদ গৌরপ্রিয়া সম্বন্ধে কোনরূপ লৌকিক ভাব কখনও পোষণ করে নাই। বাল্যকাল হইতে রাধাপদর চরিত্র যে ভাবে গঠিত হইতেছে, তাহাতে রাধাপদর যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয়-ভোগসুখে আসক্তি জন্মিবার কোনই সম্ভাবনা হয় নাই, এই কথা বাহুল্য মাত্র। অপিচ গৌরপ্রিয়ার প্রতি রাধাপদর চিত্তাকর্ষণহেতু যদি আমরা আরও বিশদরূপে বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিব যে সেই আকর্ষণের কারণ ইন্দ্রিয় উপভোগ নহে। যদি কেহ এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, ইহজগতে কিশোর কিশোরীর চিত্তাকর্ষণ ইন্দ্রিয়োপভোগ ব্যতীত আবার কি কারণে সংঘটিত হয়? বাস্তবিক একজনকে একজনের ভালবাসার কারণ কি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-সুখলিপ্সা। আমার বিশ্বাস, ইন্দ্রিয়-সুখলিপ্সাপ্রধান-চিত্ত কখনও ভালবাসিতে জানে না। এই কথার একটা প্রমাণ দিলে তাহা আরও পরিস্ফুট হইবে। একটী কিশোরবয়স্ক যুবক আর একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা, পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ়রূপে ভালবাসে, এই সময় উভয়ের মিলনে উভয়ে যে, সম্পূর্ণ না হউক, কতকটা বিমল আনন্দ উপভোগ করে, তাহা কি ইন্দ্রিয়ভোগ-বাসনাময়

চিত্তে যৌবনকালে আর তাহারা ভোগ করিতে সক্ষম হয়? কখনই না। ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার পরিণাম বিবেকিজন মাত্রেই অবগত আছেন। তখন নায়ক নায়িকা সেই কৈশোর বয়সের মিলনকালে নির্দ্দোষ আমোদ, নির্দ্দোষ আলাপন স্মরণ করিয়া কি বলাবলি করে?

যু। সেই প্রথম প্রথম আমাদের দুজনের দেখাদেখিতে, আলাপে যে সুখ হইত, তাহা কি এখন পাইতেছ?

যু-ক। তখনকার আমোদ আলাপ নির্দ্দোষ ছিল, কাজেই তখন আনন্দ অধিক হইত।

যু। এখন আমাদের আলাপে, আমোদে কি দোষ ঘটিয়াছে?

যু-ক। এখন আমাদের আলাপ, আমোদ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাময় হইয়াছে।

যু। কথাটা বেশ পরিষ্কার আলোচনা করিলে যদি আবার সেই অবস্থা পাওয়া যায়, তবে এস আমরা এই কথাটার মীমাংসা করিয়া ফেলি।

যু-ক। সেই বয়সের সেই মন কি আর ফিরিয়া পাওয়া যায়।

যু। মন না পাওয়া যাইলেও ভাবটাত পাওয়া যাইবে।

যু-ক। কি জিজ্ঞাসা কর, আমি যাহা জানি বলিব।

যু। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতায় দোষ কি, তাহাতে চিত্তের অবসাদ জন্মে কেন?

যু-ক। এই কথার উত্তর অতি সামান্য কিন্তু কার্য্যে দেখান আমাদের পক্ষে কঠিন দাঁড়াইয়াছে।

যু। কিছু কঠিন হইবে না, তুমি বল।

যু-ক। মনুষ্য শরীরগত যে প্রধান শক্তি তাহার নাম শুক্র, তাহারই প্রভাবে আমরা হাসিখুশি, আমোদ আহ্লাদ করি। স্ত্রীপুরুষ মিলনের

ব্যবহার দোষে সেই শক্তি নষ্ট হয়। সেই শক্তি নষ্ট হইবামাত্র চিত্তের অবসাদ জন্মে। কিন্তু আমাদের প্রথম মিলনে দুষ্ট ব্যবহার প্রবৃত্তি ছিল না। তোমায় দেখিলেই আমি সুখে ভাসিয়া যাইতাম, তুমি আমায় দেখিবামাত্র আনন্দে গলিয়া যাইতে। আমার মুখের একটা কথা তোমার শ্রবণে মধুবর্ষণ করিত, আমি তোমার কোন শব্দ পাইলেই আহ্লাদে শিহরিয়া উঠিতাম। এখন মনের বিপরীত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই সুখের আশা আর করা যাইতে পারে না।

যু। স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি কিসের জন্য?

যু-ক। ইহা খুব বড় প্রশ্ন, আমি ভাবিয়া আর একদিন ইহার উত্তর তোমায় দিব।

পাঠকগণ! আসুন আমরা উল্লিখিতা যুবতীর শেষ প্রশ্নটী আলোচনা করি। ভালবাসাই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু ভালবাসা কারে বলি! একটী স্ত্রী একটী পুরুষকে ভালবাসে। তাহাদের কিশোর বয়সের ভালবাসা, যৌবনকালের ভালবাসা, প্রৌঢ় দশার ভালবাসা, বার্দ্ধক্যের ভালবাসা। এইত গেল, ভালবাসার কতগুলি অবস্থা। তাহার পর এমনও দেখা যায়, স্ত্রীটী বড় আত্মসুখী, নিজের নানাবিধ সুখের জন্য স্বামীকে বড় জ্বালাতন করে। অথবা স্বামীটী বড় আত্মসুখী, স্ত্রীকে নানারূপ পীড়ন করে। আবার এমনও দেখা যায়, স্ত্রীটী স্বামীর বড় অনুগতা, স্বামীর সুখের জন্য আপনার সমস্ত সুখ অকাতরে বিসর্জ্জন দেয়। আরও দেখা যায়, স্বামী স্ত্রীতে বড় ভালবাসাবাসি, পরস্পর পরস্পরকে বেশ আদর যত্ন করেন, কিন্তু পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজনকে বড় একটা মনে করিবার সময় পান না। ইহাও দেখা যায়, স্বামী স্ত্রী, পরস্পর পরস্পরকে যেমন ভালবাসেন, পিতা মাতা গুরুবর্গকে সেইরূপ ভক্তি শুশ্রূষা করেন, আত্মীয় স্বজনকে সহানুভূতি করেন,

পাড়াপ্রতিবাসীকে ভালবাসেন, পরের দুঃখে অশ্রুমোচন করেন। সবইত ভালবাসা, ইহার মধ্যে কোনটী ভালবাসা নয়? তবে একটা আমাদের পছন্দ আছে। আবার দম্পতির মধ্যে এমন ভালবাসাও আছে যাহাতে স্ত্রী মনে করেন, আমার স্বামীর হরিভক্তি হউক, স্বামী প্রার্থনা করেন, আমার স্ত্রী ভক্তিমতী হউক। এও কি ভালবাসা নয়? সবই ভালবাসা বটে। কিন্তু ভালবাসার নানাবিধ ভেদ হেতু নানাবিধ তারতম্য আছে। যাহার যেরূপ পছন্দ, তিনি সেইরূপ ভালবাসায় ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসেন।

গৌরপ্রিয়ার প্রতি রাধাপদর ভালবাসা কিরূপে সঙ্গত হয়? গৌরপ্রিয়ার পিতা কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি নহেন, গৌরপ্রিয়া পাড়াগাঁয়ে মেয়ে, আধুনিক সভ্যতা জানে না। গৌরপ্রিয়া তুলসী চয়ন করে, ফুল তোলে, ঠাকুরের জন্য মালা গাঁথে। গৌরপ্রিয়া নিতাই গৌরের কথায় বড় প্রীতি বোধ করে, তাঁহাদের ভালবাসিয়া গৌরপ্রিয়া সুখী, তাঁহাদের কেহ ভালবাসিলে গৌরপ্রিয়ার বড় আহ্লাদ। এইরূপ গুণশীলা বালিকার প্রতি রাধাপদর চিত্তাকর্ষণ-হেতু কখনও দুরানুমেয় নহে। গৌরপ্রিয়ার প্রতি রাধাপদর ভালবাসা, ইহা তাহার চরিত্র-গঠনের সুপরিণাম, নীতি-শিক্ষার সার্থকতা। যাহাহউক গত কল্যকার মিলনে গৌরপ্রিয়ার প্রতি রাধাপদর চিত্তাকর্ষণ গভীরতর হইল।

এফ্‌এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল; রমণী এবং রাধাপদ সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে জানিয়া সকলে সুখী হইলেন। একদিন হেমলতা রমণী দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা! তুমি পাশ করিয়া কি করিবে?

র। তোমরা আমায় পড়াইতেছ, তোমরা জান।

হে। দাদা! এইরূপ ভাবে আমার সহিত কথা বলা কি সাজে?

র। তোমাদের দয়ায় প্রতিপালিত, ইহা কি মিথ্যা কথা?

হে। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই এখনও পর্য্যন্ত তুমি এরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ কর।

র। হেমলতা! আমার হৃদয় শুষ্ক, কঠিন, কথাও সেইরূপ। আমার সহিত কথা কহিলে তুমি কোমল হৃদয়ে বেদনা পাইবে।

হে। আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি জানিনা।

এই বলিয়া হেমলতা কাঁদিয়া ফেলিল। রমণী, তুমি বলিয়া আজ হেমলতাকে কাঁদাইতে পারিলে। হেমলতার পরিচয় জানিলে তোমায় আবার কাঁদিতে হইবে। এক এক সময় হেমলতাকে দেখিলেই রমণীর চিত্ত বৈরাগ্যময় হয়, আবার কোন সময়ে রমণীর হেমলতাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। হেমলতা রমণীর ভবিষ্যত কতক কতক অনুভব করিয়াছে, তাই হেমলতা রমণীদাদাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না।

র। হেমলতা! আমার স্বভাব তুমি ত জান, আমার কথায় কি কাঁদিতে হয়। আমায় তুমি ভবিষ্যত ভাবাইও না। আমার ভবিষ্যত কেবল অন্ধকার।

হে। আচ্ছা দাদা, তোমার বিবাহ করিতে মন হয় না?

র। তুমিত আমায় ভালবাস, আমার মনও জান, এই কথার উত্তর তুমি বল?

হে। তুমি বড় দুষ্ট, মনের কথা কাহাকেও বলিবে না।

র। তবে জিজ্ঞাসা কর কেন? তুমিও দুষ্ট।

হে। এক সময় রাধাপদ দাদার সাক্ষাতে তোমায় এই কথা জিজ্ঞাসা করিব, আমায় তুমি দুষ্ট বলিয়াছ।

র। না না হেমলতা, রাধাপদর সাক্ষাতে আর আমায় অপ্রস্তুত করিও না।

হে। তবে আমায় তোমার মনের অভিপ্রায় বল?

র। তোমার পায়ে পড়ি, কেন আমায় এই সব কথা জিজ্ঞাসা কর?

হে। আমার দরকার আছে।

র। আজ থাক্ হেমলতা, আর একদিন বলিব।

হে। তুমি বলিবে না আমিও ছাড়িব না।

র। একবার দেশছাড়া হইয়াছি, বিদেশ দেশ ভাবিয়া আছি, তুমি এইবার আমায় বিদেশ ছাড়া করিবে।

হে। আমি কি করিলাম?

র। তুমি বড় ভালমানুষ, আর যিনি আমায় এইখানে রাখিয়া গিয়াছেন তিনিও তোমার মত ভালমানুষ।

হে। তোমার সকলের উপর রাগ কেন?

র। তুমি এখন আমার নিকট হইতে যাও; কথা বাহির করিতে তুমি বড় ফাঁকি জান।

হে। আমি যাইব না।

র। তুমি থাক, আমি তবে যাই।

হে। তোমাকে যাইতে দিব না।

র। দেখ, আমায় জ্বালাইও না।

হে। আমি আর বেশীদিন তোমায় জ্বালাইব না।

র। তুমি চিরদিনের জন্য আমায় জ্বালাইবে।

হে। যদি এককক্ষণের জন্যও কোনদিন আমি হরি বলিয়া অকপট অন্তঃকরণে ডাকিয়া থাকি, তবে জানিও আমি তোমার অশান্তির কারণ হইব না।

র। অভাগার উপর ইহা তোমার যথেষ্ট কৃপা।

হে। আচ্ছা দাদা, তুমি রাধারমণকে ভালবাস?

র। তোমায় কতদিন বলিয়াছি আমি কাহাকেও ভালবাসি না।

হে। আমাকেও ভালবাস না?

র। দেখ তুমি এখান হইতে যাও, কেন—

হে। তুমি আমাকে ভালবাস, তা' বল না কেন? আমি বলিতেছি, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি; ইহাতে কি দোষ?

র। তোমার চরিত্র আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি কি বুঝিবে।

হে। দাদা! তুমি রাধারমণকে ভালবাস, আমি রাধারাণীকে ভালবাসি। কেননা আর ভালবাসা কোথায়ও নাই। ভালবাসা দেখিতে চাও তবে রাধা-রাধারমণ দেখ, তাঁহাদের ভালবাস। তাঁহাদের যে রাজ্য তাহারই নাম প্রেমের রাজ্য। এই কথা একদিন হইয়া গিয়াছে— লক্ষ্মী দাদা, আমার কথা শুন, আর দুঃখ পাইয়া আমায় দুঃখ দিও না।

র। তোমার মনের ভাব আমি জানি হেমলতা! আমি তোমার কথা পালন করিবার জন্যই জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি।

হে। দাদা, আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমি যাইব। তোমার কাছে এই ভিক্ষা, শ্রীপ্রিয়াজির দাসী জ্ঞানে আমায় সময় সময় মনে করিও।

র। সে কথা আর কেন বলিতেছ, আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন তোমার স্মৃতি।

বলিতে বলিতে রমণী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। হেমলতা দাদাকে অনেক যত্নে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিসীমার ভাবাবেশ।

হাবড়ার ঘাটে আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যার সহিত একখানি নৌকায় উঠিলেন। নৌকায় উঠিয়াই গৌরপ্রিয়া পিতার ক্রোড়দেশে মস্তক রাখিয়া শুইয়া পড়িল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যার ঈদৃশ আচরণে বাৎসল্য সুখে বিভোর হইলেও কহিলেন, মা! নৌকায় আর শুইও না এখনই ঘুমাইয়া পড়িবে।

গৌ। আমার ঘুম পাচ্চে, একটু ঘুমাব।

ভ। তা'হলে আমি তোমায় মাজিদের কাছে ফেলিয়া পাণিহাটীতে নামিয়া যাইব।

গৌ। আমি মাজিদের বাটীতে গিয়া থাকিব।

ভ। বেশ ত; মাজিদের বউ তোমায় ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইয়া দিবে।

গৌ। আমি আপনার কোলে শুইয়া থাকিব, আপনি যেমন উঠিবেন, আমি জানিতে পারিব।

ভ। তুমি ঘুমাইয়া পড়িলেই আমি তোমায় কোল হইতে নামাইয়া রাখিব।

গৌ। না বাবা, আমি একটু ঘুমাইয়াই আবার উঠিব।

ভ। তা' হবে না, তুমি ঘুমাইতে পাবে না, শুইয়া শুইয়া কথা বল।

গৌ। আচ্ছা বাবা! আমার সইদের বাড়ী খুব বড়; সইয়ের ঘরে কত কি জিনিষ। কিন্তু বড় গোলমাল।

ভ। তোমার সইয়ের বাড়ী তোমায় ভাল লাগে ?

গৌ। না বাবা, আমাদের কেমন বাড়ীর কাছে গঙ্গা, আর সইয়ের বাড়ীতে নিতাইগৌর নাই, ঠাকুর মা নাই, মা নাই।

ভ। তোমার বিয়ে হইলেইত তোমায় শ্বশুরবাড়ী যাইতে হ'বে।

গৌ। না বাবা, আমি শ্বশুর বাড়ী যাইব না।

ভ। বিয়ে হইলে শ্বশুর বাড়ী যাইতেই হইবে।

গৌ। না বাবা, আপনি আমার বিয়ে দিবেন না।

ভ। দুর পাগ্‌লি, তা' কি হয়।

গৌ। কেন হবে না ?

ভ। তোমার বিয়ে না দিলে আমার যে জাতি যাইবে।

গৌ। আপনার জাতি বড় না আমায় বিদায় করে দেওয়া বড়। আর দেখুন, আমি বড় হইলে রাঁধিয়া নিতাই গৌরের কত ভোগ লাগাইব, আর মাকে আপনাকে কত খাওয়াইব।

নৌকার মধ্যে পিতা কন্যা আলাপ করিতে থাকুন, আমরা ইতঃমধ্যে সুশীলা কি করিতেছেন, দেখি! ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে বাটী হইতে চলিয়া আসিয়াছেন তাহা হেমলতার সহিত গৌরপ্রিয়ার কথোপকথনে কথঞ্চিৎ ব্যক্ত হইয়াছে। সুশীলার হৃদয় বড় কোমল। পতি এবং কন্যা বাড়ী হইতে চলিয়া আসিবার পর সুশীলা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুস্থ হইতে পারেন নাই। সুশীলার কেবল মনে হইতেছে, আমাদের পোড়া কপাল, কোথায়ও সঙ্গে যাইবার যো নাই। গতরাত্রিতে সুশীলার একটুকুও নিদ্রা হয় নাই। সকাল হইতে কেবল ঘর বাহির করিতেছেন, প্রতি নৌকার দিকে তাকাইয়া মনে করিতেছেন, এই নৌকায় দুইজনে আসিতেছেন; কিন্তু তরণী পাণিহাটীর ঘাট অতিক্রম করিবামাত্র সুশীলা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাটীর ভিতর আসিতেছেন।

সুশীলা গৌরপ্রিয়াকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে থাকিতে পারেন না। সেই একমাত্র অঞ্চলের নিধি চব্বিশ ঘণ্টা কাল না দেখিয়া থাকা সুশীলার পক্ষে কিরূপ কষ্টজনক তাহা সহৃদয় মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন।

বেলা ১০টা। সুরেন ঠাকুর সেবা করিতেছে, এমন সময় সুশীলা আসিয়া কহিলেন, বাবা, তোমার কাজ হ'ল, আমার রসুই ত হইয়া গিয়াছে।

সু। মা, আপনি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করেন।

সু-লা। তাড়াতাড়ি আর কৈ, ১০টা বাজিয়া গিয়াছে।

সু। আমাদের বাটীতে ১২টায়ও ভোগ লাগে না।

সু-লা। তোমাদের বাড়ীর মেয়েরা বাছা, কি রকম ক'রে কাজ করে বুঝিতে পারি না।

সু। হাঁ মা, পণ্ডিত মহাশয়ের ত এই সময় আসিবার কথা।

সু-লা। কি জানি বাবা! তাঁরা বাপে ঝিয়ে বড়লোকের বাড়ী গেছেন, তাঁদের কথা ছেড়ে দাও।

সুশীলা ঠাকুর গৃহের দরজার সম্মুখে সুরেনের সহিত এই কথা বলিতেছেন এমন সময় গৌরপ্রিয়ার সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা শুনিতে শুনিতে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছেন।

ভ। এই আমরা আসিয়াছি গো।

সু। তবু ভাল, আমরা মনে করিতেছি, বড়লোকের বাড়ী গিয়া গরীবদের ভুলিয়া গিয়াছেন।

ভ। না, নৌকায় গৌরপ্রিয়া বলিতেছিল, আমাদের পাণিহাটীর বাটীই ভাল।

গৌ। মা, আমার সইদের বাড়ী খুব মস্ত, আর সকল ঘর কেমন

সাজান। আর রাধারমণের গায়ে কত গহনা। মা, তুমি আমার নিতাই গৌরকে গহনা দাও না।

স্থ। আমি কোথা পাব মা, গরীব। তোমার বড়লোকের বাড়ীতে যখন বিয়ে হ'বে, তখন তুমি তোমার নিতাই গৌরকে গহনা দিবে।

ভ। না, গৌরপ্রিয়া নৌকায় আমায় বলিতেছিল, সে বিয়ে করিবে না।

গৌ। বাবাকে আমি আর কোন কথা বলিব না। সব মিছে কথা বল্‌ছেন।

ভ। না গো না, তুমি শুনো না, আমি সব মিছা কথা বলছি।

স্থ। আচ্ছা আপনারা স্নান করুন। বাবা স্থরেন, আমি তবে ভোগ লয়ে আসি।

বিশ্রামানন্তর পিতা ও কন্যায় স্নান করিতে গেলেন। ইত্যবসরে স্থরেন শ্রীশ্রীনারায়ণ দেব এবং নিতাইগৌরকে ভোগ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিল। ভোগ সরিলে আরাত্রিক হইল। স্থশীলা কহিলেন, স্থরেন, আমি তোমাদের তিনজনের আসন করিতেছি।

স্থ। না মা, আমি আপনার সঙ্গে খাইব।

স্থ-লা। তুমি আবার কেন মিছামিছি দেরী করিবে; লক্ষ্মী বাবা, আমার কথা শোন।

স্থ। না।

স্থ-লা। তুমি কথা শোন না, এই দোষ, আমি কখন খাইব, তুমি খিদেয় কষ্ট পাবে।

স্থ। আমার ক্ষুধা পায়নি।

স্থ-লা। না, এতবেলায় খিদে পায়নি। তোমার সঙ্গে কে পার্‌বে বাছা, যা ইচ্ছা তাই কর।

স্নান সন্ধ্যা সমাপন করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যাকে লইয়া ভোজন স্থলে আসিলেন।

ভ। সুরেনকেও আমাদের সঙ্গে দাও।

সু-লা। সে আমার কথা শুনে না, আমি কত বলিলাম, সে বলে আমার সঙ্গে খাইবে।

ভ। বেশ, আমরা বাপে ঝিয়ে একঘরে, আর তোমরা মায়ে ছেলেয় একঘরে।

পিতা কন্যায় প্রসাদ পাইতে বসিলেন।

সু। আমার কথা আপনি শুনিতে শুনিতে আসিয়াছেন?

ভ। কি কথা?

সু। আমি আর কি বলিয়াছি?

ভ। তুমি জান।

সু। কাল কখন পৌঁছিলেন, কি খেলেন, কি কথা হইল, সব বলুন।

ভ। তা' বলিব কেন?

সু। আমি একটু শুনিতেও পাইব না।

গৌ। বাবা, বলুন নইলে মা দুঃখ করবেন।

ভ। তুমি বল না।

গৌ। না বাবা, আপনি বলুন।

সু। যান্ আমি আপনাদের কথা শুনিতে চাই না।

গৌ। মা, কাল প্রভু সেখানে ছিলেন।

সু। আমার ভাগ্যে তাঁহার দর্শন নাই।

ভ। কালিকার দিন রাত্রি কিরূপ ভাবে এক নিমিষের মধ্যে যাইল, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না আর যেন স্বপ্নের মত বোধ হইতেছে।

গৌ। হাঁ বাবা, কাল আমরা বড় সুখে ছিলাম।

সু। কিসের সুখ গৌরপ্রিয়া?

গৌ। মা, কাল কথোপকথনে ভারি সুখ হইয়াছে, আর প্রভুর সকলই আনন্দময়, কথা, ভাব, মূর্ত্তি।

সু। কি কথা হইল?

গৌ। সে বাবা বলিবেন।

সু। আচ্ছা এখন থাক, কাজকর্ম্ম সারা হউক, পরে ভাল করিয়া শুনিব।

উভয়ের ভোজন শেষ হইলে সুশীলা সুধাকে প্রসাদ দিয়া সুরেনের সহিত আহার সমাধা করিলেন। আজ পূর্ণিমা, পিসীমা বেলা ৩।৪ টার সময় খাইবেন। সুশীলা গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সহাস্য বদনে স্বামীর নিকট আসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পত্নীকে আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা এবং আলাপন শুনাইলেন। সুশীলা সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, কালিকার দিন সুখেই গিয়াছে বটে, আমার শুনিয়াই লোভ জন্মিতেছে; একদিন প্রভুকে আমাদের বাটীতে আসিতে বলিলেন না কেন?

ভ। তিনি কি বলা কহায় আসেন, প্রভু স্বেচ্ছাময়।

সু। তবু বলিতে হয়।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কিশোরীবাবুর আলয় হইতে আসিবার পর কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। এদিকে পিসীমা ক্রমশঃ কৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল হইতে লাগিলেন, কখনও তিনি কাঁদেন, কখনও হাসেন, কখনও 'প্রাণ যায়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। পিসীমাকে দুটী খাওয়ান এখন বড়ই কষ্টসাধ্য হইয়াছে। পিসীমা ক্রমশঃ অধিকতর অস্থির হইয়া উঠিলেন, কখনও বাহিরে ছুটিয়া যাইতে চান, গঙ্গায় ডুবিতে যান, কখনও কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলেন,—

মোর মন সান্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু।

আবার কখনও 'অয়ি নন্দতনুজ' বলিয়া আর বলিতে পারেন না। পিসীমা দেখিতেছেন, নীলাচলে গম্ভীরার ভিতর প্রভু কৃষ্ণ বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল, বাহ্যদশায় কহিতেছেন,

শুন মোর প্রাণের বান্ধব !
নাহি কৃষ্ণ প্রেমধন দরিদ্র মোর জীবন
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥

পিসীমা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব আস্বাদন করিতে তন্ময় হইয়া যাইতেছেন। কখনও প্রভুর বিরহ-প্রাবল্যজনিত আর্ত্তি শ্রবণে পিসীমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রভু কহিতেছেন, "যুগায়িতং নিমিষেণ" ইত্যাদি, 'সখি ! আর আমার সময় কাটিতেছে না, এক এক ক্ষণ এক এক যুগাপেক্ষা অধিক মনে হইতেছে ; আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি শেষ করিতে পারিতেছি না, চক্ষে নিরন্তর বর্ষাধারা বহিতেছে ; সংসার শূণ্য বোধ হইতেছে ;—সখি, একবার আমার বঁধুকে দেখাও, তোমাদের পায়ে পড়ি'। প্রভুর এইরূপ দারুণ বিরহার্ত্তি শ্রবণে স্বরূপ রামরায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া আপনারাই কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন ! পিসীমা এই দৃশ্য অবলোকনে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। আবার পিসীমা দেখিতেছেন, কান্তবিরহোন্মাদচিত্ত প্রভু গৃহভিত্তিতে মুখকমল ঘর্ষণ করিতেছেন আর ওষ্ঠাদি স্থান হইতে রক্ত বহির্গত হইতেছে। পিসীমা তদ্দর্শনে 'হায় ! হায় ! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন।

পিসীমার এতদবস্থায় একমাত্র সঙ্গিনী এবং সান্ত্বনাকারিণী গৌরপ্রিয়া। গৌরপ্রিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বিবৃত প্রলাপ এবং পদাবলী

শুনাইয়া পিসীমাকে সান্ত্বনা করে। কখনও পিসীমা বলেন, গৌরপ্রিয়া, আর আমি বাঁচিতেছি না, কিন্তু আমার কি গতি হইবে, তুই আমার শেষ সময়ে নিতাইগৌর নাম শুনাইস্। গৌরপ্রিয়া অনেক যত্নে পিসীমাকে দুটী প্রসাদ খাওয়াইতে পারিত; ভট্টাচার্য্য মহাশয় পিসীমার পূর্ব্ব আজ্ঞা পালন করিতে থাকিলেন। ক্রমশঃ পিসীমার অঙ্গ শীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু অঙ্গ শীর্ণ হইলেও কখন কখনও এরূপ জ্যোতির্বিশিষ্ট হইত যে, তদ্দর্শনে সকলে বিস্ময়মগ্ন হইতেন। অবশেষে পিসীমা একদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন, আমায় একবার কিশোরীবাবুর কন্যা হেমলতাকে আনিয়া দেখাও আর রমণী ও রাধাপদ যেন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎক্ষণাৎ সুশীলা এবং গৌরপ্রিয়ার সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক কিশোরীবাবুকে একখানি পত্র লিখিয়া সুরেনকে রামকৃষ্ণপুরে পাঠাইয়া দিলেন। গৌরপ্রিয়াও সইকে একখানি পত্র লিখিল।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুরেন কিশোরীবাবুর বাটীতে উপনীত হইবামাত্র রাধাপদকে সম্মুখে দেখিতে পাইল। সুরেন রাধাপদকে চিনে। রাধাপদ ভট্টাচার্য্য পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সুরেন পত্র দুইখানি তাহার হাতে দিল। রাধাপদ সুরেনকে আদর পূর্ব্বক বসাইয়া পিতার নিকট পত্র লইয়া যাইল। কিশোরীবাবু পত্র পাঠ করিয়া ব্রজসুন্দরীকে ডাকাইলেন। ব্রজসুন্দরী পত্রমর্ম্ম শ্রবণে কহিলেন, 'আমারও তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হইতেছে'। এমন সময় হেমলতা আসিলে রাধাপদ তাহাকে গৌরপ্রিয়ার পত্রখানি দিল। হেমলতা পাঠ করিল,—

সই,

ঠাকুর-মা কোন এক অবস্থা-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া তোমায় দেখিতে চাহিয়াছেন, তোমার দাদাদের সঙ্গে লইয়া তোমায় আসিতে কহিয়াছেন।

তাঁহার ভাবাবেশ অবস্থা দেখিয়া তুমি আনন্দিত হইবে। তুমি অবশ্যই আসিবে, আমি আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত রহিলাম।

পাণিহাটী। তোমার—সই,
তাং * * শ্রীমতী গৌরপ্রিয়া।

কি। তবে রাধাপদ তোমরা কাল সকালে রহনা হইও।

ব্র। আমিও যাইব, কিজানি জীবনে আর তাঁহাকে যদি দেখিতে না পাই।

কি। তোমায়ত যাইতে লিখেন নাই।

ব্র। তাতে কি, ভক্তদর্শনে আহ্বানের অপেক্ষা করিতে নাই। আমার তাঁহাকে দর্শন করিবার বড় ইচ্ছা হইতেছে।

কি। তোমার ইচ্ছা হইতেছে, যাও।

ব্র। আপনি বলিতেছেন না ত।

কি। আমি বলিতেছি, যাও।

সুরেন বাহিরে বসিয়া আছে, এমন সময় রমণী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সুরেনকে দেখিবা মাত্র আহ্লাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, সুরেন, কখন এলে? তোমার পায়ে ধুলা, মুখ মলিন,—বলিয়াই রমণী ভৃত্যকে জল ও গাত্র-মার্জ্জনী লইয়া আসিতে কহিল।

সু। না, আমার রাধাপদ দাদার সহিত দেখা হইয়াছে, তুইখানি পত্র ছিল, তাহা লইয়া তিনি ভিতরে গিয়াছেন।

র। সংবাদ কি?

সু। ঠাকুরমা হেমলতা এবং আপনাদের দেখিতে চাহিয়াছেন।

র। আপনাদের—কা'কে-কা'কে?

সু। আপনি ও রাধাপদ দাদা।

র। ঠাকুর মার কি হইয়াছে ?

সু। সর্ব্বদা কাঁদেন, কখনও হাসেন, প্রলাপ কহেন।

র। আচ্ছা তুমি হাতমুখ ধোও। তোমার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, একটু কিছু খাইবে চল।

সু। না, আমার এখন খাইবার অভ্যাস নাই।

এদিকে কিশোরী বাবু সুরেনকে ভিতরে লইয়া আসিতে কহিলেন। রাধাপদ বাহিরে আসিয়া দেখিল রমণী দাদা সুরেনের সহিত আলাপ করিতেছে।

রা। দাদা, সংবাদ শুনিয়াছ ?

র। তুমিত বেশ, সুরেনকে ধুলা পায়ে বসাইয়া চলিয়া গিয়াছ।

রা। কি জানি দাদা চিঠির মধ্যে কি সংবাদ আছে, ভাবিয়া তাড়াতাড়ি আমি পত্র লইয়া বাবার কাছে যাইলাম।

র। বেশ।

রা। তুমি ভাগ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলে, আমার অন্যায় হইয়াছে।

র। দেখ আমি তোমার হইয়া সুরেনকে যত্ন করিলাম।

রা। তোমার কি সুরেনকে যত্ন করিতে নাই ?

র। তোমার সম্বন্ধে যত্ন করিতে হয় বই কি।

রা। এ আবার তুমি কি বল্‌ছ।

র। বাবা, কি বল্লেন ?

রা। বাবা কাল সকালে আমাদের রহনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে কহিয়াছেন। আবার মা যাইবেন, বলিতেছেন।

র। বাবার মত কি ?

রা। মা যাইবেন।

সুরেনকে লইয়া রমণী এবং রাধাপদ শ্রীরাধারমণের আরতি দর্শন

করাইল। অতঃপর সকলে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্রজসুন্দরী সুরেনকে পুত্রবৎ লালন করিলেন। সুরেন সকলের এবম্বিধ স্নেহাচরণ পাইয়া বিগলিত হৃদয় হইল।

পরদিবস প্রভাতে ব্রজসুন্দরী, রমণী, রাধাপদ এবং হেমলতা সুরেনের সহিত পাণিহাটীতে রহনা হইলেন। নৌকার বাহিরে রমণী এবং রাধাপদ জাহ্নবী-কুলবর্ত্তী পাদপরাজির শোভা দর্শন করিতেছে। সহসা রাধাপদ কহিল, 'দাদা, নৌকায় বেড়ান বড়ই তৃপ্তিজনক'।

র। মধ্যে মধ্যে তুমি এদিকে বেড়াইতে আসিতে পার।

রা। তুমি দাদা, কিছু মন কর না।

র। বেশ, আমার দোষ হইল।

রা। তুমি আসিলেই, আমি আসিতে পারি।

র। কেন তুমি একলাও আসিতে পার।

রা। একা কি ভাল লাগে।

র। ভাল লাগিবে।

রা। কিসে?

র। এইদিকে তোমার সম্বন্ধ করিব।

রা। কিসের সম্বন্ধ?

র। যাহাতে তুমি এদিকে মাঝে মাঝে আসিতে পার।

রা। কি দাদা, তোমার কথা বুঝা যায় না।

র। এদিকে তোমার বিবাহ দিব।

রা। কোথায়?

র। পাণিহাটীতে।

রা। যাও, তুমি কি কথায় কি কথা আন।

র। আমার বড় ইচ্ছা গৌরপ্রিয়ার সহিত তোমার বিবাহ হউক।

রা। তোমার বিবাহত আগে হইবে।

র। আমার বিবাহ কিরূপে হইবে?

রা। কেন?

র। দেখ রাধাপদ, আমার বিবাহ যদি না হয়?

রা। না হবে কেন?

র। যদি বিধাতা আমার অদৃষ্টে বিবাহ না লিখিয়া থাকেন।

রা। তুমি তাহা কিসে বুঝিলে?

র। সে কথা পরে বলিব, কিন্তু তোমার গৌরপ্রিয়াকে বিবাহ করিতে মন হয় না?

রা। বিবাহের পূর্ব্বে কাহাকেও বিবাহ করিবার মন হওয়া কিরূপ?

র। তা বটে, বিবাহ করিতে মন হওয়া কতকটা সঙ্গত, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের সহিত বিবাহের মন করা তত সঙ্গত নয়। কেননা যাহার সহিত যাহার বিবাহ হইবে, তাহাদের মিলন কার্য্যের একজন কর্ত্তা আছেন। কিন্তু গৌরপ্রিয়াকে তোমার ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় না?

রা। একথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, গৌরপ্রিয়াকে বোধ হয় অনেকেরই ভালবাসিতে মন হইবে।

র। গৌরপ্রিয়াকে যাহাদের ভালবাসিতে মন হয় তাহারা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান।

রা। কেন?

র। গৌরপ্রিয়া সামান্যা বালিকা নয়, প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্রী।

রা। তা ঠিক।

র। সুতরাং তোমার সহিত যদি তাহার বিবাহের প্রস্তাব হয়, তাহাতে তোমার সম্পূর্ণ অভিমত হওয়া উচিত।

রা। অভিমত বাবা করিতে পারেন।

র। আমি গৌরপ্রিয়াকে এবার যাইয়া কহিব, তুমি আমার ভায়াকে বিবাহ কর।

রা। যাও, তোমার লজ্জা নাই।

র। তোমার বিবাহ হইবে, ইহা ত আহ্লাদের কথা।

এদিকে নৌকার ভিতর ব্রজসুন্দরী সুরেনের সহিত গল্প করিতে করিতে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। নৌকাখানী ক্রমশঃ পাণিহাটীর নিকটবর্ত্তী হইল। গৌরপ্রিয়া সইয়ের প্রতীক্ষায় ঘাটে বসিয়া আছে। ঘাটে নৌকা পৌঁছিবা মাত্র গৌরপ্রিয়া কহিল, 'সই'। হেমলতা নামিয়াই সইকে আলিঙ্গন করিল। গৌরপ্রিয়া ব্রজসুন্দরীকে দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ করিল। অনন্তর সুশীলা ভিতর হইতে আসিয়া সকলকে সমাদর পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সকলে যাইয়া পিসীমাকে দণ্ডবৎ করিলে পিসীমা সকলকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ করিলেন। ব্রজসুন্দরী দেখিলেন, পিসীমা কৃশাঙ্গী, তদীয় উজ্জ্বল গৌরবরণ পরিহিত বস্ত্রজাল ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে অভিপ্রায় করিতেছে। পাতলা ওষ্ঠ দুইখানি সম্যক্ রক্তবর্ণ। নাসিকা তিলফুল সদৃশ, নয়নদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত, প্রেমাশ্রুভরে টল মল করিতেছে, কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ। পিসীমাকে দর্শন করিবামাত্র ব্রজসুন্দরীর মনে হইল, যেন সাক্ষাৎ শ্রীজাহ্নবা দেবী আমার নয়নপথে আবির্ভূতা। ক্ষণকালের জন্য ব্রজসুন্দরী নিস্পন্দ, নির্ব্বাক। কিন্তু পিসীমার সস্নেহ ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ ব্রজসুন্দরীর ভাবান্তর ঘটিল। পিসীমা কহিলেন, গৌরগণের কৃপা অহৈতুকী।

ব্র। আমার আজ বড়ই শুভদিন, আপনার দর্শনে আমি পবিত্র হইলাম।

পি। মা, তোমরা স্নান করিয়া এস।

ব্র। প্রভু-পায় সর্ব্বদা আমাদের মতি থাকে, এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।

পি। আহা! তোমাদের কথায় অনেক শিক্ষা আছে। আর বিলম্ব করিও না, স্নান করগে।

সুশীলা ব্রজসুন্দরীকে পিসীমার কাছে বসাইয়া পাকের ঘরে গিয়া রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। রামকৃষ্ণপুর হইতে ৩।৪ জনের আগমন সম্ভাবনা করিয়া সুশীলা আর আর দ্রব্য সকলই অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়াছেন, কেবল অন্ন প্রস্তুত হইলেই ভোগের আয়োজন সম্পূর্ণ হইবে। ব্রজসুন্দরী গৌরপ্রিয়ার সহিত পাকগৃহের দাবায় আসিয়া উপবেশন পূর্ব্বক সুশীলাকে কহিলেন, ভাই! তোমার বাড়ীটী বড়ই শান্তিময়।

সু। শান্তিময় প্রভুর কৃপায় সর্ব্বত্র শান্তিময়, তোমার উপর প্রভুর কৃপা আছে।

ব্র। না আমি মনের কথা বলিতেছি, বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র আমার হৃদয় ক্রমশঃ জুড়াইয়া যাইতেছে। ভাই, তোমার যেমন মন, সেইরূপ সুখে আছে।

সু। তোমাদের আশীর্ব্বাদ থাকিলেই আমি সকল সুখ, সকল সম্পদ মনে করি।

গৌ। পিসীমা আপনাকে স্নান করিতে বলিয়াছেন।

সু। যাও গৌরপ্রিয়া দিদিকে স্নান করাইয়া লইয়া এস।

গৌরপ্রিয়া তৈল আনয়ন পূর্ব্বক ব্রজসুন্দরীকে কহিল, আমি আপনাকে তৈল মাখাইয়া দিই। ব্রজসুন্দরী অনেক আপত্তি করিলেও গৌরপ্রিয়া তাহা না শুনিয়া তাঁহার অঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইল। হেমলতা সইয়ের ব্যবহার দর্শনে হাসিতে লাগিল। এদিকে রাধাপদ এবং রমণী উভয়ে ঘাটে বসিয়া গল্প করিতেছে। ব্রজসুন্দরী কহিলেন, রমণী কোথা গেল? তাহারাও স্নান করিবে। গৌরপ্রিয়া মা, তুমি একবার তাহাদিগকে দেখ। গৌরপ্রিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলে

তাহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া ঘাটের দিকে যাইল। দুইটী নির্ম্মল সুন্দর যুবক একত্রে বসিয়া আছে, গৌরপ্রিয়ার তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হইল, 'ইহারা আমার নিতাই গৌরকে নিশ্চয়ই ভালবাসিবে, নিতাইগৌরও ইহাদের ভালবাসে'। নিকটে আসিয়া উভয়কে কহিল, 'আপনারা স্নান করুন'।

র। দেখ তোমাদের বাড়ী এলাম, কিন্তু আমাদের কেহ আদর করিল না, আমরা গঙ্গার সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছি।

গৌ। এ বাড়ী নিতাই গৌরের, তাঁহারা আপনাদের যত্ন করিবে।

র। তবে তুমি কে ?

গৌ। আমি তাঁহাদের সেবিকা।

র। তুমি নিতাই গৌরকে ভালবাস ?

গৌ। তা জানি না।

র। জাননা কি, তুমি ভালবাস। তুমি নিতাইগৌর ভালবাস, তোমার সই রাধারমণ ভালবাসে।

গৌ। এখন স্নান করুন।

র। চল রাধাপদ, আমরা স্নান করি।

গৌরপ্রিয়া ব্রজসুন্দরী এবং সইকে লইয়া জাহ্নবীকূলে আসিল। ব্রজসুন্দরী কহিলেন, তোমরা বেশ সুখে গঙ্গা স্নান কর, স্থানটী বড় মনোরম। সকলে সুরধুনীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিতে করিতে অপূর্ব্ব আনন্দ স্রোতে ভাসিতে লাগিল।

এদিকে সুশীলা ঠাকুরমন্দিরে ভোগাদি সাজাইয়া দিয়া স্বামীকে নিবেদন করিতে কহিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে সত্বর ভোগ নিবেদন করিলেন। অনন্তর বাহিরে আসিয়া সুশীলাকে কহিলেন,

ব্রজসুন্দরী বড় ভক্তিমতী, আর দেখ বড়লোকের স্ত্রী, যেন তাঁহার কোনরূপ কষ্ট না হয়, আর কথাবার্ত্তা বেশ বুঝিয়া সুঝিয়া কহিও।

সু। আমি অত বুঝিতে সুঝিতে জানি না।

ভ। না না, যা বলি শোন। তুমিত বুদ্ধিমতী, তবু সাবধান করিতেছি।

সু। তবু ভাল আমার দোষের আগেই আপনি সাবধান করিতেছেন। কিন্তু এই প্রথম।

ভ। এই দেখ, তুমি সব পরিহাস মনে করিতেছ, বুড়ো বামনের কথা আর তুমি শুনিবে কেন ?

সু। আপনি বুড়ো হইলে আমিত ছেলেমানুষ থাকিব না।

ভ। দেখ সুশীলা, আমার দোহাই, তুমি সকলকে আদর যত্ন ক'রো; আমিত কিছু জানি না।

সু। সেবারেওত কিশোরী বাবু আসিয়াছিলেন, কিন্তু আপনিত এরূপ বলেন নাই।

ভ। সেবার আর এবার, অনেক ভিন্ন।

সু। কিছুই ভিন্ন নয়।

ভ। হাঁগো হাঁ, তুমি আমার কথা শোন।

সু। তা আমি কি আর কাহাকেও অযত্ন করিব।

ভ। হাঁ, কেহ যেন মনে কিছু কষ্ট না পায়।

সু। আপনার মনে তবে কোনদিন কষ্ট দিয়াছি।

ভ। এই দেখ, আমি কি সে কথা বলিতেছি, সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী তোমার অতিথি, তাঁহার কষ্ট হইলে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নষ্ট হইবে।

সু। আচ্ছা আর আপনার বুঝাইতে হইবে না।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় ব্রজসুন্দরী,

রমণী এবং রাধাপদকে লইয়া স্নান করিয়া আসিলেন। শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া সকলে শ্রীশ্রীনারায়ণদেব এবং নিতাইগৌরের ভোগারাত্রিক দর্শন করিলেন।

সু। ভাই; প্রসাদ পাইবে এস।

ব্র। আমরা একসঙ্গে প্রসাদ পাইব, তুমি ছেলেমেয়েদের আগে দাও।

সু। না তোমরা সব একত্র বস, গৌরপ্রিয়া পিসীমাকে খাওয়াইয়া তার পরে খাইবে।

পি। না না, আজ একসঙ্গেই সকলে প্রসাদ পাইব।

সু। সে ভাল কথা, গৌরপ্রিয়া আসন করগে।

সকলে আসনে উপবেশন করিলে সুশীলা পরিবেশন করিতে থাকিলেন। ভোজন করিতে করিতে পিসীমা কহিতেছেন,—

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বাসম॥

পিসীমা বলিতেছেন আর নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছেন।

গৌ। ঠাকুরমা, তুমি গৌরের অধরামৃত পাইতেছ।

ঠা-মা। গৌরের অধরামৃত পাইতে পাইতে গৌরের উক্তিই মনে হইতেছে, ইহাই ত অধরামৃতের গুণ।

গৌ। গৌরের অধরামৃতের মহিমা কি ঠাকুরমা ?

ঠা-মা। কি সুখ-মাদনে ছুঁহে, অঙ্গে অঙ্গে মিলায়হে,
পশিবারে নাগর আকুল।

পিয়া হিয়া অন্তঃপুরে, কিবা মধুরসপুরে,
ডুবাইতে নাগরী ব্যাকুল ॥
যুগল মনের আশ, সখীগণ সুখবাস,
লীলাদেবী সাধে নিরমিল।
যুগল মিলন তনু, রস কল্পতরু যনু,
দিক উজলিয়া প্রকটিল ॥
উঠিল গৌরাঙ্গ ধ্বনি, অনন্ত আনন্দ-খনি,
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ।
মাধুর্য্যের হুড়াহুড়ি, সাঁতারে আলিমণ্ডলী,
তার মদে হৈল সবে অন্ধ ॥
হই সবে মাতোয়াল, ধায় বলি ভাল ভাল,
মাধুর্য্য-মদের কলস কাঁখে।
কে নিবি কে নিবি আয়, যারে দেখে তারে পিয়ায়,
মধুকর উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
খোল করতাল সঙ্গে, ফিরে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে,
"হরি ও রাম রাম" ঘোষে ॥
গগন ভেদিল বোল, উঠে আনন্দেরি রোল,
পাষণ্ড-হৃদয় ভাব শোষে ॥
জগত মাতান লীলা, গৌরশশী প্রকটিলা,
সে লীলায় যে ভোজন পান।
তাঁর অবশেষ পাই, কহে সবে আরো চাই,
যত পায় তত মাতে প্রাণ ॥
না পাঞা অনাথে কাঁদে, হিয়া নাহি থির বান্ধে,
বাসনায় তনু জর জর।

তোমরা অনাথ বন্ধু, কেবল করুণাসিন্ধু,
দয়া কর গৌর পরিকর ॥

গৌ। ঠাকুর মা, তোমার প্রসাদ পাওয়া হইবে না দেখিতেছি। তুমি এইবার খাও।

ঠা-মা। তুই আমায় খাওয়াইয়া দে।

গৌ। ঠাকুর মা, আমার এঠোঁ হাত।

ঠা মা। তা' হোক্, তুই আমায় খাওয়াইয়া না দিলে আমি খাইব না।

গৌ। আমি খাওয়াইয়া দিব, ঠাকুর মা।

এই বলিয়া গৌরপ্রিয়া ঠাকুরমাকে খাওয়াইয়া দিতে থাকিল। ঠাকুর মা নাতিনীর হাতে খাইয়া বড় তৃপ্ত হইলেন। ব্রজসুন্দরী ভাবিতেছেন, এ সুখ এই পর্ণ কুটীরে কে আনিল? এ বাটীর সকলের মন কি অপূর্ব্ব ছাঁচে গড়া! এই বালিকা বয়সে গৌরপ্রিয়া এরূপ প্রেমময় আচরণ করিতে কোথায় শিখিল? আজ আমার জন্ম সফল। ব্রজসুন্দরী ক্রমশঃ সকলের কথা এবং ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত হইতেছেন। সুশীলা কহিলেন, দিদি, তোমার ভগিনী গরীব, কিরূপে তোমার সেবা করিবে?

ব্র। ভাই, তোমরাই সংসারে প্রকৃত ধনি, আমরাই দরিদ্র। এই প্রসাদ দেবদুর্লভ, আজ আমার বহুভাগ্য মনে করা উচিত।

সু। পায়সটুকু খাও দিদি, ওটুকু আর রাখিও না।

ব্র। আমি কিছু রাখিব না, কিন্তু আর কিছু দিবে না বল?

সু। আমি তোমায় আর কি দিব দিদি!

ব্র। ইহা অপেক্ষা আর কি দিবে, যাহা পরমার্থ তাহাই দিতেছ। ভোজন সমাপ্ত হইলে গৌরপ্রিয়া নিতাইগৌরকে শয়ন করাইতে

যাইল। রাধাপদ ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া আবার নিতাইগৌর দর্শন করিল। রাধাপদর মনে হইতেছে যেন ঠাকুর দুটী কি বলিতেছেন, কিন্তু সে ভাল বুঝিতে পারিতেছে না, রাধাপদর চিত্ত বড় ব্যাকুল হইল। গৌরপ্রিয়া বাহিরে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, গৌরপ্রিয়া, তোমার ঠাকুর কথা বলেন ?

গৌ। কেন আপনাকে কিছু বলিয়াছে নাকি ?

রা। তোমার সহিত বলেন কিনা বল না ?

গৌ। গৌরকে যে ভালবাসে গৌর তাহারই সহিত কথা বলে।

রা। আমিত তোমার গৌরকে ভালবাসিনা।

গৌ। আমার গৌরকে আপনি ভালবাসেন না ?

রা। তোমার গৌরকে আমি কেন ভালবাসিব ?

গৌ। আমার গৌর কি আপনার গৌর হইতে নাই ?

রাধাপদ গৌরপ্রিয়ার এই কথায় সহসা উত্তর করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তা আমি জানি না।

গৌ। আমার গৌর আপনি নিবেন ?

রা। তুমি দিবে কেন ?

গৌ। যে ভালবাসে গৌর তাহারই, যাহারা ভালবাসে তাহারা এক প্রাণ, এক প্রাণ হইলে আপনার আমার থাকে না।

রা। তোমার কথা ঠিক।

রাধাপদর অনুভব হইল গৌরপ্রিয়া সামান্যা বালিকা নহে। গৌরপ্রিয়া মনে করিতেছে, রাধাপদ আমার গৌর দেখিয়া ভুলিয়াছে, রাধাপদর প্রতি গৌরপ্রিয়ার এই ভালবাসা হইবার সূত্রপাত হইল। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে ব্রজসুন্দরী পিসীমার নিকট যাইয়া তদীয় মুখ-নির্গলিত গৌরলীলামৃতাস্বাদনে বড়ই সুখী হইতে লাগিলেন। পিসীমা কহিতেছেন,—

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য পুর মধুর হইতে সুমধুর
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হইতে সুমধুর
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হইতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনায় এক কনে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশদিকে ব্যাপে যার পূর॥

পিসীমা কহিতেছেন, আর কাঁদিতেছেন। পিসীমার ভাব-গদ গদ চিত্ত; নয়নে অশ্রু প্রবাহ, অঙ্গে পুলক, ব্রজসুন্দরী যতই সেই ভাব সুধা আস্বাদন করিতেছেন, ততই তাঁহার চিত্ত উন্মাদিত হইতেছে। আবার পিসীমা হেমলতার হাত ধরিয়া কহিতেছেন,—

সখিহে! কোথা কৃষ্ণ, করাও দর্শন।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও নারহে জীবন॥
এই ব্রজের রমণী কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী
নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই কাঁহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি, রাখ মোর প্রাণ॥
মোর সেই কলানিধি প্রাণরক্ষার মহৌষধি
সখি, মোর তিঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে ধিক্ এই জীবনে
বিধি করে এত বিড়ম্বন॥

কখনও পিসীমার দেহ অত্যন্ত বিবর্ণ, অত্যন্ত কৃশ, কখনও অত্যন্ত

উত্তপ্ত, কখনও শীতাক্রান্ত হইতেছে। গৌরপ্রিয়া নানাবিধ উপায়ে ঠাকুরমার ভাব পুষ্ট করিতে তৎপরা। অপরাহ্ন হইলে ব্রজসুন্দরী শ্রীরাঘব পণ্ডিত জীউর পাঠ দর্শন করিবার জন্য পিসীমার নিকট অনুমতি চাহিলেন, পিসীমা শ্রীরাঘবপণ্ডিতের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাঁলবাসা বিষয়ক কত কথা বলিলেন। অনন্তর ব্রজসুন্দরী রাধাপদ, হেমলতা, রমণী গৌরপ্রিয়ার সহিত দর্শন করিতে যাইলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সকলে দর্শনানন্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। রমণী ও হেমলতা নিতাই গৌর দর্শন করিতেছে। ব্রজসুন্দরী পিসীমার নিকট বসিয়াছেন। রাধাপদ গঙ্গাতীরে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে, এমন সময় গৌরপ্রিয়া তথায় আসিয়া কহিল, আপনি ব'সে কি ভাব্‌ছেন, আমার গৌরকে মনে পড়্‌চে না?

রা। তোমায় মনে পড়্‌ছে আর তোমার গৌরকে মনে পড়্‌ছে।

গৌ। আমায় আবার কেন মনে পড়্‌বে?

রা। তোমার গৌর, তোমায় মনে পড়িলেই, তোমার গৌরকে মনে পড়ে।

গৌ। না না আমায় মনে পড়িবে কেন? গৌরকে মনে হইলে আমায় মনে হইবে। সেই ভাল।

গৌরপ্রিয়ার কথায় রাধাপদ চমকিত হইল। রাধাপদ বুঝিল, গৌরপ্রিয়ার সহিত আলাপ করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। অনন্তর রাধাপদ কহিল, আমি তোমার সহিত কথা বলিতে পারিব না।

গৌ। কেন, আমি কি মন্দ কথা বলিলাম?

রা। তোমার কথার দোষ কে ধরিবে, আমারই কথায় দোষ আছে।

গৌ। দোষ কতক্ষণ থাকে, আমার হউক বা আপনার হউক প্রভুর কৃপাদৃষ্টি হইবামাত্র সব সরিয়া যায়।

রা। গৌরপ্রিয়া, তুমি যাও।

গৌ। কোথায়?

রা। বাটীর ভিতর। আমি একা সুখ পাইতেছিলাম।

গৌ। আমার কথায় দুঃখ পাইলেন?

রা। ভালকথায় কে দুঃখ পায়? কিন্তু তুমি যাও।

গৌ। আমি আপনাকে লইয়া যাইব।

রা। কোথায়?

গৌ। চলুন নিতাইগৌর দেখিগে।

রা। তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাইতেছি।

গৌ। আমি আপনাকে একা একা বসিয়া ভাবিতে দিব না।

রাধাপদ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

গৌ। আপনার মনে কষ্ট দিয়াছি; আপনি আমার সহিত আসুন।

এই বলিয়া গৌরপ্রিয়া রাধাপদর হাত ধরিলে রাধাপদ প্রতি ধমনীতে ধমনীতে যে অনির্ব্বচনীয় অভুতপূর্ব্ব সুখসঞ্চার অনুভব করিল তাহাতে তাহার একমূহুর্ত্তের মধ্যে সমস্ত মনোবেদনা নিঃসারিত হইয়া গেল,— সভয়ে ডাকিল, গৌরপ্রিয়া।

গৌ। কেন?

রা। ছাড়।

গৌ। ছাড়িব না।

গৌরপ্রিয়া সহাস্য বদনে রাধাপদর হাত ধরিয়া নিতাইগৌরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। গৌরপ্রিয়া কহিল, দেখ; কেমন সুন্দর নিতাই, সুন্দর গৌর।

রাধাপদ দেখিল, দুই ভাই তাহারদিকে চাহিয়া হাসিতেছেন আর

যেন কি বলিতেছেন। ব্রজসুন্দরী রাধাপদর সহিত গৌরপ্রিয়ার এবম্বিধ আচরণ দর্শনে সুখী হইলেন। অতঃপর ঠাকুরের আরাত্রিক হইল।

এদিকে সন্ধ্যাও হইতেছে পিসীমার চিত্ত কৃষ্ণবিরহে উন্মাদ হইতেছে। সেই রাত্রি ব্রজসুন্দরী পিসীমার অদ্ভুত ভাবাবলি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পিসীমার আর্ত্তি, ক্রন্দন শ্রবণে সকলের হৃদয় বিগলিত হইল। পিসীমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব আস্বাদন করিতেছেন,—

তোমার মাধুরী বল তাতে মোর চাপল
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাও কাঁহা গেলে তোমা পাঁও
তাহা মোরে কহত আপনি॥

সন্ধ্যা হইল বটে, কিন্তু বিরহিণীর কি? বিরহিণীর অনন্ত অন্ধকারময় যুগ আসিল। পিসীমার শ্রীকৃষ্ণবিরহে সেই দশা।

পরদিবস প্রভাতে ব্রজসুন্দরী পিসীমাকে দণ্ডবৎ পূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া রমণী, হেমলতা এবং রাধাপদকে লইয়া বাটী রহনা হইলেন। বিদায় কালে ব্রজসুন্দরী সুশীলাকে কহিলেন, ভাই! আমাদের বাটীতে শীঘ্র একদিন যাইতে হইবে।

বেলা ১০ টার সময় ব্রজসুন্দরী রামকৃষ্ণপুর পৌঁছিলেন।

পিসীমা আর অধিকদিন ইহ জগতে থাকিলেন না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

হেমলতার উৎকণ্ঠা।

শৈশবকাল হইতে রাধাপদ এবং হেমলতা যেরূপভাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। অপিচ হেমলতায় শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ-শক্তি বিশেষ যে ক্রীড়া করিতেছে এতদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কেননা সম্প্রতি হেমলতা ব্যক্ত যৌবনা, কিন্তু তথাপি তাহার মনে অদ্যাবধি কোনরূপ প্রাকৃত ভোগসুখে রুচিমাত্র জন্মে নাই। তদ্বিপরীতে হেমলতা শ্রীরাধারমণে ক্রমশঃ প্রগাঢ়রূপে অনুরাগ পোষণ করিতেছে। শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ হেমলতা সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন স্বরূপে দর্শন করে। তাহার বয়স যখন ৯ বৎসর তখন হইতেই ভ্রাতা ভগিনীর ক্রীড়ার বিষয় শ্রীরাধারমণ বিনোদিনী। তখন হইতেই হেমলতা শ্রীরাধারমণ বিনোদিনীকে ভালবাসে। দিনের পর দিন যায়, হেমলতার প্রীতি ক্রমশঃ স্রোতস্বিনী সদৃশী হইল। মাসের পর মাস যায় সেই অনুপমা প্রীতি গভীরা বেগবতী নদীর আকার ধারণ করিল, বর্ষাপ্লাবনে দুইকুল ভাসাইয়া চলিল। ক্রমশঃ বারিধি সন্নিকটবর্ত্তীনী হইলে সেই নদী অগণন মুখে উচ্ছ্বলিত হৃদয়া হইয়া সাগর সঙ্গমে ধাবিত হইল। রমণী এবং রাধাপদ দুইজন এই প্রীতি স্রোতস্বিনীর দুইকুলে দাঁড়াইয়া ভাব তরঙ্গ দেখিতেছে। রমণীর বড় ইচ্ছা, এই স্রোতস্বিনীতে একবার অবগাহন করে, কিন্তু রমণী ভাল সাঁতার জানে না, তাই ইতস্ততঃ মনে দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হেমলতা যখন শ্রীরাধারমণ দর্শন করিত, সে দেখিত, ঠাকুরটী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া নিকটে ডাকিতেছে ; কিন্তু হেমলতা কোনদিন ঠাকুরের কথা শুনে নাই। একদিন রাত্রিযোগে হেমলতা শুইয়া আছে, সহসা দেখে, পীতাম্বর শোভিত মুরলিধর নটবর বেশে তাহার শয্যার নিকট দাঁড়াইয়া। হেমলতা ভয়ে উত্তরীয় দ্বারা আপাদ মস্তক আবৃত করিল। শ্রীরাধারমণ ডাকিলেন, হেমলতা! হেমলতা শিহরিয়া উঠিয়া ডাকিল, মা! পার্শ্বের প্রকোষ্ঠেই ব্রজসুন্দরী ছিলেন, কন্যার সশঙ্ক আহ্বানে মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মা, কি হ'য়েছে।

হে। মা! আমার ভয় ক'চ্চে।

ব্র। কিসের ভয় মা?

হে। কে যেন ঘরে আসিয়াছিল।

ব্র। কে আর ঘরে আসিবে, তুমি ঘুমাও।

হেমলতা আর কোন উত্তর করিল না। হেমলতা এক অদ্ভুত ভাবাবেশে সেই রাত্রি যাপন করিল।

পরদিন প্রভাতে হেমলতা শ্রীরাধারমণ দর্শন করিতে গিয়া দেখিল, যেন ঠাকুর বড় অভিমান করিয়া তাহার সহিত কোন কথা বলিতেছেন না। তদ্দর্শনে হেমলতা হাসিল, সেই হাসির অর্থে এই ভাব নিহিত ছিল, যে ঠাকুর তুমি বড় দুষ্ট, চুপি চুপি লোকের ঘরে যাও।

আর একদিবস শ্রীরাধারমণ হেমলতার নিকট যাইয়া কহিলেন, দেখ হেমলতা, আজ তুমি আর কাহাকেও ডাকিও না।

হে। তুমি আসিলে আমার ভয় করে, আমি একা যে।

শ্রীরা। দেখ, তোমার নিকট কেহ থাকিলে আমি আসিতে পারি না।

হে। কেন?

শ্রীরা। সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না। আমি তোমায় একটী অনুরোধ করিব।

হে। শীঘ্র বল, আমার ভয় হইতেছে, কেহ যদি দেখে।

শ্রীরা। কেহ দেখিবে না। তুমি বল 'আমি তোমায় ভালবাসি'।

হে। কেন তোমায়ত বিনোদিনী ভালবাসে, তোমার ভালবাসার অভাব কি। তুমি যাও। আমি বিনোদিনী দিদিকে ভালবাসি, বলিতেছি।

শ্রীরা। আর আমায় ভালবাস না?

হে। আবার তোমায় আমি কেমন করিয়া ভালবাসিব!

শ্রীরা। আমার জন্য তোমার কিছুই নাই?

হে। তুমি যাও, আমি তোমার সহিত আর কথা বলিতে পারিতেছি না।

কেউ আস্‌বে।

শ্রীরাধা। কেউ আস্‌বেনা, তোমার ভয় নাই।

হে। তোমায় ভরসা নাই।

শ্রীরাধারমণ প্রণয়কাতর স্বরে ডাকিলেন, হেমলতা!—

হে। তোমার পায়ে ধরি যাও নতুবা—।

নতুবা কি? এই কথা বলিতে বলিতে সহাস্য বদনে রাধারমণ হেমলতার হাত ধরিল। আত্যন্তিক অভিমানভরে হেমলতা চৈতন্য হারাইল। সেই অবস্থায় হেমলতা অনুভব করিল, বিনোদিনী আসিয়া রাধারমণকে কত মন্দ বলিতেছেন আর তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া অনেক সোহাগ এবং মুখে চুম্বন করিতেছেন। এইরূপে আনন্দাবেশে হেমলতার অনেক সময় অতিবাহিত হইল।

রাত্রি ১০টা বাজিয়াছে। এই সময়ে রমণী, রাধাপদ এবং হেমলতা

প্রসাদ পায়। হেমলতাকে অনুপস্থিত দেখিয়া ব্রজসুন্দরী কহিলেন, দেখত রমণী হেমলতা আসে না কেন। মাতার আজ্ঞানুক্রমে রমণী হেমলতার প্রকোষ্ঠে যাইয়া দেখিল, হেমলতা ভাবনিবিষ্ট মনে বসিয়া আছে, রমণী একবার দুইবার, তিনবার হেমলতার নাম ধরিয়া ডাকিল। রমণী কিন্তু কোনই উত্তর পাইল না, রমণী হেমলতার ভাব স্বভাব জানে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া অতি সম্মুখবর্ত্তি হইয়া দেখিল, হেমলতা কাঁদিতেছে। রমণীর ইচ্ছা হইল, হেমলতার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেন কাঁদিতেছে। কিন্তু রমণী তাহা পারিল না। হেমলতার চরণে রমণীর দৃষ্টি পড়িল। সেই চরণের সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্য দর্শনে রমণীর বড় দৈন্য জন্মিল, ভাবিল আমি হেমলতার চরণ স্পর্শের অযোগ্য, হাত ধরিব কিরূপে। রমণী আবার ডাকিল, হেমলতা! এইবার হেমলতার কর্ণে রমণীর কণ্ঠস্বর প্রবেশ লাভ করিল।

হে। দাদা, কি?

র। তুমি খাইবে না? চল।

হে। আমি পিসীমার সঙ্গে খাইব; আপনি ও দাদা প্রসাদ পান গে।

র। প্রসাদ না পাও চল মা ডাকিতেছেন।

হে। আপনি ছাড়বেন না।

এই বলিয়া হেমলতা আনন্দ বিভোর প্রাণে ধীরে ধীরে গাহিতে গাহিতে রমণীর সহিত চলিল।

ব্র। তোমাদের ডাকিতে ডাকিতে ৭ ঘণ্টা হইল।

হে। আমি দাদাকে বল্লাম, পিসীমার সঙ্গে খাইব।

ব্র। আচ্ছা এখন বস।

হে। আমি খাবনা।

ব্র। অমনি মেয়ের রাগ হইয়া গেল। না, তুমি লক্ষ্মী।

র। তোমরা মায়ে ঝিয়ে মীমাংসা কর, আর আমরা খিদেয়মরি।

হে। দাদাদের দাও না।

ব্র। তুমি না খাইলে তোমার দাদারা খাইবে কেন!

হে। আমি গেলেই ভাল।

ব্র। দেখ্ হেমলতা, খাবার সময় যা মুখে আসে বল্‌চিস্। * * * হ্যাঁ হেমলতা, মাকে এইরূপ কথা শোনাতে হয়, কার কাছে এই ভাব শিখিচিস্।

মাতা কন্যাকে অনেক আদর করিয়া খাওয়াইতে থাকিলেন। রমণী ও রাধাপদ উভয়ে সেই দৃশ্য দেখিয়া বড় আনন্দিত হইল। রাধাপদ হেমলতাকে আর একটু খেপাইবার মানসে বলিল, মার মেয়েটীই সর্ব্বস্ব, আমরা—।

হে। আমি মাকে বল্লুম পিসীমার সঙ্গে খাব, আমার কথা কেউ শুনবে না।

ব্র। তুমি খাও, ওর কথা শুনো না।

হে। না শুনবে না। মা তুমি দাদাকে খাওয়াইয়া দাও, আমি দেখি।

ব্র। দূর পাগলি। শীঘ্র খেয়েনে।

হে। আমি তবে খাবনা।

র। তা মা রাধাপদকে খাওয়াইয়ে দেননা।

ব্র। আজ তোমরা এই লীলা করিতে থাক।

এই বলিয়া ব্রজসুন্দরী স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে রাধাপদকে প্রসাদ তুলিয়া খাওয়াইয়া দিতে থাকিলেন।

হে। মা হাতটা ধুলেও না। আমি কোথায় যাব।

ব্র। বাছা, আমি ভুলিয়া গিয়াছি, তুমিও কিছু বল্লেনা।

হে। আমারই ত দোষ।

র। আচ্ছা, ছেলেবেলা ত ভাই বোনে এক পাতে খাইতে আজ সেই ছেলেবেলার কথা মনে কর।

ব্র। ঠিক বলিয়াছ, বাবা, তোমাকেও একটু খাওয়াইয়া দিই।

রা। হাঁ, আমারও মা তোমায় বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল। আজ হেমলতার অধরামৃত চলিত হইল।

হে। তার ফলে আমার নরক হউক।

রা। তুমি মনে কর তুমি আমাদের দিদি।

হে। তা কেন মনে করিব।

রা। তুমি মনে না কর আমরা করিব।

হে। মা যত অন্যায় করছে।

ব্র। আচ্ছা তুমি আবার দাদাদের অধরামৃত খাও তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে।

এই সংসার নশ্বর। কিন্তু সাধু ভক্ত কৃপায় প্রকৃত সম্বন্ধ বোধ হইলে সংসারবাসের নশ্বরতা ঘুচিয়া যায়। তবে এই কথা নিশ্চয় সম্বন্ধ-প্রবুদ্ধ আদর্শ সংসারে অতি বিরল। তথাপি আদর্শই আমাদের চিন্তার বিষয়। আদর্শ ভাবিতে ভাবিতে একদিন না একদিন তাহার সাক্ষাৎকার হইবেই হইবে।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনীতে হেমলতার প্রীতি ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে থাকিল। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সহিত হেমলতার ঘনিষ্ঠতা কিরূপে সম্ভব, আর এই ঘনিষ্ঠতা কি মানসিক, না সাক্ষাৎ? শ্রীবৃষভানুনন্দিনীত হেমলতার সমসাময়িক কোন ব্যক্তি নহেন বা তিনি হেমলতার প্রতিবাসিনী নহেন। তবে তাঁহাতে যে হেমলতার প্রীতি, তাহা কি কেবলমাত্র কল্পনাময়ী? আমরা এইমাত্র দেখিতেছি যে, শ্রীবৃষভানুকিশোরী শ্রীনন্দনন্দনবামে

শ্রীবিগ্রহরূপে সিংহাসনোপরি দণ্ডায়মানা। শ্রীবিগ্রহ দর্শনকালে আমাদের অনুভব যে পর্য্যন্ত আনন্দদায়ক, তাহার বিচারে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শ্রীনন্দনন্দনের শ্রীবিগ্রহ দর্শন জনিত আনন্দ এবং সাক্ষাৎ শ্রীনন্দনন্দন দর্শন জনিত আনন্দ ইহাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ ভেদ আছে। হেমলতা সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন বামে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী দর্শন করিত। সুতরাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনী হেমলতার সমসাময়িক লোক ত বটেই এবং তিনি তাহার স্বামিনী এবং হৃদয়ের অধিশ্বরী, প্রতিবাসিনীর কথা আর অধিক কি? ইহাই হেমলতার স্বাভাবিক দৃঢ় বিশ্বাস। কেনই বা এইরূপ বিশ্বাস না হইবে, যখন বাঁকা যুবকটী হেমলতার প্রণয়ার্থী, নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া প্রণয় ভিক্ষা করেন, তখন হেমলতার বিশ্বাসের অভাব হইবে কেন?

আর একটী বিষয় আমাদের বিচার্য্য আছে। শ্রীরাধারমণ সম্বন্ধে হেমলতা যেরূপ ভাব পোষণ করেন, তাহা কি স্বতন্ত্রনায়িকাস্বভাবসুলভ অথবা আনুগত্যমূলক। স্বতন্ত্র নায়িকাস্বভাবসুলভ ভাব হইলে প্রণয়ার্থী ত্রিভঙ্গকে কেন হেমলতা উক্তরূপ ভাবে উপেক্ষা করিল। যিনি সাক্ষাৎ কন্দর্পদর্পহারী বিদগ্ধশেখর নায়কমুকুটমণি নবকিশোর নটবর তাঁহার সোহাগোক্তিময়ী প্রণয় প্রার্থনা হেমলতা কোন শক্তিবিশেষ প্রণোদিত হইয়া সামান্য মনে করিল? হেমলতার স্বতন্ত্র নায়িকাস্বভাবসুলভ ভাব থাকিলে হেমলতা শ্রীরাধারমণের কথায় রসময় ত্রিভঙ্গ অঙ্গে তৎক্ষণাৎ ঢলিয়া পড়িত। অথচ হেমলতা যে রাধারমণকে ভালবাসে না তাহা নহে বা হেমলতার উক্তি কিছু প্রকৃত উপেক্ষাময়ী তাহাও নহে। শ্রীরাধারমণ হেমলতার নিকট হইতে যে ভালবাসার প্রার্থী সেই ভালবাসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন ভালবাসা হেমলতা শ্রীরাধারমণকে উপঢৌকন দিবার জন্য অভিলাষিণী। দিতে হইলে ভাল দ্রব্যই কাহাকেও দিতে হয়।

যদি গ্রহিতা অজ্ঞ হয়, ন্যায়পরায়ণ দাতা কেন তাহাকে বঞ্চনা করিবে। সৎ দাতা উৎকৃষ্ট বস্তু দান করিয়া স্বীয় উদার স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। আনুগত্যময়ী প্রীতি যে স্বাতন্ত্র্যভাবময়ী প্রীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, ইহাই আমাদের এখন বুঝিবার বিষয়। উজ্জ্বল রসের বিষয় যেরূপ অদ্বয়, আশ্রয়ও সেইরূপ অদ্বয়-তত্ত্ব। ইহা লীলাবিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ মূল একটী সূত্র। লীলাপ্রকাশে নারায়ণাদি বহু বিষয় এবং লক্ষ্মী আদি বহু আশ্রয় প্রকটীত হইলেও লীলাতত্ত্বে বিষয় আশ্রয় অদ্বয় তত্ত্ব। উজ্জ্বল রসের অদ্বয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় শ্রীরাধারই নারায়ণাদি এবং লক্ষ্মী আদি বিলাস মূর্ত্তি ভেদ। এই বিচারে বিষয় আশ্রয় উভয় তত্ত্বেরই অদ্বয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়। অতএব নারায়ণাদির শ্রীকৃষ্ণানুগত্য এবং লক্ষ্মী আদির শ্রীরাধানুগত্য হওয়াই যুক্ত। এতদ্ব্যতিক্রমে রস রসাভাস বলিয়া পরিগণিত হইবে। অবশ্য রস এবং রসাভাস উভয়ই লীলার অঙ্গ। পরন্তু তুলনাসিদ্ধ উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণে রসমর্য্যাদাবোধ বহু ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। হেমলতা আশ্রয়ানুগত্য প্রীতির মর্য্যাদা অনুভবে স্বতন্ত্র নায়িকাস্বভাবে আর শ্রীরাধারমণকে ভালবাসিতে চায় না। শ্রীকৃষ্ণও আশ্রয়ানুগত্য প্রীতিই বড় ভালবাসেন। হেমলতার নিকট তদীয় প্রণয় ভিক্ষার কারণ লীলা লাম্পট্য অথবা প্রেম-পরীক্ষা, পাঠকবর্গের যাহা ভাল লাগে বুঝিয়া লউন।

বিষয়টী আরও পরিষ্কার বুঝিতে হইলে দৃষ্টান্ত অবলম্বনে বিচারণীয় হউক। লক্ষ্মী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বেণু, রূপ, প্রেম এবং লীলামাধুর্য্য কর্ত্তৃক ক্রমান্বয়ে আকৃষ্ট হইয়া তদীয় ভজনে মনন করিয়া তপস্যাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীবৃষভানুদুলারৈকজীবন শ্রীশ্যামসুন্দরে শ্রীনারায়ণদেবের আনুগত্য থাকিলে প্রিয়তমার ঈদৃশ আচরণ তাঁহার কোন মনঃক্ষোভের কারণ হয় না। আনুগত্য অসিদ্ধে উদ্বেগ অবশ্যম্ভাবী। এই এক কথা।

আর এক কথা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীকীর্ত্তিদানন্দিনীর আনুগত্যে অনভিরুচিতা হেতু দুশ্চর তপস্যা বৃথা। বিষয়ানুগত্য প্রীতি আমাদের আলোচনীয় নহে। কেননা ইহা গোলোকবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বৈভববিলাস মূর্ত্তি তাঁহাদের কথা। আমাদের আশ্রয়ানুগত্য প্রীতিরই উৎকর্ষ বিচার প্রয়োজন। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাপ্তি শ্রীরাধানুগত্য ব্যতীত দুরাশামাত্র। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পর্য্যন্ত এই নিয়ম অনতিক্রম্য, অন্যের কথা কি? হেমলতা যদি আজ স্বতন্ত্র নায়িকা হইয়া শ্রীরাধারমণকে আত্মসমর্পণ করে, তবে তাহার শ্রীব্রজবিহারী শ্রীব্রজবিহারিণীর উপাসনা কিরূপে সিদ্ধ হয়?

তাহা হইলে মীমাংসা হইল এই, হেমলতা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর আনুগত্যে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরকে ভালবাসেন। কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া হয়? শ্রীরাধারমণের সহিত কথোপকথনে হেমলতার মনের ভাব যেন আরও নিগূঢ় গম্ভীর রমণীয় প্রদেশজাত বলিয়া অনুভূত হয়। কিসে? "আর আমি কেমন করিয়া ভালবাসিব?" এই কথার মর্ম্মে বোধ হয় হেমলতার প্রাণ, মন, হৃদয়, সর্ব্বস্ব শ্রীব্রজবিনোদিনী কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। যতই শ্রীব্রজবিনোদিনীর নাম মনে হয়, যতই তাঁহার গুণরাশি শ্রুত এবং কীর্ত্তিত হয়, যতই তাহার প্রেম সুখময় সঙ্গ করা যায়,—ততই ক্রমশঃ হৃদয় ঐ শ্রীগোবিন্দপ্রিয় রাতুল চরণে ক্ষণে সহস্রবার বিক্রীত হইতে চায়। আরও মনে হয়, হৃদয় তুমি একটী, তোমায় কতবার আমি প্রিয়চুম্বিত পদে বিক্রয় করিব। তুমি অনন্ত হও, অনন্ত হইয়া সেবা-কৌশল বিস্তার কর, আমি কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হই।

তাইত হেমলতা শ্রীব্রজবিনোদিনীর নাম, গুণ, লীলা শ্রবণ এবং কীর্ত্তনে তাঁহাকে এত ভালবাসিতে শিখিয়াছে, কই আমরা ত পারিতেছি না। প্রথমে জাগতিক সুখে বিতৃষ্ণা অনন্তর সাধুসঙ্গ তৎপরে

শ্রীরাধাকৃষ্ণোদ্দেশ, অতঃপর সেবালালসা তদনন্তর উৎকণ্ঠা ;—ইহার মধ্যে অনন্ত বিঘ্ন, লাভ, পূজা-প্রতিষ্ঠা, ভজনাভিমান, ত্রিবিধ অপরাধ আরও কত আছে, তাহার কে সংখ্যা করিবে। হেমলতার বয়স এই চৌদ্দ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, ইহার মধ্যে হেমলতার উৎকণ্ঠাময়ী অবস্থা বর্ণিত হইতেছে, ইহা কি সম্ভবপর ? এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। হ্লাদিনীশক্তি-সম্ভূতা হেমলতার শ্রীকৃষ্ণানুরাগ স্বভাবসিদ্ধ। স্বভাব শ্রীকৃষ্ণানুরাগময় হইলে মন যখন স্বভাবসিদ্ধ। স্বভাব শ্রীকৃষ্ণানুরাগময় হইলে মন যখন স্বভাবরূপ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চেষ্টা সমুদয় প্রকাশ করেন সেই সমস্ত চেষ্টা তখন যে স্বাভাবিক শ্রীকৃষ্ণানুরাগময়ী হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? স্বভাব শ্রীকৃষ্ণোন্মুখতা প্রাপ্ত হইলেইত মন ধরা পড়িল। স্বভাব পরিবর্ত্তন ব্যতীত মনের পরিবর্ত্তন হইতেছে না। আমাদের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ স্বভাব হইয়া মন বিবিধ বিষয় বাসনা বিক্ষিপ্ত। অবশ্য হেমলতার অবস্থাপ্রাপ্তি আমাদের দুর্ঘট, তবে যদি অহৈতুকী শ্রীকৃষ্ণকৃপাপ্রভাবে আমাদের মন শ্রীকৃষ্ণানুরাগশীল-জনের চরণে বাঁধা পড়িয়া যায়, তবেই আমাদের গতি। বৈষ্ণবচরণে চিত্ত আকৃষ্ট না হইলে বুঝিতে হইবে মন এখনও পর্য্যন্ত ফাঁদে পড়ে নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মনালির ফাঁদ। মন যাঁহার ঐ বিচিত্র ফাঁদে পড়িয়াছে, তিনি যে মনুষ্য-জীবন কৃতার্থ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের একটী প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয় রহিয়া গিয়াছে। শ্রীরাধারাণীতে হেমলতা আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আত্মসমর্পণ বুঝিতে কি ? যুবতীকে যুবতীর আত্মসমর্প্ণ,—এই আত্মসমর্পণেরই বা মর্ম্ম কি ? নায়িকার প্রতি নায়িকার আত্মসমর্পণ—এই আত্মসমর্পণে কি বিশেষ মিষ্টত্ব আছে, যে মিষ্টত্ব আস্বাদনে লোভযুক্ত হইয়া হেমলতা স্বীয় নায়িকাত্ব

নায়িকাশিরোমণি শ্রীব্রজবিনোদিনীর চরণে উৎসর্গ করিয়াছে। হেমলতা কেন, কত ব্রজবালা শ্রীরাধারাণীর পায়ে জন্মের মত বিকাইয়াছে, তাহার কি সংখ্যা আছে। সকলেই রূপে গুণে অতুলনীয়া, সকলেই যূথেশ্বরী হইবার বিশেষ উপযুক্তা। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে। শ্রীরাধারাণী এমন প্রাণ মন অপহরণ করিতে জানেন যে একবার তাঁহাকে দর্শন করার কথা দূরে থাক, একবার তাঁহার নাম লইবা মাত্র আর কোন নায়িকার স্বাতন্ত্র্য ভাব থাকে না, তৎক্ষণাৎ আত্মহারা প্রায় তাঁহার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিবার জন্য সকলের চিত্ত আকুল হয়। তৎক্ষণাৎ মনে হয় আমাদের স্বতন্ত্র নায়িকাত্বে আর প্রয়োজন নাই, আমরা তোমার দাসী হইয়া তোমার চরণে চিরদিন রহিব আর তুমি তোমার প্রাণেশকে অশেষবিধ মতে সুখী কর, আমরা তোমার কিঙ্করী হইয়া প্রাণপণে আনুকূল্য করিব। আর তুমি চিরসুখে থাক, তোমার বালাই লইয়া আমরা যাই সেও ভাল। তোমার সুখই আমাদের কোটিপ্রাণ, তোমার দুঃখ আমাদের কোটী মৃত্যু তুল্য হউক।

কিন্তু কিগুণে শ্রীবৃষভানু কুমারী সকলের এতটা চিত্ত আকর্ষণ করেন। গুণ আছে বৈকি। কত গুণের কথা বলিব, শ্রীরাধারাণী গুণখনি। একটি গুণ এই তিনি বড় অনুগত হইতে জানেন। যিনি তাঁহার সমীপে আসিবেন শ্রীরাধারাণীর অনুগত্য দর্শনে চমৎকৃত হইবেন। তিনি এতই সমীপবর্ত্তী জনের অনুগত যে সেই আনুগত্য ভাব তাঁহাতেই সম্ভব, সে আনুগত্যের আর তুলনা নাই। এমন কেহ নাই শ্রীরাধারাণী যাহার অনুগত নহেন বা হইতে পারেন না এবং এতই অনুগত হইবেন যে সেই আনুগত্যের বশীভূত না করিয়া তিনি কাহাকেও ছাড়িবেন না। শ্রীরাধারাণীর আনুগত্য গুণ দর্শনে স্বতঃই সকলের তাহাকে মন সমর্পণ করিবার প্রবৃত্তি হয়। তদীয় এই স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণ অনিবার্য্য, সাধ্য

নাই কেহ সেই আকর্ষণ শক্তির প্রভাব অবজ্ঞা করিতে পারে। অন্যের কি কথা অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যসম্পন্ন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন যাহার একান্ত বশীভূত হইয়া থাকিতে ভালবাসেন তিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আনুগত্য প্রীতি-নিকেতন। যিনি ভালবাসিতে জানেন তিনি সেই পরিমানে অনুগত হইতে জানেন এবং শ্রীরাধারাণীর স্বভাব কিরূপ ভালবাসাময়, ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায়। প্রেমিক প্রাণ বিকাইতে চায়, একদিন দুইদিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য প্রাণ বিকাইবার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা কবে মিটে যত দিন না শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণ দর্শন ঘটে ততদিন আকাঙ্ক্ষা মিটে না, মিটে না। সেই ততদিনের মধ্যে প্রেমিক কত জনের নিকট প্রাণ বিকাইবার জন্য অভিপ্রায় করিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার প্রাণ লইতে স্বীকার হইল না। অথবা কাহারও নিকট প্রাণ বিক্রয় হইতে চাহিল না। প্রাণ সর্ব্বত্র হইতে বড় হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল; কিন্তু প্রেমিক নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে থাকিল। তিনি বালকের মত কাঁদিতে থাকিলেন। অনেকক্ষণ ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিলেন। হৃদয় অভ্যন্তর সহসা আলোকিত হইল। প্রেমিক দেখিলেন, এক সৌম্যমূর্ত্তি সুপুরুষ মুখে রাধা রাধা বলিতেছেন। সেই শুভক্ষণে প্রেমিকের প্রাণ শ্রীরাধানামের নিকট বিক্রীত হইল। প্রাণ আর নাম ছাড়িতে পারে না। প্রাণ নামসুখময় হইয়া নাচিতে লাগিল। শ্রীরাধানামের এত শক্তি, তাঁহার দর্শন না জানি কত শক্তি ধরে।

আমাদের হেমলতা শ্রীরাধারাণীর পায়ে জন্মের মত প্রাণ বিকাইয়াছে। শ্রীরাধারাণী হেমলতার হৃদয় রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী,—হেমলতার স্বামিনী। হেমলতা আর কিছু চায় না, হেমলতা চায়, হে স্বামিনি, আমায় তোমার দাসীর অনুদাসী-চরণে স্থান দিয়া কাছে রাখ, সকলের

আনুগত্যে তোমার সেবার ভিখারিণী এই কিঙ্করীকে অঙ্গীকার কর। ঈদৃশ ভাবাপন্ন হেমলতার নিকট শ্রীরাধারমণ আর অধিক কি প্রত্যাশা করিতে পারে। অধিক প্রত্যাশার পরিণাম শ্রীপ্রিয়াজীর প্রণয় ভৎ´সনা শ্রবণ। তাহাই ঘটিল। সংজ্ঞাহীনা হেমলতাকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতে করিতে বেশ করিয়া লম্পট স্বভাব প্রাণেশকে দুই কথা শুনাইয়া দিলেন।

সেই হইতে রাধারমণ আর হেমলতার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করেন নাই। শ্রীরাধারাণীর প্রণয়পুষ্টিলাভে হেমলতা অতি সুন্দর মনোহর আকৃতি ধারণ করিতে লাগিল। আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবাসী হেমলতার অপরূপ রূপ দর্শন করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত। হেমলতা সর্ব্বদা মানসে প্রিয়াজীর সন্নিধানবর্ত্তিনী, তদীয়া সেবাকার্য্যে নিযুক্তা। আবার কখনও হেমলতা বিরহোন্মাদিনী, চক্ষের জলে দুই বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতেছে; তখন পিতা মাতা অতি সন্তর্পণে হেমলতাকে সুশ্রূষা করিতে থাকেন।

ক্রমশঃ হেমলতার চিত্ত উৎকণ্ঠা প্রধান হইল। হেমলতা সর্ব্বদাই বিরহভাবিত অন্তঃকরণ। যেন পাইয়াও পায় নাই, ধরিয়াও ধরিতে পারে নাই। প্রেমের স্বভাব বিচিত্র। প্রেমে কখন কি ভাবায়, প্রেমিকই বুঝিতে পারেন না, অন্যের কথা কি? এইরূপে হেমলতা কখনও উন্মাদ, কখনও ব্যাধিগ্রস্ত, কখনও মূর্চ্ছিত হইতে থাকিল।

হেমলতা আর অধিক দিন ইহ জগতে থাকিল না। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী তদীয়া কিঙ্করীকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। কিশোরী বাবু উদ্যান মধ্যে কন্যার সমাধি দান পূর্ব্বক একটি অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাত্রী নির্ব্বাচন।

ছয় মাস অতীত হইল হেমলতা অপ্রকট হইয়াছে। এই ছয়মাস কাল পরিবারস্থ সকলেই হেমলতার বিরহে ম্রিয়মাণ। কিশোরী বাবু এবং ব্রজসুন্দরী নিরন্তর হেমলতার সদ্‌গুণাবলি কথোপকথন করিয়া নয়নজলে ভাসিতেন। উভয়ে প্রায়ই হেমলতাকে স্বপ্নে দর্শন করিতেন। সেই দর্শন অতি অপূর্ব্ব। কখনও দেখিতেন হেমলতা শ্রীরাধারমণের সহিত ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতেছে, কখনও দেখিতেন, হেমলতা অতি সুন্দর মালা গাঁথিয়া বিনোদিনীকে সাজাইয়া দিতেছে। এইরূপ অপরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া জনক জননী হর্ষ এবং বিষাদসাগরে এককালে মগ্ন হইতেন।

রাধাপদ হেমলতাকে ভাবিতে ভাবিতে কখনও কখনও এরূপ তন্ময় হইয়া যাইত যে চারিদিক্ হেমলতাময় দেখিত। আর দেখিত, হেমলতা যেন তাহার সহিত বিনোদিনীর পক্ষ হইয়া কলহ করিতে আসিতেছে; তখন রাধাপদ মনে মনে হেমলতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত। আবার কখনও হেমলতা ছাড়িয়া গিয়াছে ভাবিয়া রাধাপদ অঝোর নয়নে ঝুরিত। ব্রজসুন্দরী পুত্রকে কাঁদিতে দেখিয়া নানাবিধ উপায়াবলম্বনে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইতেন।

আর বিরহদগ্ধ, সন্তপ্ত-বায়ুবিতাড়িত-চিত্ত, ভস্মাবশেষ-হৃদয় রমণী কোথায়? এই যে রমণী নিজ প্রকোষ্ঠে সুখাসনে উপবিষ্ট। কে অনুভব করিবে, রমণী বিরহদগ্ধ? রমণীর মুখে ত বিরহ-দগ্ধতার কোন লক্ষণ

নাই। বদন গম্ভীর, নয়ন শুষ্ক, হৃদয় পাষাণ। রমণী বহুবিধ কষ্ট সহ্য করিবার জন্য বুক পাতিয়া দিয়াছে। দুঃখ—রমণী জীবনের অলঙ্কার। রমণী বুঝিয়াছে তাহার জন্ম দুঃখ সহিবার জন্য, তাই রমণী দুঃখের আগমনে বা সহনে ভীত নহে। শৈশবে মাতৃবিয়োগ, কৌমারে পিতৃ নির্য্যাতন, কৈশোরে প্রীতি বিচ্ছেদ; আর কি দুঃখরাশি সংসারে আছ, এস, রমণী সকলকে গাঢ়-আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত। বিধাতঃ! যত যাতনা সৃষ্টি করিয়াছ, সমস্ত আমার উপর প্রয়োগ কর, আমি তোমায় কিছু বলিব না, আমি তোমায় ভালবাসিব; কিন্তু আমার একটী কথা তুমি রাখ, আমার মত আর কাহাকেও নির্য্যাতন করিও না। সকলকে একটী সুখবিশেষ দানে সন্তুষ্ট করিও, আমার মত দীন চিরকাঙ্গাল আর কাহাকেও সাজাইও না, আর এরূপ অসহনীয় তীব্র দহনে ধিকি ধিকি কাহাকেও জ্বালাইও না। এই আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ কর, আমি তোমায় চিরসুহৃদ্ জ্ঞানে ভালবাসিব। রমণী এইরূপ চিন্তা করে, কিন্তু রমণীর নয়নে কই একবিন্দু অশ্রু নাই ত? রমণী জ্বলিতেছে, রমণীর মন, প্রাণ, নয়ন, দেহ জ্বলিতেছে, জ্বলনে অশ্রুধারা কিরূপে সম্ভবপর? অশ্রু বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া অলক্ষে উর্দ্ধগমনশীল, সে আর কেহ দেখিতে পাইতেছে না। উর্দ্ধতনবাসিগণ তাহার উত্তাপ অনুভব করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতেছেন,—রমণী! তুমি যত দুঃখ সহ্য করিতেছ, এই পরিমাণ সুখভোগে একদিন তোমাকে নিশ্চয়ই আনন্দিত দেখিব।

দিনের পর দিন যায়, ক্রমশঃ ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। কিশোরীবাবু এবং ব্রজসুন্দরী হেমলতা সম্বন্ধে আর বিরহভাব পোষণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের মনে হয় হেমলতা আমাদের নিকটই আছে, সর্ব্বদা শ্রীরাধারমণ সেবা করে, আর ঠাকুর হেমলতাকে বড়ই

ভালবাসেন। রাধাপদর হৃদয়ে গৌরপ্রিয়ার মনোমোহিনী মূর্ত্তি থাকিয়া থাকিয়া উদ্ভাষিত হয়, তখন রাধাপদ সেই মূর্ত্তিরই স্মরণে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে, আর হেমলতার বিরহ তাহার হৃদয় আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি রাধাপদ হেমলতাকে ভুলিতে পারিবে না, গৌরপ্রিয়া ও হেমলতা যে অচ্ছেদ্য সখিত্ব বন্ধনে জড়িত, তাহা রাধাপদর স্মৃতিরাজ্য এখনও পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ব্রজসুন্দরী পুত্রের এই শোকাকুল অবস্থা সন্দর্শনে ভাবান্তর করিবার নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। একদিন ব্রজসুন্দরী স্বামির নিকট তনয়ের সম্বন্ধে নিজ মনোভাব জানাইতে প্রয়াসী হইতেছেন।

ব্র। রাধাপদ হেমলতার কথা ভুলিতে পারিতেছে না, এখনও লুকাইয়া নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদে।

কি। রাধাপদ হেমলতার জন্য কাঁদে, এই কাঁদা তুমি কি মনে কর

ব্র। ভাই বোনের এমন ভালবাসা দুর্লভ।

কি। রাধাপদ কাঁদে, আমি কাঁদিতে পারি না। রাধাপদ ভাগ্যবান্।

ব্র। তাই বলিয়া কি মায়ের প্রাণে সহ্য হয়।

কি। তুমি কোন উপায় কর।

ব্র। রাধাপদর বিবাহ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

কি। বিবাহ দাও।

ব্র। তাহাকে বিবাহে সম্মত করাও কঠিন।

কি। কেন?

ব্র। একে হৃদয় শোকাকুল, তাহার পর রমণীর বিবাহ না হইলে রাধাপদ বিবাহে সম্মত হইবে কেন?

কি। রমণী বিবাহ করিবে কিনা, সন্দেহ।

ব্র। সে কি হেমলতাকে ভালবাসিত?

কি। তুমি কি মনে কর?

ব্র। তুমি বল।

কি। ভালবাসিত এবং এখনও বাসে; সে আর বিবাহ করিতে পারিবে না। তুমি তাহার সহিত রাধাপদর বিবাহের পরামর্শ করিও।

ব্র। সেই কথাই ভাল।

পতির পরামর্শানুসারে এক দিবস অপরাহ্ন সময়ে ব্রজসুন্দরী রমণীকে নিজ সন্নিধানে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বল, তোমার বিবাহের প্রস্তাব করি। একটী শুষ্ক হাসি হাসিয়া রমণী উত্তর করিল, সম্প্রতি আমার অবস্থা বিবাহের অনুকূল নহে, আপনি রাধাপদর বিবাহের আয়োজন করিলে ভাল হয়।

ব্র। তোমায় রাধাপদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখে, তুমি বিবাহ না করিলে তাহার বিবাহে সে আপত্তি উঠাইতে পারে।

র। এই আপত্তি না উঠিবার ভার আমার উপর থাকিল।

ব্র। তা' ছাড়া তোমায় অবিবাহিত রাখা আমাদের মনে ভাল বোধ হইবে কেন?

র। আমার প্রতি আপনাদের যথেষ্ট স্নেহই তাহার কারণ, কিন্তু আমার কথাও অসঙ্গত নহে।

ব্র। রাধাপদর নিমিত্ত তুমি পাত্রী স্থির কর।

র। আমার একান্ত ইচ্ছা গৌরপ্রিয়ার সহিত রাধাপদর বিবাহ হয়।

ব্র। কর্ত্তা কি সম্মত হইবেন।

র। সম্মত হইতে কোন বাধা নাই, তবে গৌরপ্রিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা।

ব্র। তাহাতে কি হইল, কন্যাটী অপরূপ রূপবতী এবং বিবিধ সদ্‌গুণের আধার।

র। সেইজন্য আমার রাধাপদর পাত্রীনির্ব্বাচনকল্পে গৌরপ্রিয়াই যোগ্য কন্যা বলিয়া দৃঢ় ধারণা হয়।

ব্র। তোমার সহিত আমার অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ মিল।

র। আপনার অভিপ্রায় হইলেই শুভকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

ব্র। তুমি কর্ত্তাকে বুঝাইয়া বলিবে।

র। আবশ্যক হইলে বলিব, আপনার বলাতেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ব্র। কি জানি, তিনি সকল কথাতেই উদাসভাবে উত্তর করেন।

র। আমার মনে হইতেছে এই কার্য্যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। আপনি নিঃসঙ্কোচে বাবার নিকট এই প্রস্তাব তুলিবেন।

ব্র। আজই আমি তাঁহাকে বলিব।

সেই দিবস রাত্রিতে স্বামীর নিকট ব্রজসুন্দরী রাধাপদর পাত্রী নির্ব্বাচন প্রস্তাবে গৌরপ্রিয়ার নামোল্লেখ করিলেন এবং আনুসঙ্গিক তাহার অনেক গুনবর্ণন করিয়া পতির অনুমোদন অপেক্ষায় নীরবে মুখপানে তাকাইয়া থাকিলেন।

কিশোরী বাবু পত্নীর অভিমত শ্রবণ পূর্ব্বক অন্তরে আহ্লাদিত হইলেও বাহে সেইরূপ কোন ভাব প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, তোমার যখন এত পছন্দ হইয়াছে, তখন আমার আর কি বলিবার আছে।

ব্র। বেশ, আমাদের পছন্দ যদি তোমাদের মনোমত না হয়, তবে প্রকাশ করিবে না।

কি। তোমার পুত্রের বিবাহ, তুমি কর্ত্রী।

ব্র। শ্রীরাধারমণের সংসার, তিনি সর্ব্বস্ব।

কি। সত্য ; এই ইচ্ছা কাহার ?

ব্র। শ্রীরাধারমণের।

কি। তোমার বাণী সত্য হউক।

ব্র। না না তোমার মনের কথা বল।

কি। ব্রজ, তুমি কি মনে কর, রাধারমণের যাহা ইচ্ছা তোমাতে আমাতে তাহার সম্বন্ধে পৃথক্ মত হইবে।

স্বামীর এই উক্তি শ্রবণে ব্রজসুন্দরী প্রীতিবিগলিত হইয়া আর কোন উত্তর করিতে সমর্থ হইলেন না। রাধাপদর বিবাহ সম্বন্ধে সেই রাত্রিতে স্বামী স্ত্রীতে আরও অনেক পরামর্শ হইল। ব্রজসুন্দরী পরদিবস প্রভাতে রমণীকে এই শুভ সংবাদ প্রদানে সুখী করিলেন।

ব্র। যাহাতে এই শুভ কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হয় তাহার সম্বন্ধে তোমার উপর ভার থাকিল।

র। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রমণীর হৃদয়ের বীরত্ব ধন্য। এইবার রমণী অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। একদিকে বিমলার প্রগাঢ় স্নেহের বিক্রম, রাধাপদর অকৃত্রিম প্রীতিবন্ধন, অন্যদিকে হেমলতার নিদারুণ বিরহ দুঃখ। তাহার মধ্যে কর্ত্তব্য রাধাপদর বিবাহের উদ্যোগ। রমণী রাধাপদর বিবাহে উদ্যোগী হইতে নিরুৎসাহ নহে। কিন্তু বিমলা যখন ভাবিবেন, আমার রমণীর কেন বিবাহ হইবে না; রাধাপদ যখন দাদার বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে আপত্তি করিবে, তখন রমণী তাহাদিগকে কি বলিয়া বুঝাইবে। ইহাই এখন রমণীর চিন্তা। রমণীকে আর অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে হইল না, বিমলা রমণীর কক্ষার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। রমণী উঠিয়া মাকে প্রণাম করিল।

বি। শুনিতেছি রাধাপদর বিবাহের আয়োজন করিতেছ।

র। হাঁ, রাধাপদর বিবাহ হওয়া প্রয়োজন।

বি। আমিও মনে করি; আর তোমার বিবাহও প্রয়োজন মনে করি।

র। (হাসিয়া) আমার বিবাহ যদি না হয়।

বি। কেন?

র। আমি বিবাহ করিব না।

বি। কি করিবে?

রমণী সহসা এই কথার উত্তর করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, বিবাহ করা ব্যতীত আর কি কাজ নাই।

বি। অনেক কাজ আছে, তুমি সেই সকল কার্য্যে ব্রতী হইতে চাও।

র। আমি সকল কার্য্যেরই অযোগ্য, তোমাদের আশীর্ব্বাদ সম্বল। বিমলা মনে মনে কহিলেন, হৃদয় পাষাণ হও, প্রভুর কার্য্যে অন্তরায় হইও না। প্রকাশ্যে কহিলেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিবার কে? তুমি প্রভুর সামগ্রী, আমায় মা বলিয়া ডাক, সেও প্রভুর অনুগ্রহ! আশীর্ব্বাদ করি তুমি সর্ব্বত্র কুশলে থাক, আর এই হতভাগিনী জননীকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিও—বলিতে বলিতে বিমলা অশ্রুসিক্ত নয়ন এবং রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আর কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে রোরুদ্যমানা, স্নেহার্দ্রহৃদয়া মাতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইল। বিমলা পুত্রকে উঠাইয়া ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাঠকগণ, ইহারই নাম প্রকৃত স্নেহ। এই স্নেহ সর্ব্ব কল্যাণদায়ক। মাতা পিতার অপত্যস্নেহ এই নশ্বর জগতে অধিকাংশ স্থলে সর্ব্বনাশজনক। বিমলা রমণীর মনোভাব বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, এবং বুঝিয়া তাহা যে অনুমোদন করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ অনুমোদন সংসারে বড় বিরল। এইরূপ অনুমোদন বিমলার অসামান্য সৌরভান্বিত অপূর্ব্ব কুসুমবিশেষ-বাসিত হৃদয়ের কথঞ্চিৎ অভিব্যক্তি মাত্র। বিমলা আর দাঁড়াইলেন না, তথা হইতে কার্য্যান্তরে আসিলেন। রমণী চিত্তে চমৎকার মানিল, 'মাকে কি বলিয়া বুঝাইবে' এই চিন্তা তাহাকে আকুল

করিতেছিল, এই চিন্তা হইতে এত সহজে এবং শীঘ্র অব্যাহতি পাইবে ইহা রমণী কল্পনায়ও ভাবিতে পারে নাই; কিন্তু প্রভুর প্রসাদে রমণী অনেক পরিমাণ নিশ্চিন্ত হইল। এক্ষণে রাধাপদকে রাজি করিতে পারিলেই রমণী উপস্থিত সমস্যা হইতে সম্পূর্ণ বিনির্ম্মুক্ত হয়।

দুই এক দিবসের মধ্যেই রাধাপদ শুনিল তাহার বিবাহের আয়োজন হইতেছে এবং রমণী দাদা এই বিবাহের ঘটকালি করিতেছেন। রাধাপদ এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা নাকি সম্প্রতি ঘটকালি কার্য্যে ব্যস্ত আছ, আমার সহিত একটু আলাপ করিবার অবসর হইবে কি ?

র। অবসর অতি অল্প, তুমি শীঘ্র তোমার বক্তব্য শেষ কর।

রা। যদি একটু বিলম্ব হইয়া পড়ে, তবে কিছু অন্যথা ভাবিও না।

র। তুমি বলিয়া ফেল

রা। আমি এই আগামী ছুটিতে বেড়াইতে যাইব।

র। আমিই তোমায় বেড়াইতে লইয়া যাইব, স্থানও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রা। কোথায় ?

র। তোমার বেড়াইবার সে অতি উপযুক্ত স্থান; পুণ্যতোয়া সুরধুনী পুলিনান্তর্গত মনোরম স্বভাব শোভা সমন্বিত, মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত, বিকচ-কুসুমসৌরভ প্রসারিত, বিবিধ বিচিত্র বিহগ সঞ্চরিত, মধুপ গুঞ্জিত চারু নব-প্রীতিবতী বালা বিহরিত,—ভক্তসব শ্রীগৌরাঙ্গ বিলসিত সেই স্থানের বর্ণনা আমি কি বর্ণন করিব।

রা। সময় সঙ্কীর্ণ, স্থানের নামটী মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছি।

র। আমার উপর তোমার তা'হলে বিশ্বাস নাই।

রা। এই কথার আলোচনায় এখন কাজ নাই।

র। তবে বলি।

রা। হাঁ।

সহসা ভাবান্তর প্রাপ্ত রমণী ছল ছল নয়নে অতি কাতর ভাবে রাধাপদর করদ্বয় হৃদয়ে স্থাপন করিয়া কহিল, ভাই, আমি কতদিন তোমার কথা শুনিয়াছি, আজ আমার একটী কথা তুমি রাখ।

রা। তোমার কথা রাখা আমার অসাধ্য, যাহা অসাধ্য তাহা কিরূপে করিব।

র। আমাকে জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে তুমি যে ভালবাস,—যে ভালবাসাকে আমার কথা রাখিতে তুমি অন্তরায় ভাবিতেছ সেই ভালবাসা আর একটু বাস, তাহা হইলে আর সে তোমায় আমার কথা পালন করিতে কোন বাধা দিবে না। আর একটু ভালবাসিয়া আমার প্রীতি-রাজ্যে শরীর প্রীতিবন্ধনে বাঁধিয়া দাও। তাহা হইলে আমি তোমাদের ভালবাসার প্রভাব বুঝিব, তোমাদের জয় দিয়া তোমাদের যথার্থ ভালবাসার মহিমা গাহিব।

রা। তুমি নির্দ্দয়।

আর উচ্চারণ হইল না, রাধাপদ অভিমানে, দুঃখাতিশয়ে মূর্চ্ছিত হইল, রমণীর অঙ্গে অবশ হইয়া পড়িল। রমণী রাধাপদকে হৃদয়ে ধরিয়া আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। রাধাপদর পাষাণ হৃদয় গলিল। রমণীর গর্ব্ব টুটিল,—নয়নে শতধারায় অশ্রু বহিল, তাহাতে রাধাপদর অঙ্গ ভিতিল। সম্বিদ্ পাইয়া রাধাপদ কহিল, দাদা, তোমায় আমি কিছু বলিব না; তোমায় হেমলতা ভালবাসে, তুমি তাহারই কাছে যাইতে চাও, আমি বুঝিয়াছি। আর বুঝিয়াছি আমি হতভাগ্য সংসার যাতনা ভোগ করিব। আমার কপালে যাহা আছে হউক, তুমি হেমলতাকে আমায় একটু ভালবাসিতে বলিও, আমি তাহার হতভাগ্য শুষ্ক হৃদয় দাদা * * * বলিতে বলিতে রাধাপদ আবার নির্ব্বাক্ হইল।

পাঠকবর্গ দুইটি অপার অতলস্পর্শী তরঙ্গায়িত বারিধি যথায় একত্র মিলিত হইয়াছে, তথায় যদি সহসা ভীষণ ঝড় উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গমস্থান যেরূপ দৃশ্য প্রকটিত করে, আজ সেই দৃশ্য রমণী এবং রাধাপদর একত্র সম্মিলিত গম্ভীর হৃদয়-সমুদ্র হেমলতার প্রবল বিরহ-বাত্যায় কথঞ্চিৎ উপমা স্থল।

রাধাপদ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, যেদিন হেমলতা গিয়াছে সেইদিনই ত সুখের হাট ভাঙ্গিয়াছে, তবু পোড়া মন সুখের কল্পনা করিতে ছাড়ে না। দাদা, তুমিও আমাদের ত্যাগ করিবে, হায়! তোমাদের হৃদয় বিধি কি দিয়া গড়িয়াছে। না না দাদা, তুমিই যথার্থ প্রেমিক, আমি স্বার্থপর। আমার উদ্ধার নাই, তোমরা ত্যাগ করিলে। আমি অযোগ্য, তোমাদের দেব-হৃদয় আমার সঙ্গে জ্বালাময় * * *।

র। রাধাপদ, একি বলিতেছ। হেমলতা তোমায় কত ভালবাসে, তাহাতে কি সন্দেহ কর? আমাকে সন্দেহ কর, কিন্তু হেমলতাকে সন্দেহ করিও না। হেমলতা শুদ্ধপ্রীতি-স্রোতস্বিনী। সে ভালবাসা ব্যতীত আর কিছু জানে না, তাহার ভালবাসা দুই একদিনের জন্য নহে। তাহার কথা কি তোমার মনে নাই? হেমলতার চিরদিন পূর্ণ ভালবাসা-স্রোতে জোয়ার ভাঁটা নাই, তাহা দুই কুল ভরিয়া অব্যক্ত মধুর নিনাদে কত ভাব-তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে প্রফুল্ল হৃদয়ে ঐ দেখ জলধি সঙ্গমে মিলিত হইতেছে।

রা। দাদা, তুমিই হেমলতাকে বুঝিয়াছ। আমার অনেক কর্ম্মভোগ আছে, আমি অকৃতজ্ঞ।

র। হেমলতার অভিপ্রায় শুন।

রা। কি?

র। তোমার সহিত গৌরপ্রিয়ার বিবাহ হইবে, ইহা হেমলতা

আমাকে অনেক পূর্ব্বেই কহিয়াছে। আর গৌরপ্রিয়া তোমার উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

রা। বাবা মত দিয়াছেন না কি ?

র। হাঁ।

রা। তুমিই ইহার মূল।

র। সেই সব কথা যাউক। গৌরপ্রিয়াকে জীবনসঙ্গিনী লাভ করিয়া তুমি সুখী হও, ইহা আমার প্রার্থনা।

রাধাপদকে বিবাহে সম্মত করিলে পর রমণীর আর কোন চিন্তা থাকিল না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভ সম্মিলন—জীবনসঙ্গিনী বা প্রেম-সহচরী।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এই শুভ সংবাদ দান করা রমণীর বাকি আছে। তাঁহাকে এই শুভ সংবাদ দিতে যাওয়া রমণীর মনে বড় আহ্লাদজনক কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কন্যা সৎপাত্রস্থ করিতে পিতা-মাতাকে কত চিন্তা করিতে হয়, সেই চিন্তা হইতে সরল উদার হৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণের আর ভাবিতে চিন্তিতে হইল না, ইহা ভাবিয়া রমণী বড় আহ্লাদিত। তাহার পর রমণী গৌরপ্রিয়ার বিবাহ-ব্যয়ভার স্বয়ং লইতে মনস্থ করিয়া অধিকতর আহ্লাদিত। পরীক্ষার পারিতোষিক দরুণ রমণীর কিছু টাকা আছে। সেই টাকা রমণী পাণিহাটীতে ব্যয় করিবে সঙ্কল্প করিয়াছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া রমণী বিমলা মায়ের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সাহ্লাদে পাণিহাটী অভিমুখে রওনা হইল।

ঘাটে নামিবামাত্র গৌরপ্রিয়ার সহিত রমণীর দেখা হইল।

গৌ। ভাল সময়ে ঘাটে আসিয়াছিলাম।

র। (ঈষৎ হাসিয়া) তা ঠিক্ কথা।

রমণীর হাসি দেখিয়া গৌরপ্রিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। গৌরপ্রিয়া জানিত রমণী তাহার সইকে বড় ভালবাসে। আজ সই কোথায়? রমণীর এই হাসির অন্তরালে যে দারুণ বেদনা আছে, সূক্ষ্মদর্শী গৌরপ্রিয়ার দৃষ্টিতে তাহা কি লুকাইতে পারে? গৌরপ্রিয়া সেই বেদনানুভবে কাঁদিল।

র। বাঃ! কাঁদিলে যে?

র। তোমার সই ত আছে। তোমার সই কোথায় যাইবে? তুমি কাঁদিও না।

রমণীর হৃদয় কি উপাদানে বিধি গড়িয়াছে, তাহা পাঠকগণ অনুমান করুন। রমণী, তুমি সংসারে বীর বলিয়া পরিচিত হও, ইহা সকলের প্রার্থনা।

গৌ। ইহা আপনার তত্ত্বকথা।

র। তত্ত্ব না থাকিলে মরিয়া যাইতে হয়।

গৌ। আর কথায় কাজ নাই। আপনি একা যে? কি যেন মনে করিয়া আসিয়াছেন।

এমন সময় সুরেন আসিয়া কহিল, একি, রমণী দাদা কখন আসিলেন?

র। এই ত এলাম।

সু। এইখানে বসে কেন, ভিতরে চলুন। মা কত আপনাদের কথা বলেন।

র। মা আমাদের স্নেহ করেন। চল যাই।

সুশীলাকে রমণী দণ্ডবৎ করিলে তিনি সাশ্রুনয়নে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ীতে নাই, তিনি কার্য্যান্তরে কোথায় গিয়াছেন।

র। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোথায়?

সু। কোথায় গিয়াছেন।

র। আজ আসিবেন না।

সু। তার ঠিক নাই।

ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে সুশীলা রমণী এবং সুরেনকে ভোজন করাইলেন। অনন্তর মাতা এবং কন্যা আহার কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক

রমণীর সহিত নানাবিধ আলাপন করিতে লাগিলেন। কথোপকথনে মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইলে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" বলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন গৌরপ্রিয়া "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" বলিয়া পিতাকে সম্বর্দ্ধনা করিল।

গৌ। বাবা, তোমার জন্য কিছুই রাখি নাই।

ভ। তুমি আমার মা থাকিতে ভাবনা কি?

গৌ। আমি তোমার মা হইব না।

ভ। কেন মা?

গৌ। তা এখন বলিব না।

ভ। আচ্ছা যতক্ষণ মীমাংসা না হয়, ততক্ষণ আমার মা থাক।

গৌ। বাবা, তুমি এখন স্নান কর।

এই বলিয়া গৌরপ্রিয়া অতি যত্নে পিতার অঙ্গে তৈল অভ্যঞ্জন করিতে থাকিল। কন্যার ঈদৃশ প্রেমময় আচরণে মনে কোন ভাববিশেষ উদিত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, মা, আমায় কবে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, দুইদিন সেবা করিয়া কেবল স্মৃতি রাখিয়া যাইতেছ।

গৌ। কেন আমি তোমায় ছাড়িব?

ভ। তোমার শ্বশুর তোমায় লইয়া যাইবে।

গৌ। বাবার কেবলই ঐ কথা।

ভ। সংসারের এই নিয়ম কে অতিক্রম করে।

গৌ। মেয়ে বিদায় করিতে পারিলেই তোমাদের যত চিন্তা যায়।

ভ। হাঁ, মা, এখন তোমায় বিদায় করিবার জন্য ভাবনা হইতেছে।

গৌ। আমি না হয় এক জায়গায় চলিয়া যাইব।

ভ। তোর কেমন সুন্দর বরের সঙ্গে বিয়ে দিব।

র। তা নিশ্চয়, গৌরপ্রিয়ার বর অতি সুন্দর হইবে।

গৌ। আচ্ছা, আপনাকে আর ঘটকালি করিতে হইবে না।

ভ। আচ্ছা, আমি স্নান করিয়া আসি, তোমরা ইহার মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া ফেল।

সু। আপনি স্নান করিয়া আসুন। গৌরপ্রিয়া মা, তোমার গৌর আর খাইতে পারিবে?

গৌ। হঁা মা, খুব খাইতে পারিবে। তুমি ভোগ লইয়া যাও।

স্নান সন্ধ্যা সমাপনান্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। সুশীলা দাঁড়াইয়া রমণী এবং গৌরপ্রিয়া উপবেশন করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অবস্থিত।

র। গৌরপ্রিয়ার বিবাহের জন্য চিন্তান্বিত হইবেন না।

ভ। তোমরা যদি বাবা, মনোযোগী হও, তাহা হইলে আমি আর চিন্তা করিব কেন?

র। আমার বিবেচনায় কিশোরীবাবুর পুত্র গৌরপ্রিয়ার উপযুক্ত পাত্র।

ভ। বাবা, আমরা দরিদ্র।

র। আপনার হৃদয় ধনী হইতেও ধনী।

ভ। প্রভুর ইচ্ছা, তোমাদের উদ্যোগ।

গৌ। ঘটক ঠাকুর এসেছেন।

সু। তোর কপালগুণে কেমন ঘটক মিলেছে দেখ্‌দেখি।

গৌ। আমি গেলেই তোমরা বাঁচ।

এই কথা বলিতে বলিতে গৌরপ্রিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত রমণীর বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত কথা ঠিক হইয়া যাইল। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইল।

পাণিহাটী হইতে আসিয়া রমণী রাধাপদর বিবাহ সমারোহ কিসে

প্রকৃত উৎসবময় হয়, তন্নিমিত্ত বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। কারণ এই ব্যাপারে কিশোরীবাবুর ঔদাস্য দেখিলে রাধাপদর মনক্ষুণ্ণ হইবার কথা। কিশোরীবাবুর ঔদাস্য কিছু বিচিত্র নহে। কেননা হেমলতার বিরহ মনে উঠিলে কিশোরীবাবুকে সকল কার্য্যেই প্রায় উদাসীন হইতে দেখা যায়। এই ভাবিয়া রমণী এমনই উপায় অবলম্বন করিল যাহাতে রাধাপদর বিবাহ ব্যাপার প্রকৃত আনন্দময় হয়। প্রথমতঃ রমণী শ্রীরাধারমণকে বিবাহর বরযাত্রা স্বরূপ পাণিহাটীতে লইতে হইবে, ইহা স্থির করিল। দ্বিতীয়তঃ যাত্রাসময়ে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করিল। তৃতীয়তঃ নৌকার মধ্যে শ্রীরাধারমণ অগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্বাহলীলা পাঠ হইবে। চতুর্থতঃ পাণিহাটাতে সন্ধ্যার পর শ্রীনিতাইগৌর শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত হইলে অগ্নিক্রীড়া ইত্যাদি হইবে এতন্নিমিত্ত বিলক্ষণ আয়োজন করিতে লাগিল।

মনে মনে সমস্ত ব্যবস্থা নিরূপিত হইলে রমণী কার্য্যতঃ প্রয়োজনীয় উপকরণ সমুদয় পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। সেবকগণের দ্বারা একখানি স্বর্ণ সিংহাসন সুসজ্জিত করিয়া লইল। একখানি বজরা স্বর্ণ রৌপ্যখচিত বস্ত্র এবং নানাবিধ আভরণে মণ্ডিত করিতে আরম্ভ করিল। বিবিধ বর্ণের ধ্বজা, পতাকা, চন্দ্রাতপ, সোবোপকরণ দ্রব্য নির্ম্মাণ করাইল। পূর্ব্বেই কিশোরীবাবু রমণীকে রাধাপদর বিবাহসংক্রান্ত ব্যয় তহবিল হইতে করিবার জন্য ক্ষমতা দান করিয়াছেন। সুতরাং রমণীকে আপাততঃ কিছু ব্যয়ের নিমিত্ত কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছে না। পাণিহাটীর মিলনবাসরে সুমধুর সঙ্গীতের ব্যবস্থা করিল। এতৎকল্পে রমণীর যাহা যাহা মনে আসিল, অকুণ্ঠিত চিত্তে সমুদয় সম্পন্ন করিবার জন্য রমণী একাগ্রচিত্ত হইল।

এদিকে কিশোরীবাবু বা ব্রজসুন্দরী রমণী যে ভিতরে ভিতরে এত

আয়োজন করিতেছে, তাহার কিছুই জানেন না। বনিয়াদী ঘরে বন্দোবস্ত করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। সমস্ত উপকরণই ধনীগৃহে থাকে, তবে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যই কার্য্যকালে ক্রয় করিতে হয়। ক্রমশঃ বিবাহের দিন সন্নিকটবর্ত্তী হইল। কিশোরীবাবুর কোনই চেষ্টা নাই। এদিকে রমণীর সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত। ইতঃমধ্যে রমণী একদিন পাণিহাটীতে যাইয়া তথায় যেরূপ আয়োজন করিতে হইবে তন্নিমিত্ত সুরেনের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ। আজ রাধাপদর গাত্রহরিদ্রার দিন। যথাসময়ে অন্তঃপুর মধ্যে সধবা যুবতীবৃন্দ পরমস্নেহযুক্ত হৃদয়ে রাধাপদর গাত্রে হরিদ্রালেপন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ শঙ্খধ্বনী, কেহ উলুধ্বনি, কেহ সুশীতল জল আহরণ করিয়া উৎসব স্থানে রাখিতেছে। রাধাপদর সুন্দর নির্ম্মল অঙ্গ, সরল হাস্যরঞ্জিত মুখকমল দর্শনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই আশীর্ব্বাদ করিতে স্বাভাবিক মনে আসিল। হৃদয়ের সহিত সকলে রাধাপদর কল্যাণ কামনা করিলেন। ভক্তপ্রবর কিশোরীবাবুর পুত্রের বিবাহ সংবাদ শ্রবণে অনেক সাধু সজ্জন আসিয়া রাধাপদকে আশীর্ব্বাদ করিতে আগমন করিয়াছেন। তদ্দর্শনে কিশোরীবাবু পরমোৎসাহে সমাগত ভক্তবৃন্দকে আদর অভ্যর্থনা দ্বারা আপ্যায়িত করিতে নিযুক্ত হইলেন। রমণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

এদিকে পাণিহাটীতে ভট্টাচার্য্য ভবনে মহানন্দ। গ্রামের যাবতীয় কুমারী এবং নববিবাহিতা কিশোরীবৃন্দের সমাগমে আলয় পরিপূরিত। গৌরপ্রিয়ার বিবাহে সকলেই পরম উল্লসিত চিত্ত। নানাবিধ দ্রব্যে আজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ। সকলেই কিছু না কিছু উপঢৌকন সহকারে গৌরপ্রিয়ার বিবাহোৎসব দর্শনে আসিয়াছেন। এমন কি

দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কৃষকপত্নীগণ ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য সহিত এই আনন্দে যোগদান করিতে আসিয়াছে। শ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহাবির্ভাব হইতে গৌরপ্রিয়া বড়ই খ্যাতনামা বালিকা। পাত্রালয় হইতে তৈল হরিদ্রা আসিলে মহানন্দে গৌরপ্রিয়ার গাত্রহরিদ্রা উৎসব নির্ব্বাহ হইল।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ। রাধাপদর আজ বিবাহ। বিবাহ অর্থাৎ কিশোর কিশোরীর শাস্ত্রানুমোদিত মিলন। এই মিলনে ভগবৎ স্মৃতি পুষ্টিলাভ করিলে, এই মিলন সুখময়। এই মিলনে তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, এই মিলন অশান্তিময়। ইহার প্রমাণ অনাবশ্যক, সংসারে সহস্র দৃষ্টান্ত এই বাক্যের নিত্য পোষকতা করিতেছে। বিবাহমিলন-রহস্য মায়াধীশ শ্রীভগবানের কৃপাবলেই ভেদ করা যায়। অন্যথা অসম্ভব। বিবাহের দিবস যুবক ভগবৎ কৃপা স্মরণে কখনই অলস হইবে না। আজ আমি অপরিচিতা একটী বালিকার স্বামী হইতেছি, প্রভু, এই কর যেন আমার নিকট হইতে সে তোমার পরিচয় পায়। আমি যেন স্বামী অভিমানে অভিভূত হইয়া তাহাকে তোমার স্বামীত্বে ভ্রমপরায়ণ না করি। তুমি একমাত্র স্বামী, আমরা তোমার দাসদাসী, তোমার চিরসেবিকা। বিবাহের দিনে আহ্লাদে ভগবান্‌কে ভুল, সে আহ্লাদ আর কয়দিন?

আজ রমণী বড় ব্যস্ত। শ্রীরাধারমণকে বিবিধ বেশভূষণে অলঙ্কৃত করিতেছে। রমণী বিবাহোৎসবের কর্ত্তা। সকলেই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। অনেক বালক গায়ক আপনাদের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ৭।৮ বালক আজ রমণীবেশে পথে এবং বজরার উপরি নৃত্যগীত করিয়া শ্রীরাধারমণকে সুখী করিবে। অপরাহ্ণ হইলে বরযাত্রগণ দলে দলে আসিয়া উপনীত হইলেন। সকলকে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করা হইল। শ্রীরাধারমণ সম্মুখে সুসজ্জিত সিপাহীগণ দুই দিকে সারি দিয়া দণ্ডায়মান। রাধাপদ জনমোহন বেশে যুগলকিশোর

সম্মুখে সমাসীন। সম্মুখে রমণীবেশী বালকগণ সুমধুর স্বরে রসালাপ করিতেছে। বরকন্দাজ বন্দুকের ৭টী গম্ভীর শব্দ করিবামাত্র মধুর বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধারমণ বিজয় করিলেন। পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল।

বিবিধ মধুর বাদ্য ভাণ্ড, নৃত্য গীতের সহিত মহা সমারোহে বরযাত্র সম্প্রদায় জাহ্নবীর তীরবর্ত্তী হইলেন। পথিমধ্যে গবাক্ষদ্বারে যুবতীবৃন্দ অদ্ভুত সমারোহ দর্শনে পরম আনন্দ লাভ করিতে করিতে পরস্পর নানা কল্পনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুসজ্জিত বজরায় শ্রীরাধারমণ বিরাজমান হইলে আবার বন্দুকের গভীর শব্দ হইল। বরযাত্রগণ পরমোল্লাসে বজরায় আরোহন পূর্ব্বক সমাসীন হইলেন। বজরা ছাড়িয়া দিলে অপূর্ব্ব নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। ক্রমান্বয়ে রমণীর ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্ধার লীলা পাঠ এবং নৃত্য গীত হইতে হইতে নৌকা পাণিহাটীর ঘাটে পৌঁছিল। আবার বন্দুক আনন্দ গর্জ্জন করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহ হইতে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল ধরিয়া অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শিত হইল। শ্রীরাধা রাধারমণ, সুসজ্জিত বৃহৎ বহিঃপ্রকোষ্ঠে শ্রীনিতাইগৌর সমীপবর্ত্তী হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহোল্লাসে শ্রীশ্রীযুগলকিশোর এবং দুটী ভাইকে আরাত্রিক নির্ম্মঞ্ছন করিলেন। শ্রীশ্রীনিতাই গৌর, রাধাশ্যাম সমীপবর্ত্তি, বীজন হস্তে দণ্ডায়মান; শ্রীমান্ রাধাপদর অতুলনীয় রূপ এবং ভঙ্গি-শ্রী দর্শনে সমাগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এককালে মুগ্ধ হইলেন।

অনন্তর যথালগ্নে শুভ বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে সমাগত নরনারী পরম তৃপ্তির সহিত প্রসাদ সেবন করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাগ্য বিষয়ে অশেষবিধ ধন্যবাদ এবং প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পরদিবস অপরাহ্নকালে রূপ-গুণ-ভাগ্যবান্ সেবক-সেবিকার সহিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌর রাধারমণ লইয়া রমণী শ্রীরাধারমণ কুঞ্জে গমন করিবার কালে যে উৎসব রচনা করিয়াছিল, তদ্দর্শনে রামকৃষ্ণপুরবাসিগণ অননুভূত বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। গৌরপ্রিয়ার সইয়ের কথা সত্য হইল।

দুই এক দিবসের মধ্যেই রাধাপদ শুনিল তাহার বিবাহের আয়োজন হইতেছে এবং রমণী দাদা এই বিবাহের ঘটকালী করিতেছে। রাধাপদ এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা নাকি সম্প্রতি ঘটকালি কার্য্যে ব্যস্ত আছ? আমার সহিত একটু আলাপ করিবার অবসর হইবে কি?

র। অবসর অতি অল্প, তুমি শীঘ্র তোমার বক্তব্য শেষ কর।

রা। যদি একটু বিলম্ব হইয়া পড়ে, তবে কিছু অন্যথা করিও না।

র। তুমি বলিয়া ফেল।

রা। আমি এই আগামী ছুটিতে বেড়াইতে যাইব।

র। আমিই তোমায় বেড়াইতে লইয়া যাইব, স্থানও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

র। কোথায়?

র। তোমার বেড়াইবার সে অতি উপযুক্ত স্থান, পুণ্যতোয়া সুরধুনী পুলিনান্তর্গত মনোরম স্বভাব-শোভা-সমন্বিত, মৃদুমন্দ-সমীরণ-প্রবাহিত, বিকচ-কুসুম-সৌরভ প্রসারিত, বিবিধ বিচিত্র বিগহ-সঞ্চরিত, মধুপ-গুঞ্জিত, চারু নবপ্রীতিবতী বালা বিহরিত, শ্রীগৌরাঙ্গ বিলসিত,—সে স্থানের বর্ণনা আমি কি করিব।

রা। সময় সঙ্কীর্ণ, স্থানের নামটী মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছি।

র। আমার উপর তোমার তা'হলে বিশ্বাস নাই।

জানিয়া লজ্জা এবং ভাবযুক্ত হইল।

রাধাপদর বিবাহের কয়েক দিবস পরেই রমণী কিশোরীবাবুর আলয় ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যপ্রবণ হৃদয়ে পুণ্যক্ষেত্র ভ্রমণে বহির্গত হইল। কিশোরীবাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও অনেক দিবসাবধি আর রমণীর উদ্দেশ পাইলেন না।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীগুরবে নমঃ।

প্রেম-সহচরী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

[সংক্ষিপ্ত]*

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমণীর বৈরাগ্য জীবন।

রমণী কিশোরী বাবুর শ্রীরাধারমণ সুখদাকুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ পদব্রজে ৺কাশীধামে আসিয়া উপনীত হইল। সুন্দর ব্রাহ্মণ যুবক দর্শনে মঠস্থ সন্ন্যাসিগণ রমণীকে যত্ন করিয়া রাখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। রমণী সকলকে স্বীয় বিনয় এবং ভক্তি গুণে অপ্যায়িত করিল। বেদান্ত চর্চ্চা হইবার সময় রমণী অধ্যাপক এবং ছাত্রগণের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে। মেধাবী রমণী অতি অল্পকাল মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত ধারণা করিয়া লইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ের তর্কগুলিও আয়ত্ব করিয়া ফেলিল। সংস্কৃতে রমণীর পাঠ্যাবস্থা হইতেই প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; সুতরাং সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন রমণীর আর কোন শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে

---

* এই সময় লেখক কঠিন পীড়ায় মৃত্যুদশাপন্ন; এই হেতু দ্বিতীয় খণ্ড অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। প্রকাশক।

হইল না। এক বৎসরান্তে রমণী বারানসী ত্যাগ করিয়া জনৈক সাধু সঙ্গে হিমালয় প্রদেশ পরিভ্রমণ মানসে হরিদ্বারে চলিয়া আসিল। কখনও একা কখনও বা সাধু সঙ্গে রমণী অনেক প্রদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে ধ্যানপরায়ণ মহাপুরুষগণের দর্শন লাভ করিল। রমণীও হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া ধ্যান করে। কিন্তু রমণী ধ্যান করিতে বসিলেই হেমলতাকে দেখে আর দেখে হেমলতা শ্রীরাধারমণের সেবা কার্য্যে বড় ব্যস্ত, রমণীর সহিত তাহার যেন আর কথা বলিবার অবকাশ নাই,—আর দেখে, হেমলতা যেন রমণীকে ইঙ্গিত করিয়া তথায় যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে, যাইবার বড়ই ইচ্ছা হইলেও রমণী এখন যাইতে পারিতেছে না।

পার্ব্বতীয় অঞ্চল এবং তীর্থস্থান ভ্রমণে এক বৎসর কাল অতীত হইলে রমণীর চিত্ত ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল। এতদিন রমণী বেশ নূতন নূতন সিদ্ধান্ত শ্রবণ, নূতন নূতন সৌন্দর্য্য স্থান দর্শনে কাটাইতেছিল, কিন্তু সম্প্রতি রমণীর প্রাণের ভিতর থাকিয়া বড় কাঁদিয়া উঠে। রমণীর আর কিছুই শুনিতে বা দেখিতে ভাল লাগিতেছে না। সহসা এক নিশীতে রমণী এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিল। স্বপ্নে রমণী দেখিল শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথাগ্রে পূর্ব্ব পরিচিত পরমাত্মীয় মহাপুরুষ কীর্ত্তন মণ্ডলীর মধ্যে অদ্ভূত ভাবাবলি প্রকাশ করিয়া নৃত্য করিতেছেন। সেই দিন প্রাতঃকালেই রমণী পুরীধাম অভিমুখে রওনা হইল।

যথা সময়ে রমণী নীলাচলে উপস্থিত হইল। নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করিয়া রমণী মন্দিরের বহির্দ্দেশ হইতে পতিত পাবন দর্শন করিতে করিতে নয়ন জলে ভাসিতেছে আর ভূমে গড়াগড়ি দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছে। রমণী ভাবিতেছে আমি শ্রীমন্দিরে প্রবেশের অযোগ্য; পতিত পাবন দর্শন লাভই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য। এইরূপ চিন্তা করিতেছে,

এমন সময় পূর্ব্ব কথিত মহাপুরুষ সপরিবারে কীর্ত্তন করিতে করিতে তথায় আসিয়া রমণীকে দেখিবা মাত্র বক্ষের মধ্যে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। উভয়েরই তনু প্রেম পুলকিত, নয়ন অশ্রুপ্লাবিত। অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহ কাহাকে সম্ভাষণ করিতে সক্ষম হইতেছেন না। পরস্পর যেন বহুকালের হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবিহ্বল। অবশেষে মহাপুরুষ গদগদ বাক্যে কহিলেন, আইস, শ্রীজগন্নাথ দর্শন করি। শ্রীজগন্নাথের অগ্রে মহাপুরুষ যে অদ্ভুত প্রেম প্রকাশ পূর্ব্বক নৃত্য গীত করিলেন তদ্দর্শনে রমণীর হৃদয় সম্পূর্ণ বিগলিত হইল। অনেক দিন হইতে রমণীর হৃদয় বড় শুষ্ক ছিল আজ তাহা সংকীর্ত্তনরস প্লাবনে পুনরায় সরস হইল।

সংকীর্ত্তনান্তে মহাপুরুষ রমণীকে লইয়া একটী পরম সুখদ আশ্রমে আনিলেন। দুই তিন খানি প্রাচীন প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ এবং ৩।৪ খানি উলুখড় ছাউনির গৃহ, একটি বৃহৎ অঙ্গন, এবং দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান লইয়া আশ্রমটী যেরূপ মনোরম ততোধিক শান্তিপ্রদ। শেষোক্ত গৃহের একখানিতে শ্রীশ্রীরাধা রাধারমণ বিরাজমান। ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠ ভক্তিমান যুবকগণ শ্রীযুগলকিশোরের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত। সকলেই মহাপুরুষের একান্ত অনুগত এবং আশ্রিত। তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র সেবকগণ শশব্যস্তে তাঁহাকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ বা তাঁহার পদ সম্বাহনার্থ উপবেশন করিলেন। আশ্রমস্থ সকলের গুরু সেবায় উৎসাহ এবং ঐকান্তিকতা দর্শনে রমণীর হৃদয়ে কত ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকিল।

আষাঢ় মাস। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ নির্ম্মাণ কার্য্য অনেকদিবস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কথিত আশ্রমে মহাপুরুষের গৌড়দেশবাসী এবং অন্যান্য স্থানীয় শিষ্যবৃন্দের সমাগম হইতেছে। প্রত্যেকের মহাপুরুষের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি এবং অচল স্নেহ দর্শনে রমণী আশ্রমটীকে একটী

সুখের হাট মনে করিতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিল না। মহাপুরুষের কোটী সমুদ্র তুল্য গম্ভীর প্রীতিনিকেতন হৃদয়ের ধারাবাহিক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া রমণী অপূর্ব্ব ভাবরসে আপ্লুত হইল। মহাপুরুষের ভালবাসার তিলমাত্র বিশ্রাম নাই। তাহা প্রত্যেককেই অভিষিঞ্চিত করিয়া পরম তৃপ্তি প্রদান করিতে নিরন্তর উন্মুখ। এইরূপ অবিচারে অযাচিত ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে ভালবাসিবার জন্য ঐকান্তিক সরল আগ্রহ ভরা প্রাণ রমণী আর জীবনে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করে নাই। আশ্রমে যিনি আসিয়া উপস্থিত হন বা আশ্রয় প্রার্থনা করেন মহাপুরুষ তাঁহাকে হৃদয় পর্য্যন্ত দান করিতে উদ্যত হন, দুটী প্রসাদ বা আশ্রয় দেবার কথা কি! কিন্তু তাঁহার প্রাণ লইবে এমন জন সংসারে অতি বিরল।

গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জনের আর দুই দিবস বিলম্ব আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচলিত প্রথানুযায়ী মহাপুরুষ স্বপরিকরে যাইয়া গুণ্ডিচামার্জ্জন কার্য্য মহামহোৎসবের সহিত প্রতি বৎসর সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব দিবস হইতে বহু সংখ্যক সম্মার্জ্জনী ও কলসীর আয়োজন হইতে লাগিল। আশ্রমস্থ নির্ম্মল হৃদয় যুবকগণ প্রচুর উৎসাহের সহিত পর দিবস অপরাহ্নে খোল, করতাল, নিশান লইয়া প্রস্তুত। প্রভুর গুণ এবং লীলা মাধুর্য্যময় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মহাপুরুষ কীর্ত্তন মণ্ডলী মধ্যে প্রফুল্ল শশধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। আবার সেই আনন্দের দিবস বুঝি ফিরিয়া আসিল। কীর্ত্তনমণ্ডলীস্থ এবং দর্শকবৃন্দ প্রত্যেকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামার্জ্জন লীলা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে সেই অসীম আনন্দ উপভোগে বিভোর হইল। সেই অগণন ভক্তগণের সম্মার্জ্জনী হস্তে আনন্দময় হরিধ্বনি, সেই জলপূর্ণ কলসী প্রিয়তমের হস্তে প্রদানানন্তর মহোল্লাস, সেই প্রেমে গড়াগড়ি; সেই অসংখ্য সম্মার্জ্জনীর চালনের শব্দ, সেই ভক্তগণের স্ব স্ব বহির্ব্বাসে করিয়া প্রাঙ্গণস্থ কঙ্কর সমুদয়ের নিক্ষেপ,

সেই জল প্রণালী, সেই চরণামৃত পানে সকলের আগ্রহ—সেই সমুদয় লীলানন্দ অনুভবে রমণীর হৃদয় ভরিয়া যাইল। মার্জ্জন কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার পর ইন্দ্রসরোবরে মহাপুরুষের সহিত সকলে স্নানার্থী হইয়া অবতরণ করিলে যে জলক্রীড়া আরম্ভ হইল তদ্দর্শনে আর কেহই সেই আনন্দে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিল না। সেই জল ফেলাফেলী, সেই মণ্ডলী রচনা, সেই লীলানুকরণ হইতে লাগিল। রমণী বিস্ময় এবং ভাবরস সাগরে ডুবিয়া যাইল। অতঃপর স্নানান্তে মহাপুরুষকে লইয়া ভক্তগণ বিশ্রাম লাভ করিলে মহাপ্রসাদ আসিয়া উপনীত হইল। ভক্তগণ হরিধ্বনি সহকারে মহাপুরুষকে মধ্যে করিয়া প্রসাদ সেবনানন্তর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রথযাত্রা দিবসে অতি প্রত্যুষে আশ্রমস্থ সকলে স্নানাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনমণ্ডলীর সহিত রথ সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রমান্বয়ে শ্রীবলরাম, শ্রীমতী সুভদ্রা, শ্রীজগন্নাথ রথে আরোহণ করিলে ভোগ অর্পিত হইল। অনন্তর অগ্রে শ্রীবলরাম, তৎ পশ্চাৎ শ্রীমতী সুভদ্রা এবং তৎ পশ্চাৎ শ্রীজগন্নাথের রথ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে মহাপুরুষ প্রতি সম্প্রদায় কীর্ত্তন মণ্ডলীর মধ্যে নৃত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। অনেক দিনের পর প্রাণনাথকে পাইয়া শ্রীব্রজপুরে লইয়া যাইবার সময় শ্রীমতীর সেই আনন্দ কে বর্ণনা করিতে পারে? সেই আনন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং উপভোগ করিয়া অন্তরঙ্গ জনকে উপভোগ করাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুগত প্রাণ ভক্তগণ সেই আনন্দ তদীয় আনুগত্যে আস্বাদন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই ভক্তগণের চরণাশ্রয় করেন তাঁহারাও সেই আনন্দ উপভোগের অধিকারী। আজ মহাপুরুষের কৃপায় তদীয় ভক্তগণও সেই আনন্দশক্তি সঞ্চারিত হইয়া উদ্দণ্ড কীর্ত্তন এবং প্রেম বিস্তারে অসংখ্য দর্শকবৃন্দকে মোহিত করিল।

সেই চৌদ্দ মাদল যোগে সাত সম্প্রদায়ের মহানন্দবর্ষী কীর্ত্তনের গগন ভেদী রোল, সেই অনন্ত ভক্তদেহে বিবিধ ভাবাবলীর রণদৃশ্য, সেই ভক্তগণের অদ্ভূত অক্লান্ত উদ্দণ্ড নৃত্য বিস্তার, সেই গভীর প্রেমোচ্ছ্বাসমূলক ভূলুণ্ঠন, সেই ঘন ঘন আনন্দ হুঙ্কার, সেই পরস্পর প্রেমালিঙ্গন, সেই কত শত আনন্দমূর্চ্ছা—আবার দর্শকগণের তৃষিত নয়নের সমক্ষে সেই দৃশ্য প্রকটিত হইল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন।

রথযাত্রা উৎসব সময়ে আশ্রমে যেরূপ বহু শিষ্যবৃন্দ এবং অভ্যাগত জনের আগমন, মহাপুরুষের সেইরূপ সততোন্মুক্ত প্রীতিখনি হৃদয়-ভাণ্ডার, আশ্রমস্থ তদীয় অনুগত যুবকগণ সেইরূপ অবিশ্রান্ত উৎসাহ এবং উদ্যম সহকারে সকলের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত। বেলা ১২টা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পঙ্গতের আর বিশ্রাম নাই এবং ঠাকুরসেবা রন্ধনাদি যাবতীয় কার্য্য আশ্রমস্থ যুবকগণ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে। তাহারা প্রত্যেকেই কি এক অলৌকিক শক্তিবলে বলীয়ান হইয়া মহাপুরুষের অভিমত এবং প্রিয় কার্য্য সাধনে নিরন্তর তৎপর। কেননা মানুষের শক্তিতে ঐরূপ পরিশ্রম স্বীকার সম্পূর্ণ অসম্ভব। অকৃত্রিম অটল গুরুভক্তিই সেই অলৌকিক শক্তি। তাহাদের প্রত্যেকেই সভাবতঃই সেই শক্তিসম্পন্ন। মহাপুরুষের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে ইচ্ছামাত্র তিনি কাহারও চিত্ত চিরকালের জন্য হরণ করিতে পারেন এবং নিশ্চয়ই ঐ সকল যুবকবৃন্দের হৃদয় তিনি আপনার করিয়া লইয়াছেন, নতুবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বদ্ধ জীব মুক্তজনের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে যায় না। যদি কেহ অনুতপ্ত হইয়া যায়, তবে সে সঞ্চারী ভাব বশবর্ত্তী হইয়া আত্মদান করে। এইরূপ সঞ্চারী আত্মদানের দৃষ্টান্ত সংসারে নিতান্ত বিরল নহে।

শ্রীমন্মমহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব এবং অপরাপর

বৈষ্ণবপর্ব্ব বাসর উপলক্ষে আশ্রমে এইরূপে মহাসমারোহ আনন্দ হইয়া থাকে। এইরূপে আশ্রমে নিত্য উৎসব, নিত্য মহাপ্রসাদ বিতরণ, মহাপুরুষের প্রেমময় হৃদয়ের অবিরাম পরিচয়ের ঘটা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এইভাবে মহাপুরুষের পবিত্র আশ্রমে এক বৎসর অতীত হইলে রমণীর চিত্ত কেন যেন আবার চঞ্চল হইল। নির্জ্জনে ভজন করিবার ইচ্ছা করিল। কাহাকেও কিছু বলিতে না পারিয়া রমণী মহাপুরুষকে দণ্ডবৎ পুরঃসর শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে রহনা হইল। তৎকালে শ্রীরাধাকুণ্ডে মহাপুরুষের জনৈক প্রিয় অন্তরঙ্গ অতি দীনভাবে, বৈরাগ্য সহকারে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার সহিত রমণী কয়েক দিন বড় সুখে যাপন করিতে লাগিল। নির্জ্জন শ্রীকুণ্ডের তটে বসিয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামির কত লালসাময়ী আর্ত্তি স্মরণ করিতে করিতে রমণী নয়ন জলে ভাসিত। আবার সন্ধ্যাকালে যখন কুণ্ডতীরস্থ স্থানে আরাত্রিক সময়ে শঙ্খ, ঘণ্টার ধ্বনি উত্থিত হইত, মর্ম্মস্পর্শী সেই ধ্বনি শ্রবণে রমণীর হৃদয় গলিয়া যাইত। আবার নির্ম্মল হৃদয় বৈষ্ণবগণের ভোর নিশীথে, "কোথা গো প্রেমময়ী রাধে" কীর্ত্তন শ্রবণে রমণী ভাবিত, 'এ আমি কোথায় বাস করিতেছি?' আহ্লাদে রমণী মনে মনে প্রভুকে কত ধন্যবাদ দিত। রমণী বেশ বিরক্ত অবস্থায় থাকে, নির্জ্জনে বসিয়া নামকীর্ত্তন করে এবং ক্রমশঃ লীলাতত্ত্ব অনুভবে রমণীর হৃদয় আলোকিত হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! ভগবদ্ভজন বুঝি বিঘ্ন শূন্য হয় না, পরীক্ষা ব্যতীত বুঝি সাধ্যবস্তু লাভ করা যায় না,—তাই কি অপরাধে রমণীর হৃদয়ে আবার বাসনা জাগিল, রমণীর মন আবার চঞ্চল হইল, রমণীর অন্তরায় ঘটিল ঐকান্তিকী লীলাভিনিবেশ লাভে রমণী বঞ্চিত হইল। বৈরাগ্যানুশীলন করা রমণীর শরীরে আর কুলাইল না। ক্রমে ক্রমে রমণীর বেশ আহার

জুটিল, অসঙ্কুচিত চিত্তে রমণী সেই সমুদয় ভোগ করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈরাগ্য-ব্রতাবলম্বী-জনের প্রতি উপদেশ,—

"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।"

বিশেষতঃ সাধকদেহে শ্রীবৃন্দাবন বাস ভোগবিলাসময় হওয়া কখনও বিধেয় নহে। দ্বিতল প্রাসাদে স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া ভোগ বিলাসের সহিত বাস করিবার অনেক স্থান আছে। জানিয়া শুনিয়া পবিত্র ধাম কেন আর কলুষিত কর? শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনা করিতেছেন,—

"করঙ্গ কৌপীন লৈয়া, ছেঁড়া কান্থা গায়ে দিয়া,
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়॥"

মহাজনের এই সকল উপদেশ আমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য নয় কি? রূপ, সনাতন কিছু দরিদ্র ঘরের ছেলে ছিলেন না। শ্রীধামে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিষয়ে তাঁহারাই আদর্শ। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত আমাদের আর কি শ্রেয়ঃ আছে। কোথায় রূপ, সনাতন, বলিয়া আমরা শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইব, না আমরা বেশ দেহাভিনিবেশ সম্পন্ন হইয়া নানাবিধ ভোগবিলাসপর হইতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। শ্রীব্রজধাম বৈরাগ্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের স্থান। ভোগাসক্ত দেহাভিমানী জীবের জন্য এই স্থান নয়। অসমর্থ সাধকের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র ভজনের স্থান বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তথায় আহারদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আহার দোষ ভজনের বড় অন্তরায় ঘটাইয়া থাকে। আধুনিক দুর্ব্বল জীব অন্নগত প্রাণ, ক্ষুৎপিপাসায় সর্ব্বদা কাতর, সাধক অবস্থায়ও উদরবেগ

ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। এতদবস্থায় নীলাচলে বাস করিয়া শ্রীজগন্নাথদেব বিতরিত মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা শরীর পোষণ পূর্ব্বক ভজন করিলে বিশেষ অন্তরায় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কঠোর বৈরাগ্যনিষ্ঠ ভক্তগণকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধামে বাস করিতে আদেশ করিয়াছেন। জগদানন্দকে উপদেশ করিলেন,—

"বৃন্দাবনে যাইবে না রহিবে চিরকাল"।

তাই বলিয়া কি শ্রীরাধারাণী অনধিকারী কাহাকেও ব্রজধামে আসিলে তাড়াইয়া দিয়া থাকেন? তিনি সকলকে ভালবাসেন, আদর যত্ন করেন, চিরদিন থাকিতে বলেন। তিনি করুণাময়ী, তাঁহার করুণা বিস্তারের কিছু ত্রুটী থাকেনা; কিন্তু আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, এমন অহৈতুকী প্রেমময়ীর চরণে বিকাইতে পারিলাম না।

রমণীর তাই ঘটিল, রমণী আর শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর চরণে বিকাইতে পারিল না। অনুতপ্ত হৃদয়ে রমণী আবার পুরীধামে ফিরিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাধাপদর গার্হস্থ্য ভক্ত-জীবন।

রমণী শ্রীরাধারমণ কুঞ্জ হইতে চলিয়া যাইলে পর বিমলা অতি অল্পদিন মধ্যেই সজ্ঞানে হরিনাম লইতে লইতে পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার শেষ সময় মহাপুরুষ আসিয়া অলক্ষিত ভাবে দর্শন দিয়াছিলেন। কিশোরী বাবু এবং ব্রজসুন্দরীর হৃদয় বিমলার বিরহ বেদনায় বড় আঘাত প্রাপ্ত হইল। তথাপি পুত্রবধু শ্রীমতী গৌরপ্রিয়ার মুখ-সুধাকর সন্দর্শনে শ্বশুর শাশুড়ী সকল দুঃখ বিস্মৃত হইতেন। গৌরপ্রিয়ার মুখে কি এক অলৌকিক আনন্দ শক্তি ক্রীড়া করিত, যে দেখিবামাত্র আর কাহারও মনে কোন তাপ থাকিত না, সকলের হৃদয় জুড়াইয়া যাইত। প্রেমের এমনই অদ্ভূত শক্তি, ত্রিতাপ কখনও সেই শক্তির সন্নিহিত হইতে পারে না। যাহারে দেখিলে প্রাণ সুশীতল হয়, সেই বস্তু নিশ্চয়ই প্রেমে গড়া। আমাদের গৌরপ্রিয়া প্রকৃতই প্রেমে গড়া। পাঠকগণ ক্রমে তাহার পরিচয় পাইবেন।

ক্রমে রাধাপদর যৌবনবৃত্তি বিকসিত হইল, ইন্দ্রিয় উপভোগের কথা মনে পড়িল। রাধাপদ অনুতাপে ম্রিয়মাণ হইল। ভাল মন্দ দুইটী বিপরীত কথা। এই দুইটী বিপরীত কথা লইয়াই মানুষের মন। রাধাপদ মানুষ সুতরাং এইবার ভালমন্দের মধ্যে পড়িয়া রাধাপদকে হাবুডুবু খাইতে হইল, রাধাপদ বড় বিপদে পড়িল। এই কষ্টের কথা রাধাপদর কাহাকেও বলিবার ভারি ইচ্ছা হইল; কিন্তু এমন কেহ নাই যে মনের কথা বলিয়া দুঃখের লাঘব করিতে পারে। গৌরপ্রিয়া সর্ব্বদা

নিতাইগৌরের সেবায় ব্যস্ত। অপিচ মলিন চিত্তে গৌরপ্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাধাপদ বড়ই সঙ্কুচিত। গৌরপ্রিয়ার চরিত্র লৌকিক হইয়াও অলৌকিক। এই লৌকিকালৌকিক চরিত্রের মর্ত্ত্যে অবতরণ জীবের মঙ্গলের জন্য। এরূপ চরিত্র অবশ্য সংসারে অতীব বিরল। বিরল না হইলেও সেই সকল অলৌকিক চরিত্রের মর্য্যাদা বিষয়ভোগ-মুগ্ধজন কখন রক্ষা করিতে পারে না। সেই সকল অলৌকিক চরিত্রের সান্নিধ্যলাভ করিয়াও দুর্দ্দৈববশে আমরা তাঁহাদিগকে উপেক্ষা এবং অবহেলা করি। সুতরাং আমাদের সংসারক্ষয়ের সম্ভাবনা অতি অল্প, প্রেম লাভের কথাও বহু দূরে। অলৌকিক চরিত্রশালিনী হেমলতা এবং গৌরপ্রিয়ার সঙ্গলাভের পরও রাধাপদর চিত্তের শুদ্ধিতা লাভ ঘটিতেছে না। কৃষ্ণদাস ভট্টপরিগণের প্রলোভনে পড়িয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধুর সুখময় সঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মায়াশক্তির প্রতাপ নিশ্চয়ই সামান্য নহে।

একদিন অতীব অনুতপ্ত এবং ব্যাকুল হৃদয়ে রাধাপদ বড় কাঁদিল ও হেমলতাকে মনে মনে ভারি স্মরণ করিল। সেই দিন নিশীথে হেমলতা রাধাপদকে দেখা দিয়া কয়েকটী উপদেশ দিল। রাধাপদ কহিল ভাই, যথা সাধ্য তোমার উপদেশ পালন করিব, কিন্তু তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, তাহা হইলেই আমার সমস্ত মঙ্গল হইবে। রাধাপদর আর্ত্তি শ্রবণে হেমলতা কাঁদিল। হেমলতার নয়নজলে কত মলিনতা বিধৌত হইতে পারে, রাধাপদর চিত্তশুদ্ধি হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? নিত্য মুক্তজনের কৃপা বা সহানুভূতিই বদ্ধ জীবের সংসার ক্ষয়ের মূল কারণ। আধুনিক দুর্ব্বল চিত্ত জীবের পক্ষে সাধন ভজন বিড়ম্বনা মাত্র। ক্ষুৎপিপাসাতুর, কামহত, নিরন্তর ইতস্ততঃ ধাবমান চিত্ত লইয়া ভগবদ্ভজন করিবার অভিপ্রায় কি বাতুলতা নহে? আমার ভজন করিবার সাধ্য

কই? আবার যদি বা কিছু ভজন করি অমনি অভিমান আসিল, মনে হইল, আমি বেশ ভজন করিতেছি, অমুকে কিছুই করে না। এই ভজন কিরূপ? যথা ভস্মে ঘৃতাহুতি। এতদবস্থায় ভগবৎ বা ভক্তকৃপাই জীবের একমাত্র উপায়। কলিপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে অবিচারে, আচণ্ডালে, জনে জনে এই কৃপা প্রচুর রূপে বিতরিত হইয়াছে। সেই কৃপা স্মরণই সংসারে ক্ষয় এবং প্রেমলাভের একমাত্র উপায়। আমরা তাহা স্মরণ করিতে চাই না, সেই জন্য অবিশ্রান্ত মায়ার লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি।

সাধকের উপর শ্রীভগবত কৃপা বা ভক্তকৃপা আছে বা হইয়াছে, তাহার লক্ষণ কি? তাহার লক্ষণ—দৈন্য।

"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে"।

উত্তম হইয়াও আপনাকে হীনবুদ্ধি করার নাম দৈন্য। ভজন পরায়ণ হইয়াও আমি ভজনসাধন বিহীন, এই ভাবের নাম দৈন্য। দৈন্যভাব সাধকের অতুল সম্পত্তি। এই দৈন্যই সাধককে ধৈর্য্যশালী করে। সে কেমন?—

বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু পাণি না মাগয়॥

দৈন্য ব্যতীত সাধক—পতি বিহীন নারীর সদৃশ। নারীর রক্ষক, পালক—পতি; সাধকের রক্ষক, পালক—দৈন্য। পতিবিহীন নারীর যেমন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, বিষয় সম্পত্তি বিবিধ অলঙ্কার থাকিলেও তাহার কিছুই নাই, সেইরূপ দৈন্য-বিহীন সাধকের পূজা আহ্নিক, জপ, তপ, পাঠ, সমস্তই বৃথা। শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিতেছেন,—

এক কৃষ্ণ নামে তোমার সব পাপ যাবে।
আর নাম লৈতে তোমার প্রেম উপজিবে॥

কিন্তু দৈন্য-বিহীন হইয়া নাম লইলে ত আর প্রেম হইবে না। কেন? প্রভুর শ্রীমুখের কথা,—

যেরূপে লইলে নাম হবে প্রেমোদয়।
তাহার উপায় শুন স্বরূপ রাম রায়॥

এই প্রসঙ্গেই "তৃণাদপি" শ্লোকের অবতারণা। এই 'তৃণাদপি' ভাবে নাম সংকীর্ত্তন করিতে পারিলেই প্রেম হইবে। এই 'তৃণাদপি' ভাবের অভাব হেতু আমরা তিন লক্ষ নাম করিয়াও প্রেম লাভে বঞ্চিত। অভিমান বড় ভয়ানক বৃত্তি। আমি বৈষ্ণব, আমি অমুক, আমি তমুক, আমি ভাল বুঝিতে পারি—এই সকল দুর্ব্বুদ্ধি বড় অপরিহার্য্য। এই বিষম দুর্ব্বুদ্ধি থাকিতে আমাদের আর কি কুশল হইবে? সাধক-দেহের অভিমান—আমি কৃষ্ণদাস। সিদ্ধদেহের অভিমান—আমি গোপ বা গোপী। আর সমস্ত অভিমান উপাধিময়,—ভজনের, আত্মোন্নতির অন্তরায়।

সৎসঙ্গ এবং সৎশিক্ষাধীনতা প্রযুক্ত রাধাপদ বাল্যকাল হইতেই নিরভিমান। এই নিরভিমানতা গুণেই রাধাপদ অতি শীঘ্র মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সৎসঙ্গে যে কেবল সৎশিক্ষা লাভ হয় তাহা নহে; সৎসঙ্গে অলক্ষিতরূপে সৎভাব সমুদয় সঞ্চারিত হইয়া চরিত্র স্বাভাবিক সৎগঠন লাভ করে। কোন্ ভাগ্যে যে সৎসঙ্গ প্রাপ্তি ঘটে ইহা নিরূপণ করা যায় না। ভগবানের প্রত্যেক লীলার মধ্যে এমন রহস্য থাকে যে তাহা কেহই ভেদ করিতে সমর্থ নহেন। ভগবানের মায়াটী যে কি বস্তু, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া আচার্য্য "অনির্ব্বচনীয়া" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'কেমন করিয়া কি হয়' ইহা বুঝিতে যাওয়া আমাদের বিড়ম্বনা মাত্র। কিসে সৎসঙ্গ লাভ হয়, কেমন করিয়া অভিমান ত্যাগ করা যায়, কিসে প্রেম লাভ হয়—এই

সকল বিষয় আমরা কত ভাবি, কিন্তু কত ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। সত্য সত্যই আমরা নিরুপায়, সত্য সত্যই বুদ্ধিমান হইলেও আমরা বড় অচতুর। বাস্তবিক অনুতপ্ত সাধক আপনাকে নিরুপায় ভাবিয়া যখন বালকের ন্যায় কাঁদে, তখন বুঝি ভগবান তাঁহাকে দেখা দেন। কিসে কি হয় আমরা জানি না। তবে প্রভু বলিয়াছেন—

"ভজুক না ভজুক সেহ মোর দাস।"

তাই ভরসা আছে, এক সময় না এক সময় তিনি তাঁহার জীবকে কোলে টানিয়া লইবেন।

নরতনু ধারণের উদ্দেশ্য বিষয়ে যে সমুদয় মায়ামুগ্ধ জীব নিতান্ত অজ্ঞ, তাহারা যেরূপ যৌবনচাঞ্চল্যের বশীভূত হইতে ইতস্ততঃ করে না এবং আপনাকে ইন্দ্রিয় সুখ বিলাসের অধিকারী বলিয়া মনে করে, বিবেকশালীজন কখনও সেইরূপ যৌবনকালে চরিত্র রক্ষা বিষয়ে অযত্নশীল হয় না এবং আপনাকে ভগবদনুগত ভাবিয়া সুখী হয়। আপাতসুখকর ইন্দ্রিয়-লালসা পরতন্ত্রজীব বিবেকহীন হইয়া নরকস্রোতে ডুবিয়া যায়। ডুবিতে ডুবিতে কেহ চৈতন্য হারাইয়া ফেলে, কাহারও বা স্বল্প চৈতন্য থাকে। কেহ অচৈতন্য অবস্থায় ভাসিয়া উঠে, কেহ বা চৈতন্য থাকিতে থাকিতে ভাসিয়া উঠে। সাধুসঙ্গ এবং হরিনাম প্রভাবে উভয়েরই উদ্ধার সাধিত হইবে বটে, কিন্তু সেই শুভযোগ বড় দুর্লভ এবং প্রথমোক্ত জনের সম্বন্ধে সেই যোগ ততোধিক দুর্লভ; তথাপি কিসে কি হয়, আমরা যখন বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তখন নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যুক্তি সঙ্গত নহে। শাস্ত্রে ভক্তাপরাধকেই অতীব গুরুতর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

"পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।

অপরাপর দোষ অপেক্ষা পরনিন্দা পরচর্চ্চা ভগবৎ কৃপালাভ সম্বন্ধে, ভীষণ অন্তরায়।

আমাদের রাধাপদ সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। চিত্তে মলিনতা না প্রবেশ করিতে করিতে রাধাপদ সতর্ক এবং অনুতপ্ত। চোরের আগমন সংবাদ অতীব সতর্ক গৃহস্থই জানিতে পারে এবং জানিতে পারিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদি অতি সংগোপনে রক্ষা করে। চিরদিন সৎসঙ্গে এবং সদাচারের সহিত যাপন করিতেছে। নির্ম্মল হৃদয় রাধাপদ কেননা সতর্ক হইবে? কিন্তু সেই সতর্কতাশ্রয় কিছু অভিমানমূলক নহে। রাধাপদ আপনার দুর্ব্বলতা ভাবিয়া প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিল, অনেক কাঁদিল, মনে মনে ভক্ত হেমলতাকে স্মরণ করিল। পৌরষভাবে সাধনপথে অগ্রসর হইবার জন্য রাধাপদ ব্যগ্র হয় নাই। বিপদ ভাবিয়া রাধাপদ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। "প্রভু! আমি দুর্ব্বল নিরূপায়, আত্মরক্ষা করিতে আমার কোন সামর্থ্য নাই, তুমি দুর্ব্বলের বল, নিরূপায়ের উপায়, আমি তোমার শরণাগত, বিপন্ন শরণাগতজনকে তুমি ব্যতীত আর কে রক্ষা করিবে?" রাধাপদর কাতর প্রার্থনা শ্রবণে প্রভু হেমলতার মুখে রাধাপদকে উপদেশ করিলেন। কেবল উপদেশ নহে, উপদেশ ছলে শক্তি সঞ্চার করিলেন। কেননা প্রভু রাধাপদকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। রাধাপদ পরনিন্দা, পরচর্চ্চা কাহাকে বলে জানে না। ভগবৎ-কৃপা অহৈতুকী হইলেও এ কথা কখনও মিথ্যা নহে।

হেমলতার উপদেশ মত রাধাপদ নির্জ্জনে বসিয়া অনেক সময় নামকীর্ত্তন এবং ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ করে। গৌরপ্রিয়া ইতঃপূর্ব্বে রাধাপদকে কিছু মলিন দেখিয়াছিল, সম্প্রতি বেশ আনন্দভাবযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

গৌ। আজকাল দেখিতেছি বড় ভজনে মন হইয়াছে।

রা। আমায় আবার কি ভজন করিতে দেখিলে?

গৌ। আপনার দর্শনই পাই নাই।

রা। প্রভুর চরণে যাহাতে আমার অবিচলিত মতি হয়, এখন এই প্রার্থনা কর।

গৌ। কেন, আজ এত দৈন্যভাব কেন?

রা। আমায় আর অধিক জিজ্ঞাসা করিও না।

গৌ। আমায় বলিবে কেন? সই থাকিলে তাহাকে বলিতে।

রা। সুখ দুঃখের কথা হেমলতার নিকট বলা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

গৌ। আমায় আপনার বলিয়া মনে হয় না?

রা। আমি মনে না করিলেও তুমি আমার আপনার।

গৌ। তবে কেন বল না।

রা। আমার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল, হেমলতার উপদেশে এখন মন অনেক ভাল হইয়াছে।

গৌ। আমিও কয়দিন তোমাকে মলিন মলিন দেখিয়াছি। প্রভু সব মঙ্গল করিবেন। তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলে প্রাণ মন সকলই আনন্দময় হইবে। তাই কর, আর কিছু মনে আসিবে না। কেবল শুদ্ধ নির্ম্মল আনন্দ আস্বাদনে কোথা দিয়া দিন চলিয়া যাইবে, তাহা ঠিক পাওয়া যাইবে না।

রা। তোমরাই আমার ভরসা।

গৌ। ভরসা গৌরের পাদপদ্ম।

সেইদিন গৌরপ্রিয়া রাধাপদর কষ্টের কথা শুনিয়া গৌরের নিকট গিয়া অনেক কাঁদিল, অনেক প্রার্থনা করিল। ভগবান্—প্রভু, জীব—দাস। আপন প্রভুকে ভুলিয়া জীবের কষ্ট। এই কষ্ট যার অনুভব হয় সেই জানে। ভগবান্‌কে ভুলিয়া জীবের কি কষ্ট হয়? জীব স্বতন্ত্র

ভোগাভিমানী হয় এবং স্বতন্ত্র ভোগাভিমানী হইয়া যে সমুদয় নিকৃষ্ট জঘন্য নারকীয় বস্তু ভোগে জীবের প্রবৃত্তি হয়, তাহা ভগবদুন্মুখজনের সম্বন্ধে অতীব ঘৃণাকারজনক। এই ঘৃণাকারজনক ভোগেরই জন্য বহির্মুখ জীব সর্ব্বদা লালায়িত এবং উন্মত্ত। ভগবান্‌কে ভুলিলেই জীবের এই দুঃখ অনিবার্য্য। সর্ব্বদা স্মৃতিপথে ভগবান্‌কে রাখিলেই জীব কৃতার্থ। জীব স্বভাবতঃ বহির্মুখ, উন্মুখ হইবার জন্য তাহার ভগবৎ শরণাগতিই একমাত্র উপায়। জীবকে ভগবৎ শরণাগতি গ্রহণ করিতেই হইবে, কেননা জীব স্বরূপতঃ নিত্য ভগবদ্দাস। গৌরপ্রিয়া অলৌকিক জীব হইলেও রাধাপদর কষ্ট কি বুঝিল। গৌরপ্রিয়া রাধাপদকে ভালবাসে, তাই রাধাপদর জন্য বড় কান্না আসিল, কাহার নিকট কাঁদিবে, তাই আপনার হৃদয়ের অধীশ্বর গৌরের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, একজনের জন্য একজন কাঁদিলে কি হইবে? সংক্ষেপে তাহার এই উত্তর, প্রীতির বড় অচিন্ত্যশক্তি। প্রকৃত ভগবৎসম্বন্ধীয় ভালবাসার বিচিত্র মহিমা। প্রীতি দশজনকে একজন এবং একজনকে দশজন করিতে পারে। গৌরপ্রিয়া প্রীতিবশে রাধাপদর দুঃখকে আপন দুঃখ মনে করিয়া কাঁদিল অথবা গৌরপ্রিয়া রাধাপদ হইয়া কাঁদিল—ইহা একই প্রকারের কথা। যাহা হউক ইহার পর হইতে রাধাপদর চিত্ত ক্রমশঃ ভগবৎ স্মরণে অধিকতর অভিনিবিষ্ট হইল। রাধাপদর আর কোন অন্তরায় থাকিল না।

ইতঃমধ্যে সহসা একদিবস কিশোরী বাবুর সামান্য জ্বর হইল এবং আর অধিক কোন উপসর্গ না হইয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল। শেষাবস্থায় কিশোরী বাবুর হৃদয় বড়ই কৃষ্ণবিরহ-বেদনাময় হইয়াছিল। প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় তিনি দিন রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। মহাপুরুষের কৃপাতেই এইসব অলৌকিক ঘটনা। স্বামীবিয়োগের পর

পতিপরায়ণা ব্রজসুন্দরী আর তিন দিনের অধিক ইহধামে রহিলেন না। শেষ বিদায় সময়ে পুত্র রাধাপদকে উপদেশ করিলেন, বাবা, আমার একটী কথা রক্ষা করিও। আমাদের বড় সাধ ছিল, আমরা শ্রীরাধা-রমণের সাক্ষাৎ সেবক হই, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ সেইরূপ ঘটে নাই। তুমি এবং বৌমাতে মিলিয়া শ্রীরাধারমণের সেবা করিও, তাহাতেই আমার সাধ পূর্ণ হইবে। রাধাপদ মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক চরণধূলি লইল। মহা সমারোহে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবা করিয়া পিতৃ মাতৃ কার্য্য সম্পন্ন করিল।

পিতৃ মাতৃ বিয়োগে কিছুকাল রাধাপদ বড়ই বেদনা ভোগ করিল। এরূপ পিতা মাতা সংসারে কয়জনের ভাগ্যে মিলিয়া থাকে? আদর্শচরিত্র দর্শন বহু সৌভাগ্যের কথা। আদর্শচরিত্র কত অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হয়। সেই চরিত্র যাহার গৃহে লাভ হয়, তাহার ভাগ্যের কি পরিসীমা আছে? রাধাপদ নিজ সৌভাগ্য অনুভব করিয়াছিল বলিয়া সাধু আদর্শ চরিত্র পিতা মাতার বিয়োগে অতীব কাতর এবং অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ গৌরপ্রিয়ার সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগে রাধাপদর চিত্ত সুস্থির হইল।

দিনের পর দিন যায়। যে দিন যায়, সে দিন আর ফিরিয়া আইসে না। চিরদিন সমান যায় না। কালের সহিত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। সম্প্রতি মাতৃ আজ্ঞানুযায়ী রাধাপদ এবং গৌরপ্রিয়া একত্র মিলিয়া পরমানন্দসহকারে শ্রীনিতাইগৌর এবং শ্রীরাধারমণ সেবাপরায়ণ। উভয়ে ভগবৎ কথা রসে কালযাপন করে। গৌরপ্রিয়াকে দেখিবার কথা দূরে থাক, মনে হইলেই রাধাপদর হৃদয় লীলারসে প্লাবিত হয়। পরস্পর সর্ব্বদা ভগবল্লীলানুভবে এবং আলোচনায়, সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। নিত্য শ্রীরাধারমণকুঞ্জে সংকীর্ত্তন, পাঠ, বৈষ্ণবসেবা এবং সাধু সমাগমে আনন্দময়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনাসক্ত আশ্রম।

নীলাচলে মহাপুরুষের আশ্রম। এবার রমণী আসিয়া আরও মনোরম এবং সুন্দর দর্শন করিল। ক্ষুদ্র উদ্যান দুইখানিতে প্রতিদিন বেলা, মল্লিকা, গোলাপ এবং অন্যান্য পুষ্প বিকসিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌগন্ধ বিস্তার করে। মহাপুরুষের মনোমুগ্ধকর হৃদয়-উদ্যান হইতে চির-প্রস্ফুটিত প্রীতি-কুসুম ততোধিক সৌরভ বিস্তার পূর্ব্বক আশ্রমটী সর্ব্বদা প্রফুল্ল এবং আমোদিত করিতেছে। ভক্তিভাবিত-হৃদয় যুবকগণ নিত্য নূতন প্রেমের সহিত শ্রীরাধারমণ সেবায় নিযুক্ত। সম্প্রতি আশ্রমে বহু সমাগম নাই, তথাপি অভ্যাগত বৈষ্ণববৃন্দ আসিলে সাদরে পূজিত হইয়া থাকেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে মহাপুরুষকে যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে কঠোর বৈরাগ্যাচরণ করিতে দেখিয়াছেন। উপবাস, নিয়মাচরণ, ভূমিশয্যায় শয়ন, স্বাল্প ভোজন করিতেন এবং এইরূপ কঠোরতার সহিত কত দিন তিনি কালযাপন করিয়াছেন নিরূপণ করিয়া বলা যায় না। গল্পচ্ছলে তিনি কহিতেন যে, প্রথমতঃ তিনি ক্রিয়াকর্ম্ম এবং সেবানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ও তাহাতে তিনি বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। দেবী তাঁহার উপর প্রসন্ন ছিলেন। অতঃপর তিনি আদেশপ্রাপ্ত হইয়া গোদাবরী তীরে গমন করেন, তথায় শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ জনৈক দীর্ঘ মহাপুরুষ তাঁহাকে দর্শন দিয়া আত্মসাৎ করিয়া লন; তৎকালে তাঁহার অনুভব হয়, যেন সেই আনন্দময় বিগ্রহ তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট

হইলেন। তদীয় আদেশে তিনি মহাপ্রসাদের মহিমা, নাম এবং প্রেম প্রচারার্থ বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা ভ্রমণ করেন। তন্মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আশ্রম স্থাপিত হওয়াতে অধিক সময় তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে হয়।

মহাপুরুষের হৃদয় বড়ই ভালবাসাময় এবং সমুদ্রতুল্য অতল ও অসীম। শ্রীমন্মহাপ্রভুতে প্রগাঢ় প্রীতি হেতু তাঁহার নীলাচলবাস বড়ই সুখকর বলিয়া মনে হইল। ভক্তিপ্রবণচিত্ত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ কতকগুলি কৈশোরবয়স্ক বালক এবং যুবক সঙ্গে শ্রীরাধারমণ সেবা সহকারে তিঁনি আশ্রমে কীর্ত্তনানন্দ বিস্তার করিলেন। ভাগ্যবান্ যুবকগণের মহাপুরুষের সঙ্গ মধুর হইতে সুমধুর বোধ হইতে থাকিল। তাহারা সকলে অতীব হৃষ্টচিত্তে প্রাণের সহিত মহাপুরুষের সেবাকার্য্যে তৎপর হইল। ভোর নিশীথে কুঞ্জভঙ্গারাত্রিক কীর্ত্তন সমাপ্ত হইয়া যাইল। প্রত্যূষে মহাপুরুষ দন্তধাবন করিতে বসিলেন; শিষ্যগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিল। মহাপুরুষ কখনও কাহাকেও উপদেশ দিতেছেন, কখনও তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতেছেন, কখনও বা চিত্তপ্রফুল্লকর গল্প করিতেছেন। যুবকগণ এক দৃষ্টিতে প্রিয়জনের মুখপানে তাকাইয়া অমিয় বচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে কত সুখে বিভোর হইয়া যাইতেছে। এইরূপ স্নানের সময়, আহারের সময়, প্রত্যেক সময়েই শিষ্যগণ গুরুদেবকে নয়নে নয়নে রাখিতে চাহিত। তিনি এদিক ওদিক কোথায়ও বাহির হইলে সেবকগণের বোধ হইত তাহাদের প্রাণ লইয়া চলিয়া যাইতেছেন। শিষ্যগণ গুরুসেবানন্দ একটী অতুল সম্পত্তি বলিয়া বিলক্ষণ বোধ করিতে লাগিল। মহাপুরুষের অঙ্গস্পর্শে সেবকগণ হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার অনুভব করিত, তাহা ভাষায় কখনও ব্যক্ত করা যায় না।

এদিকে নিত্য অভ্যাগত অতিথি সেবা হইতেছে। আশ্রমের ব্যায়াদি

সম্বন্ধে কোন বন্ধানি বা বৃত্তি নাই। তাহা সম্পূর্ণ ভিক্ষার উপর নির্ভর করে। কোন দিন কোন দ্রব্যের অভাব নাই। কেহ আসিলে হতাশ হইয়া কখন ফিরিয়াও যাইতেছেন না। কেহ মহাপুরুষের মহান্ হৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্তিতে সন্তোষ লাভ করিয়া যাইতেছেন, কেহ গুরু বৈষ্ণব সেবার উচ্চ আদর্শ দর্শনে মনে মনে সুখী হইয়া প্রশংসা করিতে করিতে যাইতেছেন, কেহ বা দ্বিপ্রহরকালে আশ্রমে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিয়া যাইতেছেন। স্থূল কথা, সকলেই আশ্রম হইতে আনন্দিত হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। মহাপুরুষ ধীর নিশ্চিন্ত; আশ্রম কিরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, কিরূপে চলিবে, এ সমুদয় চিন্তা তাঁহার নাই। তিনি সদানন্দময়, কি এক অলৌকিক রসে সর্ব্বদা চিত্ত ডুবাইয়া রাখিতেছেন। সকলের সহিত বেশ সদালাপ ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু হৃদয়টী তাঁহার যে কোথায়, ইহা অতি অল্প ব্যক্তিই বুঝিতে সক্ষম হইত। শ্রীবিগ্রহসেবা, শ্রীগুরুসেবা, শ্রীবৈষ্ণবসেবা—এই তিন সেবানন্দ, এতদ্ব্যতিরিক্ত কীর্ত্তনানন্দ বহুল হইয়া আশ্রমটী এই মর্ত্ত্যভূমে অপ্রাকৃত শান্তি নিকেতন। কত সংসারী আর্ত্তজীব মহাপুরুষের উপদেশামৃত শ্রবণে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়াছে, তাহার কি সংখ্যা আছে? কত নাস্তিক, কত মায়াবাদী, নিজ নিজ মত মহাপুরুষের সরল মধুর সিদ্ধান্ত শুনিয়া চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারিবে? কত পাষণ্ড হৃদয়ও মহাপুরুষের সঙ্কীর্ত্তনাবেশ দর্শনে বিগলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহা বলিয়া কে শেষ করিবে?

সংসারী ব্যক্তি অনাসক্ত ভাব বুঝিতে ততদূর সক্ষম নহে। বিষয়াসক্ত জন বিরক্তভাব দেখিলে সেই ব্যক্তিকে বড় শ্রদ্ধা করে। তাহার কারণ, আসক্তি এবং অনাসক্তি এই উভয়ের মধ্যে যে রহস্য তাহা ভেদ করা

বড়ই সমস্যার কার্য্য। পরন্তু আসক্তি এবং বিরক্তি এই দুইটী অবস্থা পরস্পর বলিয়া আসক্ত জন, বিরক্ত দশার মর্য্যাদা অনুভব করিতে পারে। তাই বলিয়া কি বিষয়মুগ্ধ আসক্ত সংসারী—বৈরাগ্যের আদর জানে না? আদর করিতে তাহার মতি হয়? অনুতপ্ত সংসারাসক্ত জীবই বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তাবোধে সক্ষম হয়। যাহা হউক, মহাপুরুষের এই অনাসক্ত আশ্রম সন্দর্শনে সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল হইত। তবে পাষণ্ড, সকল কালেই থাকে, তাহাদের কথা লইয়া বিচার নিষ্প্রয়োজন।

মহাপুরুষের শ্রীনীলাচলে এই অনাসক্ত আশ্রম স্থাপনের কি প্রয়োজন, তাহা আমাদের বুঝা একান্ত আবশ্যক। অনাসক্ত আশ্রম স্থাপনের উপকারিতা কি, তাহাও আলোচনা দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে। বৈরাগ্যানুশীলনে সিদ্ধ ব্যক্তিই অনাসক্ত আশ্রমে প্রবেশের অধিকারী। সংসারাসক্তির পর বৈরাগ্য এবং বৈরাগ্যের পর অনাসক্ত অবস্থা লাভ, ইহাই আত্মোন্নতির পর্য্যায়। সংসারাসক্তি হেতু ত্রিতাপ, ত্রিতাপ অনুভবে ক্রমশঃ অনুতাপ, বিবেক এবং বৈরাগ্য। বৈরাগ্য যাজনে পরিপক্কতা লাভ করিলে সাধক সিদ্ধ; তখন তাঁহার বৈরাগ্যদশায় থাকিতেও কোন আপত্তি নাই এবং বিলক্ষণ ভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিলেও তাঁহার কোনরূপ আশঙ্কা নাই। আমাদের মহাপুরুষ ত নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ—পরিকর, তাঁহার অনাসক্ত ভাবেরই বা অভাব কি? বিরক্ত ভাবেরই বা অভাব কি?

সময়ানুযায়ী প্রচার বিষয়ে তারতম্য হইয়া থাকে। আধুনিক কালে শ্রীদাস গোস্বামীর ন্যায় বৈরাগ্য যাজন করিবার কাহার সাধ্য আছে? আজকাল সাধকের দেহ যেরূপ অপটু, দেহাভিনিবেশও সেইরূপ। এরূপ অবস্থায় সাধককে কঠোর বৈরাগ্যাচরন করিতে উপদেশ করা একেবারে বৃথা। বৈরাগ্য না করিলেই বা কিরূপে বিরক্ত হওয়া যাইতে পারে? ইহা বড়ই সমস্যার বিষয়। এতদবস্থায় অনাসক্ত

মহাপুরুষের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আর প্রবর্ত্ত বা সাধকের উপায় নাই। আমার সংসার, বিষয়কার্য্য ভাল লাগিতেছে না, বড় সাধ হইতেছে ভগবান্‌কে ভজনা করি। অথচ বৈরাগ্যাচরণ করিবার সামর্থ্য নাই, আহার বিষয়ে অনিয়ম করিলেই দেহ অসমর্থ হইয়া পড়ে, ক্ষুধার সময় দুটী না খাইতে পাইলে হরিনাম ভুলিয়া যাই। আমি অর্থোপার্জ্জনহীন, ভজন করিতে চাই, কিন্তু অধিক বৈরাগ্য করিতে পারিব না। এরূপ দুর্ব্বল উন্মুখজনের সম্বন্ধে অনাসক্ত মহাপুরুষের এই আশ্রম ব্যতীত আর আশ্রয় নাই। এখানে দুটী প্রসাদ পাইয়া দুর্ব্বল ভজনাভিলাষীজনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার কোন বাধা নাই। এই গেল এক কথা। দ্বিতীয় কথা এই, শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—

"নির্জ্জনে বসিয়া কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।"

আমার চিত্ত বড়ই বিক্ষিপ্ত, মহূর্ত্তের মধ্যে সে শত স্থান ভ্রমণ করিতেছে, নির্জ্জনে বসিলে আমার চিত্তকে কিছুতেই একাগ্র করিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় দশজন মিলিয়া কীর্ত্তন করিলে শীঘ্রই চিত্তের একাগ্রতা বিধান হইয়া থাকে। অথবা কতক সময় নির্জ্জনে বসিয়া ভজন করিতে পারি বটে, কিন্তু সকল সময় নির্জ্জনে বাস আমার পক্ষে সুকঠিন। এরূপ অবস্থায় মহাপুরুষের আশ্রম একমাত্র উপযুক্ত স্থান। কেননা, আশ্রমে অনেক উপাদেয় ভজনানুকূল কার্য্য আছে, তাহাতে মনোনিবেশ করিলে অনেক সময় সার্থক ভাবে অতিবাহিত হইতে পারে। শ্রীবিগ্রহসেবা, শ্রীগুরুসেবা, শ্রীবৈষ্ণবসেবা কার্য্য এককালে যথায় অনুষ্ঠিত হইতেছে, তথায় কাহারও কোনরূপ অভাব হইতে পারে না। তোমার যে কোন অবস্থা হউক না কেন, এই আশ্রম তোমার অনুকূল হইবেই হইবে। গৃহস্থ হউক, বিরক্ত হউক, অনাসক্ত হউক, যে আশ্রমী হউক না কেন, মহাপুরুষের আশ্রম সকল আশ্রমীর সম্বন্ধে অনুকূলভাবে উন্মুক্ত।

গৃহস্থের ত সেবাই ধর্ম্ম, তাহা আচরণ না করিলে প্রত্যব্যয় আছে। বিরক্ত ব্যক্তি বিরক্ত বলিয়া গুরুসেবায় বিরক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন না, তিনি আপনাকে গুরুসেবায় নিযুক্ত রাখিয়া আশ্রমে নির্ব্বিঘ্নে ভজন করিতে পারেন। এই গেল দ্বিতীয় কথা। তৃতীয় কথা এই, সাধক পথে নানাবিধ প্রলোভন এবং পরীক্ষা আছে। এক পথের দশজন একত্র অবস্থান করিলে এতদ্‌সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া পরস্পরকে সতর্ক করা বিষয়ে একটী মহান্ সুযোগ ঘটে। এই সুযোগ লাভ বড় অল্প ভাগ্যের কথা নহে। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি ভাবও আত্মোন্নতির একটী অনুকূল লক্ষণ। উক্ত আশ্রমে এই অমূল্য সুযোগ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। চতুর্থ কথা এই, আশ্রমে সৎসঙ্গ এবং সৎ-শিক্ষালাভ অনায়াসে এবং সহজে ঘটিয়া থাকে। আত্মোন্নতির নিমিত্ত সৎসঙ্গ এবং সৎশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এক মহাপুরুষের অবস্থান হেতু আশ্রমে কত সাধু মহাত্মার সমাগম হইয়া থাকে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না এবং মহাপুরুষের সঙ্গ প্রভাবের মহিমাই ত বাক্যের অতীত। এমন কি, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব তাহা ধারণা পথে আনয়ন করিতে সক্ষম নহে। অপিচ নিরন্তর তিনি জিজ্ঞাসু আগন্তুক ভক্তজনকে শিক্ষা দিতেছেন, সেই সমুদয় উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে কেননা ক্রমশঃ চিত্তের উন্নতি সাধিত হইবে? সৎশিক্ষাভাব বশতঃ ধর্ম্মজগতে অনেক বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। সৎশিক্ষা, সৎসিদ্ধান্ত শ্রবণলাভ বহু ভাগ্যের কথা। আশ্রম একটী অদ্বিতীয় সৎশিক্ষা এবং সৎসিদ্ধান্তক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাপুরুষের প্রাঞ্জল, মধুময় ভাষায় কঠিন তত্ত্বব্যাখ্যা শ্রবণে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই চমৎকৃত হইয়া থাকেন।

পঞ্চম কথা এই, ভজন বিষয়ে শুদ্ধ মানসিক নিয়োগাবস্থায় সাধকের

যত বাধা-বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা,—কায়িক, বাচিক ও মানসিক নিয়োগে ততদূর বাধা-বিঘ্নের সম্ভাবনা এককালীন নাই। দেহবৃত্তি, শব্দবৃত্তি এবং মনোবৃত্তি এই তিনেরই পরিচালনশীল জীব সাধকাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও সহসা তাহাদের সংযম করিতে কখনও সমর্থ নহে। দেহ, আহার, নিদ্রা, পরিশ্রম সকলই চায়, কথা বলিবার বৃত্তি হঠাৎ রোধ করিতে পারা যায় না। মনঃসংযম অনেক চেষ্টা দ্বারাও সাধিত হইতেছে না, সাধকের এই অবস্থায় মহাপুরুষের আশ্রয় উপযুক্ত স্থান। কেননা, উদর ভরিয়া খাও, আপত্তি নাই; শ্রীবিগ্রহসেবা, শ্রীগুরুসেবা, শ্রীবৈষ্ণবসেবা উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিশ্রম কর এবং পরিশ্রমান্তে নিদ্রা যাও, আপত্তি নাই; অতএব আশ্রমে সাধকের দেহবৃত্তি একেবারে রোধ করিতে হইল না। দশজনে মিলিয়া উপরোক্ত সেবাকার্য্য করিতে হইলেই মৌনী হইবার প্রয়োজন নাই এবং সেবা সম্বন্ধীয় বাক্যের ব্যবহারে তোমার শব্দশক্তি বৃদ্ধি পাইবে বই হ্রাস হইবে না। তাহার পর শ্রীগৌর-সঙ্কীর্ত্তন ত আছেই। অতএব সাধকের বাক্য সংযম করিবার কোনই প্রয়োজন থাকিল না। তাহার পর মনোবৃত্তির নিয়োগ ত মহাপুরুষ কর্ত্তৃক সাধিত হইতেছে, তন্নিমিত্ত আশ্রমস্থ কাহারও নিজের কোন চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে না। মহাপুরুষ স্বাভাবিক চিত্তাকর্ষণকারী। তুমি ভালবাসিতে না চাহিলেও, মহাপুরুষ তোমায় ভালবাসাইবেন। এখন তোমার সহজেই সেবাবৃত্তি বিকসিত হইতে থাকিল। তুমি তাঁহার সেবা কর, তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী বৈষ্ণবসেবা কর, আর অভাব থাকিল কি? সমস্ত বৃত্তি উপযুক্তরূপে নিযুক্ত হইলে আর আত্মোন্নতির বিঘ্ন থাকিল কি না?

স্বজাতীয় যৌথিক অবস্থিতি যে সারসিক উপাসনার বড়ই অনুকূল অবস্থা, তাহা সাধকমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। যৌথিক অবস্থানে আনুগত্যময়ী প্রীতির অনুশীলন হইতেই হইবে এবং আনুগত্যময়ী প্রীতিই

সারসিক উপাসনার মূল সূত্র। স্বজাতীয় আশায় সম্পন্ন সাধকগণের যৌথিক অবস্থান বড়ই হৃদয়হারী দৃশ্য এবং এরূপ দৈহিক মিলন সংসারে অতি দুর্লভ। এই দুর্লভ দৃশ্যের রঙ্গভূমি সদৃশ মহাপুরুষের এই আশ্রম নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যতীত আর কাহার পূজনীয় হইবে না? ইহাই আশ্রম স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শেষ কথা নহে। কিন্তু পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, আর অধিক আলোচনা করিয়া গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায় নাই।

মহাপুরুষের আশ্রমে রমণী এখন বেশ আছে। সেবাকার্য্য করে, তাহাতে মন সর্ব্বদা স্ফুর্ত্তিযুক্ত থাকে। সকলেই রমণীকে ভালবাসে, রমণীও সকলের অনুগত হইয়া চলে। সমুদ্র তীরে বেড়াইতে গিয়া রমণী মনের উচ্ছাসে গান করে। অসীম তরঙ্গায়িত সমুদ্রের দৃশ্য দর্শনে রমণীর মনে কত ভাব উঠে। সমুদ্রতীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাবেশ স্মরণ করিয়া রমণী কাঁদে। আবার কখনও রমণীর হেমলতাকে মনে হয়; কিন্তু সে আর এক ভাবে। রমণী মনে মনে হেমলতার সহিত কত কথা বলে। মনে মনে রমণী হেমলতার সহিত সেই প্রেমের দেশে চলিয়া যায়। হেমলতা রমণীকে তাহার সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া কত কি সুন্দর দ্রব্য দেখায়। আবার রমণীকে লইয়া হেমলতা কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করে, কুঞ্জ মাধুর্য্য দর্শনে রমণী আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। হেমলতাকে মনে হইলেই রমণী হেমলতার দেশে যাইয়া পড়ে। সেই সময় রমণীর অনুভব হয় যে, সে যেন একটী পরম সুন্দরী কিশোরী, হেমলতা তাহাকে কত বেশ ভূষা পরাইয়া দিতে আসিতেছে। রমণীর তখন আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না, সেই ভাবে ডুবিয়া যায়। মহাপুরুষের প্রতি রমণীর প্রীতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। মহাপুরুষকে রমণী মনের কথা বলে, তিনি শুনিয়া বড় সুখী হন। এইভাবে রমণী আশ্রমে পরমানন্দে অবস্থান করিতে লাগিল।

রমণীকে মহাপুরুষের আজ্ঞায় কোন কার্য্যবশতঃ একবার শ্রীনবদ্বীপ ধামে যাইতে হইল। প্রত্যাবর্ত্তন কালে রমণীর রাধাপদকে বড় মনে পড়িল। সন্ধ্যাকাল শ্রীরাধারমণের আরাত্রিক হইতেছে, এমন সময় উত্তরীয় আবৃত একটি সুন্দর যুবক আসিয়া জগমোহনে দণ্ডায়মান। যুবক রাধাপদর চিত্ত বড় আকর্ষণ করিল। আরাত্রিক সমাপ্ত হইবার পর যুবক সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলে রাধাপদ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র পরস্পর পরস্পরের দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল। অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ, রাধাপদ রমণীকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া একে একে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। রমণীও একে একে রাধাপদর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে থাকিল। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের কাহিনী শ্রবণান্তর রাধাপদ রমণীকে কহিল দাদা! কয়েকদিন এইখানে থাকিয়া আমাকে সুখী কর। ইত্যবসরে গৌরপ্রিয়া আসিয়া কহিল, বেশ আমায় বুঝি একটা খবরও দিতে নাই, দুইজনে মিলিয়া কত কি আলাপ হইয়া গেল, আমি কিছুই শুনিতে পাইলাম না, আমায় আবার সকল কথা শুনাইতে হইবে, তবে ছাড়িব। রমণী গৌরপ্রিয়াকে দেখিয়া অনুভব করিল, এই কিশোরীও সেই প্রেমময় দেশের অধিকারিণী। রমণী গৌরপ্রিয়াকে কহিল, গৌরপ্রিয়া ভাল আছ?

গৌ। গৌরের কৃপায় ভাল আছি। এখন আপনি হাত মুখ ধুইয়া আসুন, কথা পরে হইবে।

র। আমি তোমাদের দেখিয়া বড় সুখী হইলাম।

গৌ। গৌরভক্তের অপেক্ষা আর সুখী কে? আপনারা সর্ব্বদা সুখী।

কৃষ্ণকথায় তিন জনের সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিবস রমণী রাধাপদ ও গৌরপ্রিয়ার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় আশ্রমে পৌছিল আর কখনও মহাপুরুষের সঙ্গ ছাড়া হয় নাই।

উপসংহার।

ভগবৎ স্মৃতিশীল হইলেই জীবের সুখ, ভগবৎ স্মৃতিবিহীন হইলেই জীবের দুঃখ। সাংসারিক ভোগবিলাস সম্পন্ন ব্যক্তি ভগবান্‌কে ভুলিয়া সহস্র চেষ্টায়ও কখনও সুখী হইতে পারিবে না। আর ভগবৎ-শরণ-পরায়ণ-জন নানাবিধ পার্থিব দুঃখের মধ্যেও সুখী। যতই আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া কাছে আসুক না কেন, ভগবান্‌কে ভুলাইয়া দিলে সে পরম শত্রু। আর যতই শত্রুতাচরণ, দুর্ব্ব্যবহার করুক না কেন, প্রভুর স্মৃতি করাইয়া দিলে সে পরম মিত্র। রাধাপদর ন্যায় গার্হস্থ্য ভক্তজীবন লাভ হইলে সুখ অথবা রমণীর ন্যায় মহাপুরুষের অনাসক্ত বিরক্তাশ্রমে আশ্রয়লাভ সুখ। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সুখের অবস্থা থাকিলেও তাহাদের সহিত এই উভয়ের কখনও তুলনা হইতে পারে না। কেননা, প্রদর্শিত উভয় অবস্থাতেই ভগবৎ সম্বন্ধে কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধ নিয়োগই এককালে সম্পন্ন হইতেছে। যুগপৎ ভগবৎ সম্বন্ধে এইরূপ স্বাভাবিক ত্রিবিধ নিয়োগ আর কোন অবস্থাতে কেহ দেখাইতে পারিবেন কিনা নিতান্ত সন্দেহ।

শ্রীরাধামাধব যেরূপ এক আত্মা, দুটী দেহ, শ্রীব্রজলীলা এবং শ্রীনবদ্বীপলীলা সেইরূপ একটা রস, দুইটী বিলাস। অদ্বয় বিষয়ের আশ্রয়ভাবে লোভাধিক্যের কারণ একই রস বলিতে হইবে। এই লোভাধিক্যের বিচারে ব্রজলীলা হইতে গৌরলীলার রসাধিক্য আছে, এই কথায় কাহারও আপত্তি হইবে না। রস এক বই দুই নহে। রসের আধিক্য বলাতে কিছু বস্তুর অদ্বয়ত্ব নষ্ট হয় না, বরং অসীমত্ব, অখণ্ডত্ব, অতলত্ব, প্রতিপাদিত হইয়া মহিমাই বিঘোষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ—

রসজীবি, শ্রীরাধা—রসবতী। রসজীবির রসবতীর ভাবে লোভ হইয়া, শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অবতারণা। কি মধুর রহস্যময়ী লীলা!

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় অতীব আনন্দোচ্ছ্বলিত হৃদয়ে কহিতেছেন,—

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥

শ্রীগৌরলীলায় কিছু অভাব নাই। অতএব ব্রজলীলা স্মরণ এবং নবদ্বীপলীলা স্মরণ কখনও পৃথক কথা নহে। সত্য শ্রীগৌরাঙ্গলীলা শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাময়ী, কিন্তু ইহাও সত্য যে শ্রীগৌরলীলায় ব্রজলীলাতিরিক্ত 'কিমপি' একটী অনির্ব্বচনীয় রহস্য বিদ্যমান, যাহার অনুভব এবং আস্বাদন উভয়ই অনির্ব্বচনীয়। প্রেমের কোন বিশেষ চরম আতিশয্যাবস্থাতে বিষয় আশ্রয়ের দুইটী দেহ, মন, প্রাণ সম্পূর্ণ মিলিত হইয়া যে একটী অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব বিচিত্র মাধুর্য্যরসঘন বস্তুর আবির্ভাব হইল, তাহা নাম, রূপ, লীলা সহকারে শ্রীনবদ্বীপে প্রকটিত হইলে রসের গাঢ়ত্ব হেতু আস্বাদনের পৃথকত্ব স্বীকারে রসমর্য্যাদাহানি কল্পনা একান্ত নিষ্প্রয়োজন। রস একটী হইলেও রসিক ভোক্তাকে সুখী করিবার জন্য অনন্ত আকারে আকারিত। একই রস যেমন আম, জাম কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি অনন্ত প্রকার সুরুচিকর ফলে অনন্তরূপ আস্বাদন ধারণ করে, সেইরূপ লীলারস একটী হইলেও তাহার অনন্ত সুরুচিকর আস্বাদন সম্পন্ন ভেদ আছে, সেই অনন্ত ভেদানুযায়ী লীলামাধুর্য্যের ভেদ কল্পনায় কখনও রসের অদ্বয়ত্ব নষ্ট হয় না। লীলামাধুর্য্যভেদে শব্দ, রূপ, রস, গন্ধের ভেদ হইয়া পড়ে, ইহাতে আর তর্ক কি আছে?

যে সচ্চিদানন্দময় ধামে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত বিলাসে অনন্ত রস আস্বাদন করিতেছেন, যথায় অনন্ত নন্দভবনে অনন্ত মা যশোদাক্রোড়ে অনন্ত শিশুরূপে এককালে স্তনপান করিতেছেন, যথায় নন্দোৎসব হইতে অক্রূরের রথারোহণ পর্য্যন্ত অনন্ত লীলা অনন্ত স্থানে এককালে সম্পাদিত হইতেছে; তাহার নাম শ্রীগোলোক। ভুবি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা সাধনের স্মরণের বিষয় এবং তাহাতে প্রবেশের নিমিত্ত লীলাই গোস্বামিসম্মত। গোলোকলীলা এবং গোকুললীলায় কিছুমাত্র ভেদ নাই। একটী দেবলীলা, একটী নরলীলা। দেবলীলায় যুগপৎ অনন্ত লীলা, নরলীলায় যথাক্রমিক একটীর পর একটী লীলা। নরলীলায় প্রবেশ হইলে গোলোকলীলায় প্রবেশ নিশ্চয়ই অসিদ্ধ থাকে না। তবে সাধকের দেবলীলা স্মরণ কখনও সম্ভব নহে এবং নরলীলায় প্রবেশের নিমিত্ত লীলাই অতি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

শ্রীমথুরামণ্ডলান্তঃপাতি চৌরাশীক্রোশব্যাপী শ্রীব্রজধাম। তদন্তঃবর্ত্তী নন্দগ্রাম নামক একটী পরম রমণীয় স্থান আছে। গ্রামখানি নাতি উচ্চ পর্ব্বতোপরি অধিষ্ঠিত। পর্ব্বতের নিম্নদেশে নির্ম্মল স্বচ্ছ দর্পণ সদৃশ একটী সুন্দর সরোবর বিদ্যমান। নানাবিধ ফল ফুল ভরে পাদপনিচয় সর্ব্বদা অবনত। বিবিধ মনোহর লতাকুঞ্জ সমুদয় নিরন্তর কানন প্রদেশের অতুলনীয় শোভা সম্পাদনপর। ময়ূর, হরিণ, শশক ইত্যাদি অহিংসক পশুবৃন্দ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। বিবিধ বর্ণ এবং সৌগন্ধের কুসুমাবলি প্রস্ফুটিত হইয়া সতত বনভূমিতে সৌরভ বিস্তার করিতেছে। বিহগগণ কত প্রকার মিষ্ট স্বর বর্ষণে জন-শ্রবণে সুধা ঢালিয়া দিতেছে। ক্ষেত্রই প্রচুর শস্য উৎপাদনশীল। প্রত্যেক গৃহস্থ ভাণ্ডার ধন ধান্যে পূর্ণ। প্রত্যেক পরিবার সুখ স্বাস্থ্য সম্পন্ন হইয়া নন্দগ্রামে পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীযুক্ত নন্দমহারাজ উক্ত সুখসম্পত্তিশালী গ্রামখানির অধীশ্বর। গ্রামে মধ্যবর্ত্তী স্থানে তদীয় পরম সুন্দর দিব্য প্রাসাদ বিরাজমান। সাধ্বীশিরোমণি পতিপরায়ণা শ্রীমতী যশোমতী শ্রীনন্দমহারাজ পত্নী সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা এবং সর্ব্বলোক মান্যা। প্রাসাদোপরি হইতে উত্তর দক্ষিণ উভয় দিক আরও দুইখানি মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যসম্পন্ন গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তর দিকের গ্রাম খানির নাম বরষাণ ও দক্ষিণ দিকের গ্রাম খানির নাম যাবাট। বর্ষাণ পতি শ্রীবৃষভানু মহারাজের দুইটী কন্যা এবং একটী পুত্র। পুত্রটীর নাম শ্রীদাম, কন্যা দুইটির নাম শ্রীরাধা এবং অনঙ্গ সুন্দরী। দুইটী কন্যাকেই উক্ত যাবট গ্রামে বিবাহ দিয়াছেন।

আমাদের নন্দ মহারাজের অনেক আরাধনার পর বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পর সুন্দর পরম মোহন পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণ। বাল্যকাল হইতেই পুত্রটীকে যিনি দেখেন তাঁরই প্রাণ মন অপহৃত হইতে থাকে। জননী আপন পুত্র অপেক্ষা যশোদাতনয়কে স্নেহ করিবার জন্য লালায়িত হয়। ভ্রাতা আপন ভ্রাতা অপেক্ষা কৃষ্ণকে ভালবাসিবার জন্য ব্যাকুল হইতে থাকে। কি করিবে কেহ ত ইচ্ছা করিয়া আপন পুত্র ছাড়িয়া পরের ছেলেকে ভালবাসিতে যায় না। শ্রীনন্দনন্দন কি চিত্তাকর্ষিণী বিদ্যা জানে, যে সাধ্য নাই কেহ প্রাণ মন না দিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে? জননীগণ বাৎসল্য রসে ভুলিল, সমবয়স্ক গোপবালকগণ সখ্যরসে মজিল, ভৃত্যগণ দাস্যরূপে আকৃষ্ট হইল। কিন্তু কুলবতীগণের কি বিষম সঙ্কট, একদিকে যুবতী সুলভ লজ্জা, লোক নিন্দা, আর্য্যপথ, গুরুগঞ্জনা, বিবিধ বিপদ আর একদিকে ভুবনমোহন চিত্তচোর শ্রীযশোদা-তনয়ের রূপ, গুণ, প্রেমমাধুর্য্যের দুর্জ্জয় অনিবার্য্য আকর্ষণ—কাহার সাধ্য সেই প্রবল আকর্ষণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়! ব্রজমণ্ডলে রসপুষ্টির

নিমিত্ত কতিপয় শাশুড়ি ননদিনী ব্যতীত আর কেহ সেই অতুলনীয় মাধুর্য্যে ডুবিতে বাকি থাকে নাই।

শ্রীনন্দনন্দন কেবল যে ব্রজমণ্ডলস্থ সকলের প্রীতির বিষয় হইলেন তাহা নহে। ধ্যান পরায়ণ মুনি ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে নন্দ মহারাজের ভাগ্যের প্রশংসা হইতে লাগিল। একবার প্রফুল্ল নীলকমলসদৃশ শ্রীকৃষ্ণ বদন, একবার সেই কচি অধরে মৃদু হাসি, একবার সেই আকর্ণ বিস্তৃত তরল নয়নের বঙ্কিম চাহনি দর্শন করিবার জন্য ব্রজবাসী মাত্রের কথা কি, দেবগণ পর্য্যন্ত উন্মাদ। ব্রহ্মাণ্ডের লোককে পাগল করিবার জন্য কি এই ছেলে জন্মিয়াছে? আর যে কেহ বালকের রূপ-মাধুর্য্যে ডুবিতে বাকি থাকিল না। কঠোর তপোনিষ্ঠ, দেবচেষ্টারহিত সমাধিপ্রিয় ঋষিগণ হইতে অজ্ঞ বালক পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রেমে বশীকৃত হইলেন। এই সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডলে যে সমুদয় মধুর লীলা সংঘটিত হইল, পাঠকগণ, গোস্বামিপাদগণ প্রণীত গ্রন্থ পাঠে তাহা আস্বাদান করিলে আনন্দ সাগরে ডুবিয়া যাইবেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। হেমলতা কহিত ইহাই প্রেমের দেশ। এই দেশ প্রেমে নির্ম্মাণ, এই দেশের সমস্ত প্রেমময়। প্রেমের বিষয় অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। আশ্রয় চতুর্ব্বিধ,—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের অনন্ত পরিকর।

পরিশেষে পাঠকগণ, এই জরা, মৃত্যু, দুঃখ বিবর্জ্জিত নিত্যসুখময় চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষ কানন, প্রেমের দেশে মহাপুরুষ, কিশোরীবাবু, ব্রজসুন্দরী, বিমলা, রমণী, হেমলতা, রাধাপদ, গৌরপ্রিয়া, পিসীমা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সুশীলা সকলের আনন্দময় মিলন দর্শন করুন।

সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ হইতে

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

১। সংক্ষিপ্ত নিত্যক্রিয়া ও বৈধীক্রিয়া পদ্ধতি
মূল্য ॥০ আনা।

২। সাধক কণ্ঠমালা—বাঁধাই মূল্য ১।০, আবাঁধাই মূল্য ১৲।

৩। শ্রীশ্রীরূপসনাতন স্তোত্র—শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন ভট্ট প্রণীত
মূল্য ।৶০ আনা।

৪। চরিত সুধা—অর্থাৎ শ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের জীবন চরিত। সমগ্র ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲, একত্রে ছয় খণ্ডের মূল্য ৫৲ টাকা।

৫। **The Life of Love or The True Salt of the Earth.**
By Narendra Nath Chatterjee, B.A.
Price Rs. 1/8/-

৬। **The Mistry of Life.**
By a graduate.
Price Re 1/-

প্রাপ্তিস্থান।

১। শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দাস বাবাজী
শ্রীরাধারমণ বাগ—শ্রীধামনবদ্বীপ।

২। কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির
শ্রীশ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটবাড়ী, বরাহনগর।
আলমবাজার পোঃ, চব্বিশ পরগণা।

৩। শ্রীযুক্ত পুলিন চন্দ্র দে।
সেন, লাহা এণ্ড কোম্পানী।
৫২।১ ওয়েলেসলিষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। শ্রীযোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য
শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ মঠ।
বাঙ্গালীসাহি, কটক।